প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ

আরিফ আজাদ

প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ

লেখক

আরিফ আজাদ

সূচিপত্র

একজন অবিশ্বাসীর বিশ্বাস

আমি রুমে ঢুকেই দেখি সাজিদ কম্পিউটারের সামনে উবুঁ হয়ে বসে আছে।খটাখট কি যেন টাইপ করছে হয়তো। আমি জগ থেকে পানি ঢালতে লাগলাম। প্রচন্ড রকম তৃষ্ণার্ত।তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাবার জোগাড়। সাজিদ কম্পিউটার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো,- 'কি রে, কিছু হলো?'

আমি হতাশ গলায় বললাম,- 'নাহ।'
– 'তার মানে তোকে একবছর ড্রপ দিতেই হবে?'- সাজিদ জিজ্ঞেস করলো।
আমি বললাম,- 'কি আর করা। আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন।'

সাজিদ বললো,- 'তোদের এই এক দোষ,বুঝলি? দেখছিস পুওর এ্যাটেন্ডেন্সের জন্য এক বছর ড্রপ খাওয়াচ্ছে, তার মধ্যেও বলছিস, আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন। ভাই, এইখানে কোন ভালোটা তুই পাইলি,বলতো?'

সাজিদ সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া দরকার।আমি আর সাজিদ রুমমেট। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক্রো বায়োলজিতে পড়ে।প্রথম জীবনে খুব ধার্মিক ছিলো।নামাজ-কালাম করতো।বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কিভাবে কিভাবে যেন এগনোষ্টিক হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে স্রষ্টার উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে এখন পুরোপুরি নাস্তিক হয়ে গেছে।ধর্মকে এখন সে আবর্জনা জ্ঞান করে।তার মতে পৃথিবীতে ধর্ম এনেছে মানুষ।আর 'ইশ্বর' ধারনাটাই এইরকম স্বার্থান্বেষী কোন মহলের মস্তিস্কপ্রসূত।

সাজিদের সাথে এই মূহুর্তে তর্কে জড়াবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু তাকে একদম ইগনোর করেও যাওয়া যায়না।
আমি বললাম,- 'আমার সাথে তো এর থেকেও খারাপ কিছু হতে পারতো,ঠিক না?'
– 'আরে, খারাপ হবার আর কিছু বাকি আছে কি?'
— 'হয়তো।'
– 'যেমন?'
– 'এরকমও তো হতে পারতো,ধর, আমি সারাবছর একদমই পড়াশুনা করলাম না।পরীক্ষায় ফেইল মারলাম।এখন ফেইল করলে আমার এক বছর ড্রপ যেতো।হয়তো ফেইলের অপমানটা আমি নিতে পারতাম না।আত্মহত্যা করে বসতাম।'

সাজিদ হা হা হা হা করে হাসা শুরু করলো। বললো,- 'কি বিদঘুটে বিশ্বাস নিয়ে চলিস রে ভাই।'
এই বলে সে আবার হাসা শুরু করলো।বিদ্রুপাত্মক হাসি।
রাতে সাজিদের সাথে আমার আরো একদফা তর্ক হোলো।
সে বললো,- 'আচ্ছা, তোরা যে স্রষ্টায় বিশ্বাস করিস, কিসের ভিত্তিতে?'
আমি বললাম,- 'বিশ্বাস দু ধরনের। একটা হোলো, প্রমানের ভিত্তিতে বিশ্বাস।অনেকটা,শর্তারোপে বিশ্বাস বলা যায়। অন্যটি হোলো প্রমান ছাড়াই বিশ্বাস।'
সাজিদ হাসলো। সে বললো,- 'দ্বিতীয় ক্যাটাগরিকে সোজা বাঙলায় অন্ধ বিশ্বাস বলে রে আবুল,বুঝলি?'
আমি তার কথায় কান দিলাম না। বলে যেতে লাগলাম-

'প্রমানের ভিত্তিতে যে বিশ্বাস, সেটা মূলত বিশ্বাসের মধ্যে পড়েনা।পড়লেও, খুবই ট্যাম্পোরেরি। এই বিশ্বাস এতই দূর্বল যে, এটা হঠাৎ হঠাৎ পালটায়।'

সাজিদ এবার নড়েচড়ে বসলো। সে বললো,- 'কি রকম?'

আমি বললাম,- ‘এই যেমন ধর,সূর্য আর পৃথিবীকে নিয়ে মানুষের একটি আদিম কৌতূহল আছে। আমরা আদিকাল থেকেই এদের নিয়ে জানতে চেয়েছি, ঠিক না?’
– ‘হু, ঠিক।’
– ‘আমাদের কৌতূহল মেটাতে বিজ্ঞান আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছে, ঠিক?’
– ‘হ্যাঁ।’

– ‘আমরা একাট্টা ছিলাম। আমরা নির্ভুলভাবে জানতে চাইতাম যে, সূর্য আর পৃথিবীর রহস্যটা আসলে কি। সেই সুবাধে, পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা নানান সময়ে নানান তত্ব আমাদের সামনে এনেছেন। পৃথিবী আর সূর্য নিয়ে প্রথম ধারনা দিয়েছিলেন গ্রিক জ্যোতির বিজ্ঞানি টলেমি।টলেমি কি বলেছিলো সেটা নিশ্চয় তুই জানিস?’

সাজিদ বললো,- ‘হ্যাঁ। সে বলেছিলো সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে।’
– ‘একদম তাই। কিন্তু বিজ্ঞান কি আজও টলেমির থিওরিতে বসে আছে? নেই। কিন্তু কি জানিস, এই টলেমির থিওরিটা বিজ্ঞান মহলে টিকে ছিলো পুরো ২৫০ বছর। ভাবতে পারিস? ২৫০ বছর পৃথিবীর মানুষ, যাদের মধ্যে আবার বড় বড় বিজ্ঞানি, ডাক্তার,ইঞ্জিনিয়ার ছিলো, তারাও বিশ্বাস করতো যে, সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে।

এই ২৫০ বছরে তাদের মধ্যে যারা যারা মারা গেছে, তারা এই বিশ্বাস নিয়েই মারা গেছে যে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।’

.

সাজিদ সিগারেট ধরালো। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললো,- ‘তাতে কি? তখন তো আর টেলিস্কোপ ছিলো না, তাই ভুল মতবাদ দিয়েছে আর কি। পরে নিকোলাস কোপারনিকাস এসে তার থিওরিকে ভুল প্রমান করলো না?’

– ‘হ্যাঁ। কিন্তু কোপারনিকাসও একটা মস্তবড় ভুল করে গেছে।’
সাজিদ প্রশ্ন করলো,- ‘কি রকম?’

– ‘অদ্ভুত! এটা তো তোর জানার কথা। যদিও কোপারনিকাস টলেমির থিওরির বিপরীত থিওরি দিয়ে প্রমান করে দেখিয়েছিলেন যে, সূর্য পৃথিবীর চারপাশে নয়, পৃথিবীই সূর্যের চারপাশে ঘোরে।কিন্তু, তিনি এক জায়গায় ভুল করেন।এবং সেই ভুলটাও বিজ্ঞান মহলে বীরদর্পে টিকে ছিলো গোটা ৫০ বছর।’
– ‘কোন ভুল?’

– ‘উনি বলেছিলেন, পৃথিবীই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে, কিন্তু সূর্য ঘোরে না। সূর্য স্থির। কিন্তু আজকের বিজ্ঞান বলে, – নাহ, সূর্য স্থির নয়। সূর্যও নিজের কক্ষপথে অবিরাম ঘূর্ণনরত অবস্থায়।’

সাজিদ বললো,- ‘সেটা ঠিক বলেছিস। কিন্তু বিজ্ঞানের এটাই নিয়ম যে, এটা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হবে। এখানে শেষ বা ফাইনাল বলে কিছুই নেই।’

– ‘একদম তাই। বিজ্ঞানে শেষ/ফাইনাল বলে কিছু নেই। একটা বৈজ্ঞানিক থিওরি ২ সেকেন্ডও টেকে না, আবার আরেকটা ২০০ বছরও টিকে যায়। তাই, প্রমান বা দলিল দিয়ে যা বিশ্বাস করা হয় তাকে আমরা বিশ্বাস বলিনা।এটাকে আমরা বড়জোর চুক্তি বলতে পারি। চুক্তিটা এরকম,- ‘তোমায় ততোক্ষণ বিশ্বাস করবো, যতক্ষণ তোমার চেয়ে অথেনটিক কিছু আমাদের সামনে না আসছে।’

সাজিদ আবার নড়েচড়ে বসলো। সে কিছুটা একমত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

আমি বললাম,- 'ধর্ম বা সৃষ্টিকর্তার ধারনা/অস্তিত্ব হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত। দ্যাখ, বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মধ্যকার এই গূঢ় পার্থক্য আছে বলেই আমাদের ধর্মগ্রন্থের শুরুতেই বিশ্বাসের কথা বলা আছে। বলা আছে- 'এটা তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।' (সূরা বাকারা,০২)।

যদি বিজ্ঞানে শেষ বা ফাইনাল কিছু থাকতো, তাহলে হয়তো ধর্মগ্রন্থের শুরুতে বিশ্বাসের বদলে বিজ্ঞানের কথাই বলা হতো। হয়তো বলা হতো,- 'এটা তাদের জন্যই যারা বিজ্ঞানমনস্ক।'

কিন্তু যে বিজ্ঞান সদা পরিবর্তনশীল, যে বিজ্ঞানের নিজের উপর নিজেরই বিশ্বাস নেই, তাকে কিভাবে অন্যরা বিশ্বাস করবে?'

সাজিদ বললো,- 'কিন্তু যাকে দেখিনা, যার পক্ষে কোন প্রমান নেই, তাকে কি করে আমরা বিশ্বাস করতে পারি?'

– 'সৃষ্টিকর্তার পক্ষে অনেক প্রমান আছে, কিন্তু সেটা বিজ্ঞান পুরোপুরি দিতে পারেনা।এটা বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, সৃষ্টিকর্তার নয়।বিজ্ঞান অনেক কিছুরই উত্তর দিতে পারেনা। লিষ্ট করতে গেলে অনেক লম্বা একটা লিষ্ট করা যাবে।'

সাজিদ রাগি রাগি গলায় বললো,- 'ফাইজলামো করিস আমার সাথে?'
আমি হাসতে লাগলাম। বললাম,- 'আচ্ছা শোন, বলছি। তোর প্রেমিকার নাম মিতু না?'

– 'এইখানে প্রেমিকার ব্যাপার আসছে কেন?'
– 'আরে বল না আগে।'
– 'হ্যাঁ।'

– 'কিছু মনে করিস না। কথার কথা বলছি। ধর, আমি মিতুকে ধর্ষণ করলাম। রক্তাক্ত অবস্থায় মিতু তার বেডে পড়ে আছে। আরো ধর, তুই কোনভাবে ব্যাপারটা জেনে গেছিস।'

– 'হু।'
– 'এখন বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা কর দেখি, মিতুকে ধর্ষণ করায় কেন আমার শাস্তি হওয়া দরকার?'

সাজিদ বললো,- 'ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চান। এটাকে বিজ্ঞান দিয়ে কিভাবে
ব্যাখ্যা করবো?'

– 'হা হা হা। আগেই বলেছি। এমন অনেক ব্যাপার আছে, যার উত্তর বিজ্ঞানে নেই।'
– 'কিন্তু এর সাথে স্রষ্টায় বিশ্বাসের সম্পর্ক কি?'

– 'সম্পর্ক আছে। স্রষ্টায় বিশ্বাসটাও এমন একটা বিষয়, যেটা আমরা, মানে মানুষেরা, আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য প্রমানাদি দিয়ে প্রমান করতে পারবো না। স্রষ্টা কোন টেলিস্কোপে ধরা পড়েন না।উনাকে অণুবীক্ষণযন্ত্র দিয়েও খুঁজে বের করা যায়না। উনাকে জাষ্ট 'বিশ্বাস করে নিতে হয়।'

.

সাজিদ এবার ১৮০ ডিগ্রি এঙ্গেলে বেঁকে বসলো। সে বললো,- 'ধুর! কিসব বাল ছাল বুঝালি। যা দেখিনা, তাকে বিশ্বাস করে নেবো?'

আমি বললাম,- 'হ্যাঁ। পৃথিবীতে অবিশ্বাসী বলে কেউই নেই। সবাই বিশ্বাসী। সবাই এমন কিছু না কিছুতে ঠিক বিশ্বাস করে, যা তারা আদৌ দেখেনি বা দেখার কোন সুযোগও নেই।কিন্তু এটা নিয়ে তারা প্রশ্ন তুলে না। তারা নির্বিঘ্নে তাতে বিশ্বাস করে যায়। তুইও সেরকম।'

সাজিদ বললো,- 'আমি? পাগল হয়েছিস? আমি না দেখে কোন কিছুতেই বিশ্বাস করিনা, করবোও না।'
– 'তুই করিস।এবং, এটা নিয়ে তোর মধ্যে কোনদিন কোন প্রশ্ন জাগে নি।এবং, আজকে এই আলোচনা না করলে হয়তো জাগতোও না।'

সে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। বললাম,- 'জানতে চাস?'
– 'হু।'
– 'আবার বলছি, কিছু মনে করিস না। যুক্তির খাতিরে বলছি।'
– 'বল।'
– 'আচ্ছা, তোর বাবা-মা'র মিলনেই যে তোর জন্ম হয়েছে, সেটা তুই দেখেছিলি? বা,এই মূহুর্তে কোন এভিডেন্স আছে তোর কাছে? হতে পারে তোর মা তোর বাবা ছাড়া অন্য কারো সাথে দৈহিক সম্পর্ক করেছে তোর জন্মের আগে। হতে পারে, তুই ঐ ব্যক্তিরই জৈব ক্রিয়ার ফল।তুই এটা দেখিস নি।

কিন্তু কোনদিনও কি তোর মা'কে এটা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলি? করিস নি। সেই ছোটবেলা থেকে যাকে বাবা হিসেবে দেখে আসছিস, এখনো তাকে বাবা ডাকছিস। যাকে ভাই হিসেবে জেনে আসছিস, তাকে ভাই।বোনকে বোন।

তুই না দেখেই এসবে বিশ্বাস করিস না? কোনদিন জানতে চেয়েছিস তুই এখন যাকে বাবা ডাকছিস, তুই আসলেই তার ঔরসজাত কিনা? জানতে চাস নি। বিশ্বাস করে গেছিস।এখনো করছিস। ভবিষ্যতেও করবি। স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসটাও ঠিক এমনই রে।এটাকে প্রশ্ন করা যায়না। সন্দেহ করা যায়না। এটাকে হৃদয়ের গভীরে ধারন করতে হয়। এটার নামই বিশ্বাস।'

সাজিদ উঠে বাইরে চলে গেলো। ভাবলাম, সে আমার কথায় কষ্ট পেয়েছে হয়তো।

পরেরদিন ভোরে আমি যখন ফজরের নামাজের জন্য অযূ করতে যাবো, দেখলাম, আমার পাশে সাজিদ এসে দাঁড়িয়েছে।আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।সে আমার চাহনির প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছে। সে বললো,- 'নামাজ পড়তে উঠেছি।

তাকদির বনাম স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি- স্রষ্টা কি এখানে বিতর্কিত?

সাজিদের ব্যাগে ইয়া মোটা একটি ডায়েরি থাকে সবসময়।
ডায়েরিটা প্রাগৈতিহাসিক আমলের কোন নিদর্শনের মতো। জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া।ছেঁড়া জায়গার কোনটাতে সূতো দিয়ে সেলাই করা, কোন জায়গায় আঁটা দিয়ে প্রলেপ লাগানো, কোন জায়গায় ট্যাপ করা।
এই ডায়েরিতে সে তার জীবনের নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো লিখে রাখে।এই ডায়েরির মাঝামাঝি কোন এক জায়গায় সাজিদ আমার সাথে প্রথম সাক্ষাতের ঘটনাটিও লিখে রেখেছে।তার সাথে আমার প্রথম দেখা হয় টি.এস.সি তে।
সে আমার সম্পর্কে লিখে রেখেছে,-
'ভ্যাবলা টাইপের এক ছেলের সাথে সাক্ষাৎ হলো আজ।দেখলেই মনে হবে, জগতের কঠিন বিষয়ের কোনকিছুই সে বুঝেনা।কথা বলার পরে বুঝলাম, এই ছেলে অত্যন্ত বুদ্ধিমান,কিন্তু বোকা।ছেলেটার নাম- আরিফ।'
নিচে তারিখ দেওয়া- '০৫/০৩/০৯

এই ডায়েরিতে নানান বিখ্যাত ব্যক্তিদের কথাও লিখা আছে।
একবার কানাডার টরেন্টোতে সাজিদ তার বাবার সাথে একটি অফিসিয়াল ট্যুরে গিয়েছিলো।সেখানে অনেক সেলেব্রিটির সাথে বিলগেটসও আমন্ত্রিত ছিলেন।বিলগেটস সেখানে দশ মিনিটের জন্য বক্তৃতা রেখেছিলেন।সে ঘটনাটি লিখা আছে।
জাফর ইকবালের সাথে সাজিদের একবার বই মেলায় দেখা হয়ে যায়। সেবারের বইমেলায় জাফর স্যারের বই 'একটুখানি বিজ্ঞান' এর দ্বিতীয় কিস্তি 'আরো একটুখানি বিজ্ঞান' প্রকাশিত হয়। সাজিদ জাফর স্যারের বই কিনে বের হওয়ার পথে জাফর স্যারের সাথে তার দেখা হয়ে যায়।সাজিদ স্যারের একটি অটোগ্রাফ নিয়ে, স্যারের কাছে হেসে জানতে চাইলো,- 'স্যার, 'একটুখানি বিজ্ঞান' পাইলাম।এরপর পাইলাম 'আরো একটুখানি বিজ্ঞান'।এটার পরে, 'আরো আরো একটুখানি বিজ্ঞান' কবে পাচ্ছি?'
সেদিন নাকি জাফর স্যার মিষ্টি হেসে বলেছিলেন,- 'পাবে।'
নিজের সাথে ঘটে যাওয়া এরকম অনেক ঘটনাই ঠাঁই পেয়েছে সাজিদের ডায়েরিটাতে।

সাজিদের ডায়েরির আদ্যোপান্ত আমার পড়া ছিলো। কিন্তু, সেমিষ্টার ফাইনাল সামনে চলে আসায় গত বেশ কিছুদিন তার ডায়েরিটা আমার আর পড়া হয়নি।অবশ্য, ডায়েরিটা আমি লুকিয়ে লুকিয়েই পড়ি।
সেদিন থার্ড সেমিষ্টারের শেষ পরীক্ষাটি দিয়ে রুমে আসলাম। এসে দেখি সাজিদ ঘরে নেই।তার টেবিলের উপরে তার ডায়েরিটা পড়ে আছে খোলা অবস্থায়।
ঘর্মাক্ত শরীর। কাঠফাটা রোদের মধ্যে ক্যাম্পাস থেকে হেঁটে বাসায় ফিরেছি।এই মূহুর্তে বসে ডায়েরিটা উল্টোবো, সে শক্তি বা ইচ্ছে কোনটাই নেই।কিন্তু ডায়েরিটা বন্ধ করতে গিয়ে একটি শিরোনামে আমার চোখ আটকে যায়। আমি সাজিদের টেবিলেই বসে পড়ি। লেখাটির শিরোনাম ছিলো,-
'ভাগ্য বনাম স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি- স্রষ্টা কি এখানে বিতর্কিত?'
বেশ লোভনীয় শিরোনাম।শারীরিক ক্লান্তি ভুলেই আমি ঘটনাটির প্রথম থেকে পড়া শুরু করলাম।ঘটনাটি সাজিদের ডায়েরিতে যেভাবে লেখা, ঠিক সেভাবেই আমি পাঠকদের জন্য তুলে ধরছি-

'কয়েকদিন আগে ক্লাশের থার্ড পিরিয়ডে মফিজুর রহমান স্যার এসে আমাকে দাঁড় করালেন।বললেন,- 'তুমি ভাগ্যে,আই মিন তাকদিরে বিশ্বাস করো?'
আমি আচমকা অবাক হলাম। আসলে এই আলাপগুলো হলো ধর্মীয় আলাপ। মাইক্রোবায়োলজির একজন শিক্ষক যখন ক্লাশে এসে এসব জিজ্ঞেস করেন, তখন খানিকটা বিব্রত বোধ করাই স্বাভাবিক। স্যার আমার উত্তরের আশায় আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন।
আমি বললাম,- 'জ্বি, স্যার।এ্যাজ এ্যা মুসলিম, আমি তাকদিরে বিশ্বাস করি।এটি আমার ঈমানের মূল সাতটি বিষয়ের মধ্যে একটি।'

স্যার বললেন,- 'তুমি কি বিশ্বাস করো যে, মানুষ জীবনে যা যা করবে তার সবকিছুই তার জন্মের অনেক অনেক বছর আগে তার তাকদিরে লিখে দেওয়া হয়েছে?'
- 'জ্বি স্যার'- আমি উত্তর দিলাম।
- 'বলা হয়, স্রষ্টার ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটি ক্ষুদ্র পাতাও নড়েনা, তাই না?'
- 'জ্বি স্যার।'
- 'ধরো, আজ সকালে আমি একজন লোককে খুন করলাম। এটা কি আমার তাকদিরে পূর্ব নির্ধারিত ছিলো না?'
- 'জ্বি, ছিলো।'
- 'আমার তাকদির যখন লেখা হচ্ছিলো, তখন কি আমি জীবিত ছিলাম?'
- 'না, ছিলেন না।'
- 'আমার তাকদির কে লিখেছে? বা, কার নির্দেশে লিখিত হয়েছে?'
- 'স্রষ্টার।'
- 'তাহলে, সোজা এবং সরল লজিক এটাই বলে- 'আজ সকালে যে খুনটি আমি করেছি, সেটি মূলত আমি করি নি।আমি এখানে একটি রোবট মাত্র।আমার ভেতরে একটি প্রোগ্রাম সেট করে দিয়েছেন স্রষ্টা।সেই প্রোগ্রামে লেখা ছিলো যে, আজ সকালে আমি একজন লোককে খুন করবো।সুতরাং, আমি ঠিক তাই-ই করেছি, যা আমার জন্য স্রষ্টা পূর্বে ঠিক করে রেখেছেন।এতে আমার কোন হাত নেই।ডু ইউ এগ্রি,সাজিদ?'
- 'কিছুটা'- আমি উত্তর দিলাম।
স্যার এবার হাসলেন।হেসে বললেন,- 'আমি জানতাম তুমি কিছুটাই একমত হবে,পুরোটা নয়।এখন তুমি আমাকে নিশ্চই যুক্তি দেখিয়ে বলবে,- স্যার, স্রষ্টা আমাদের একটি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন।আমরা এটা দিয়ে ভালো-মন্দ বিচার করে চলি,রাইট?'
- 'জ্বি স্যার।'
- 'কিন্তু সাজিদ, এটা খুবই লেইম লজিক,ইউ নো? ধরো, আমি তোমার হাতে বাজারের একটি লিষ্ট দিলাম।লিষ্টে যা যা কিনতে হবে, তার সবকিছু লেখা আছে।এখন তুমি বাজার করে ফিরলে।তুমি ঠিক তাই তাই কিনলে যা আমি লিষ্টে লিখে দিয়েছি।এবং তুমি এটা করতে বাধ্য।'
এতটুকু বলে স্যার আমার কাছে জানতে চাইলেন,- 'বুঝতে পারছো?'
আমি বললাম,- 'জ্বি স্যার।'
- 'ভেরি গুড! ধরো, তুমি বাজার করে আসার পর, একজন জিজ্ঞেস করলো, সাজিদ কি কি বাজার করেছো? তখন আমি উত্তর দিলাম,- 'ওর যা যা খেতে মন চেয়েছে, তা-ই তা-ই কিনেছে। বলতো, আমি সত্য বলেছি কিনা?'
আমি বললাম,- 'নাহ, আপনি মিথ্যা বলেছেন।'
স্যার চিৎকার করে বলে উঠলেন,- 'এক্সাক্টলি। ইউ হ্যাভ গট দ্য পয়েন্ট,মাই ডিয়ার।আমি মিথ্যা বলেছি।আমি লিষ্টে বলেই দিয়েছি তোমাকে কি কি কিনতে হবে।তুমি ঠিক তা-ই তা-ই কিনেছো যা আমি কিনতে বলেছি।যা কিনেছো সব আমার পছন্দের জিনিস। এখন আমি যদি বলি,- 'ওর যা যা খেতে মন চেয়েছে,সে তা-ই তা-ই কিনেছে', তাহলে এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা,না?'
- 'জ্বি,স্যার।'
- 'ঠিক স্রষ্টাও এভাবে মিথ্যা বলেছেন।দুই নাম্বারি করেছেন। তিনি অনেক আগে আমাদের তাকদির লিখে তা আমাদের গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন।এখন আমরা সেটাই করি, যা স্রষ্টা সেখানে লিখে রেখেছেন।আবার, এ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে, এই কাজের জন্য কেউ জান্নাতে যাচ্ছে, কেউ জাহান্নামে।কিন্তু কেন? এখানে মানুষের তো কোন হাত নেই।ম্যানুয়ালটা স্রষ্টার তৈরি। আমরা তো জাষ্ট পারফর্মার।স্ক্রিপ্ট রাইটার তো স্রষ্টা।স্রষ্টা এরজন্য আমাদের কাউকে জান্নাত,কাউকে জাহান্নাম দিতে পারেন না। যুক্তি তাই বলে,ঠিক?'
আমি চুপ করে রইলাম। পুরো ক্লাশে পিনপতন নিরবতা বিরাজ করছে তখন।
স্যার বললেন,- 'হ্যাভ ইউ এ্যানি প্রপার লজিক অন দ্যাট টিপিক্যাল কোয়েশ্চান,ডিয়ার?'
আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম।

স্যার মুচকি হাসলেন। মনে হলো- উনি ধরেই নিয়েছেন যে, উনি আমাকে এবার সত্যি সত্যিই কুপোকাত করে দিয়েছেন।বিজয়ীর হাসি।
আমাকে যারা চিনে তারা জানে, আমি কখনো কারো প্রশ্নের উত্তর দিতে সময় নিই না।আজকে যেহেতু তার ব্যতিক্রম ঘটলো, আমার বন্ধুরা আমার দিকে ড্যাব ড্যাব চোখ করে তাকালো।তাদের চাহনি দেখে মনে হচ্ছিলো, এই সাজিদকে তারা চিনেই না।কোনদিন দেখে নি।
আর, ক্লাশে আমার বিরুদ্ধ মতের যারা আছে, তাদের চেহারা তখন মূহুর্তেই উজ্জ্বল বর্ণ ধারন করলো।তারা হয়তো মনে মনে বলতে লাগলো,- 'মোল্লার দৌঁড় অই মসজিদ পর্যন্তই।হা হা হা'।

আমি মুখ তুলে স্যারের দিকে তাকালাম।মুচকি হাসিটা স্যারের মুখে তখনও বিরাজমান।
আমি বললাম,- 'স্যার, এই ক্লাশে কার সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?'
স্যার ভ্যাবাচ্যাকা খেলেন। স্যার জিজ্ঞেস করেছেন কি আর আমি বলছি কি।
স্যার বললেন,- 'বুঝলাম না।'
- 'মানে, আমাদের ক্লাশের কার মেধা কি রকম, সে বিষয়ে আপনার কি ধারনা?'
- 'ভালো ধারনা। ছাত্রদের সম্পর্কে একজন শিক্ষকেরই তো সবচেয়ে ভালো জ্ঞান থাকে।'
আমি বললাম,- 'স্যার, আপনি বলুন তো, এই ক্লাশের কারা কারা ফাষ্ট ক্লাশ আর কারা কারা সেকেন্ড ক্লাশ পাবে?'
স্যার কিছুটা বিস্মিত হলেন। বললেন,- 'আমি তোমাকে অন্য বিষয়ে প্রশ্ন করেছি।তুমি 'আউট অফ কনটেক্সট' এ গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করছো,সাজিদ।'
- 'না স্যার, আমি কনটেক্সটেই আছি। আপনি উত্তর দিন।'
স্যার বললেন,- 'এই ক্লাশ থেকে রায়হান, মমতাজ, ফারহানা, সজীব, ওয়ারেশ, ইফতি, সুমন,জাবেদ এবং তুমি ফাষ্ট ক্লাশ পাবে। আর বাকিরা সেকেন্ড ক্লাশ।'
স্যার যাদের নাম বলেছেন, তারা সবাই ক্লাশের ব্রিলিয়্যান্ট ষ্টুডেন্ট।সুতরাং, স্যারের অনুমান খুব একটা ভুল না।
আমি বললাম,- 'স্যার, আপনি এটা লিখে দিতে পারেন?'
- 'Why not'- স্যার বললেন।
এই বলে তিনি খচখচ করে একটা কাগজের একপাশে যারা ফাষ্ট ক্লাশ পাবে তাদের নাম, অন্যপাশে যারা সেকেন্ড ক্লাশ পাবে,তাদের নাম লিখে আমার হাতে দিলেন।
আমি বললাম,- 'স্যার, ধরে নিলাম যে আপনার ভবিষ্যৎবাণী সম্পূর্ণ সত্য হয়েছে।মানে, আপনি ফাষ্ট ক্লাশ পাবে বলে যাদের নাম লিখেছেন,তারা সবাই ফাষ্ট ক্লাশ পেয়েছে,আর যারা সেকেন্ড ক্লাশ পাবে লিখেছেন, তাদের সবাই সেকেন্ড ক্লাশ পেয়েছে।'
- 'হুম, তো?'
- 'এখন, স্যার বলুন তো, যারা ফাষ্ট ক্লাশ পেয়েছে, আপনি এই কাগজে তাদের নাম লিখেছেন বলেই কি তারা ফাষ্ট ক্লাশ পেয়েছে?'
- 'নাহ তো।'
- 'যারা সেকেন্ড ক্লাশ পেয়েছে, তারা সেকেন্ড ক্লাশ পাবে বলে আপনি এই কাগজে লিখেছেন বলেই কি তারা সেকেন্ড ক্লাশ পেয়েছে?'
স্যার বললেন,- 'একদম না।'
- 'তাহলে মূল ব্যাপারটি কি স্যার?'
স্যার বললেন,- 'মূল ব্যাপার হলো, আমি তোমাদের শিক্ষক।আমি খুব ভালো জানি পড়াশুনায় তোমাদের কে কেমন।আমি খুব ভালো করেই জানি, কার কেমন মেধা। সুতরাং, আমি চোখ বন্ধ করেই বলে দিতে পারি কে কেমন রেজাল্ট করবে।'
আমি হাসলাম। বললাম,- 'স্যার, যারা সেকেন্ড ক্লাশ পেয়েছে, তারা যদি আপনাকে দোষ দেয়? যদি বলে, আপনি 'সেকেন্ড ক্লাশ' ক্যাটাগরিতে তাদের নাম লিখেছেন বলেই তারা সেকেন্ড ক্লাশ পেয়েছে?'

স্যার কপালের ভাঁজ লম্বা করে বললেন,- 'ইট উড বি টোট্যালি বুলশিট! আমি কেন এর জন্য দায়ী হবো? এটা তো সম্পূর্ণ তাদের দায়। আমি শুধু তাদের মেধা,যোগ্যতা সম্পর্কে ধারনা রাখি বলেই অগ্রিম বলে দিতে পেরেছি যে কে কেমন রেজাল্ট করবে।'
আমি আবার জোরে জোরে হাসতে লাগলাম। পুরো ক্লাশ আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।
আমি থামলাম।বললাম,- 'স্যার, তাকদির তথা ভাগ্যটাও ঠিক এরকম। আপনি যেমন আমাদের মেধা, যোগ্যতা,ক্ষমতা সম্পর্কে ভালো ধারনা রাখেন, স্রষ্টাও তেমনি তার সৃষ্টি সম্পর্কে ধারনা রাখেন।আপনার ধারনা মাঝে মাঝে ভুল হতে পারে, কিন্তু স্রষ্টার ধারনায় কোন ভুল নেই।স্রষ্টা হলেন আলিমুল গায়েব।তিনি ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব জানেন।
আপনি যেরকম আমাদের সম্পর্কে পূর্বানুমান করে লিখে দিয়েছেন যে, আমাদের মধ্যে কারা কারা ফাষ্ট ক্লাশ পাবে, আর কারা সেকেন্ড ক্লাশ।এর মানে কিন্তু এই না যে, আপনি বলেছেন বলে আমাদের কেউ ফাষ্ট ক্লাশ পাচ্ছি, কেউ সেকেন্ড ক্লাশ।
স্রষ্টাও সেরকম পূর্বানুমান করে আমাদের তাকদির লিখে রেখেছেন।তাতে লেখা আছে দুনিয়ায় আমরা কে কি করবো।এর মানেও কিন্তু এই না যে, তিনি লিখে দিয়েছেন বলেই আমরা কাজগুলো করছি।বরং, এর মানে হলো এই- তিনি জানেন যে, আমরা দুনিয়ায় এই এই কাজগুলো করবো।তাই তিনি তা অগ্রিম লিখে রেখেছেন তাকদির হিসেবে।
আমাদের মধ্যে কেউ ফাষ্ট ক্লাশ আর কেউ সেকেন্ড ক্লাশ পাবার জন্য যেমন কোনভাবেই আপনি দায়ী নন, ঠিক সেভাবে, মানুষের মধ্যে কেউ ভালো কাজ করে জান্নাতে, আর কেউ খারাপ কাজ করে জাহান্নামে যাবার জন্যও স্রষ্টা দায়ী নন।স্রষ্টা জানেন যে, আপনি আজ সকালে একজনকে খুন করবেন।তাই তিনি সেটা আগেই আপনার তাকদিরে লিখে রেখেছেন।এটার মানে এই না যে- স্রষ্টা লিখে রেখেছে বলেই আপনি খুনটি করেছেন।এর মানে হলো- স্রষ্টা জানেন যে,আপনি আজ খুনটি করবেন।তাই সেটা অগ্রিম লিখে রেখেছেন আপনার তাকদির হিসেবে।
স্যার, ব্যাপারটা কি এখন পরিষ্কার?
স্যারের চেহারাটা কিছুটা ফ্যাকাশে মনে হলো। তিনি বললেন,- 'হুম।'
এরপর স্যার কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন।তারপর বললেন,- 'আমি শুনেছিলাম তুমি ক'দিন আগেও নাস্তিক ছিলে।তুমি আবার আস্তিক হলে কবে?'
আমি হা হা হা করে হাসলাম। বললাম,- 'এই প্রশ্নটা কিন্তু স্যার আউট অফ কনটেক্সট।'
এটা শুনে পুরো ক্লাশ হাসিতে ফেঁটে পড়লো।

পিরিওডের একদম শেষদিকে, স্যার আবার আমাকে দাঁড় করালেন।বললেন,- 'বুঝলাম স্রষ্টা আগে থেকে জানেন বলেই লিখে রেখেছেন।তিনি যেহেতু আগে থেকেই জানেন কে ভালো কাজ করবে আর কে খারাপ কাজ করবে, তাহলে পরীক্ষা নেওয়ার কি দরকার? যারা জান্নাতে যাওয়ার তাদের জান্নাতে, যারা জাহান্নামে যাওয়ার তাদের জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেই তো হতো,তাই না?'
আমি আবার হাসলাম। আমার হাতে স্যারের লিখে দেওয়া কাগজটি তখনও ধরা ছিলো।আমি সেটা স্যারকে দেখিয়ে বললাম,- 'স্যার, এই কাগজে কারা কারা ফাষ্ট ক্লাশ পাবে, আর কারা কারা সেকেন্ড ক্লাশ পাবে, তাদের নাম লেখা আছে। তাহলে এই কাগজটির ভিত্তিতেই রেজাল্ট দিয়ে দিন।বাড়তি করে পরীক্ষা নিচ্ছেন কেন?'
স্যার বললেন,- 'পরীক্ষা না নিলে কেউ হয়তো এই বলে অভিযোগ করতে পারে যে,- 'স্যার আমাকে ইচ্ছা করেই সেকেন্ড ক্লাশ দিয়েছে।পরীক্ষা দিলে আমি হয়তো ঠিকই ফাষ্ট ক্লাশ পেতাম।'
আমি বললাম,- 'একদম তাই,স্যার। স্রষ্টাও এইজন্য পরীক্ষা নিচ্ছেন,যাতে কেউ বলতে না পারে- দুনিয়ায় পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলে আমি অবশ্যই আজকে জান্নাতে থাকতাম। স্রষ্টা ইচ্ছা করেই আমাকে জাহান্নামে পাঠিয়েছে।'
ক্লাশের সবাই হাত তালি দিতে শুরু করলো। স্যার বললেন,- 'সাজিদ, আই হ্যাভ এ্যা লাষ্ট কোয়েশ্চান।'
- 'ডেফিনেইটলি, স্যার।'- আমি বললাম।
- 'আচ্ছা, যে মানুষ পুরো জীবনে খারাপ কাজ বেশি করে,সে অন্তত কিছু না কিছু ভালো কাজ তো করে,তাই না?'
- 'জ্বি স্যার।'

- 'তাহলে, এই ভালো কাজগুলোর জন্য হলেও তো তার জান্নাতে যাওয়া দরকার,তাই না?'
আমি বললাম,- 'স্যার, পানি কিভাবে তৈরি হয়?'
স্যার আবার অবাক হলেন। হয়তো বলতে যাচ্ছিলেন যে, এই প্রশ্নটাও আউট অফ কনটেক্সট, কিন্তু কি ভেবে যেন চুপসে গেলেন।বললেন,- 'দুই ভাগ হাইড্রোজেন আর এক ভাগ অক্সিজেনের সংমিশ্রণে।'
আমি বললাম,- 'আপনি এক ভাগ হাইড্রোজেন আর এক ভাগ অক্সিজেন দিয়ে পানি তৈরি করতে পারবেন?'
- 'কখনোই না।'
- 'ঠিক সেভাবে, এক ভাগ ভালো কাজ আর এক ভাগ মন্দ কাজে জান্নাত পাওয়া যায়না। জান্নাত পেতে হলে হয় তিন ভাগই ভালো কাজ হতে হবে, নতুবা দুই ভাগ ভালো কাজ, এক ভাগ মন্দ কাজ হতে হবে। অর্থাৎ, ভালো কাজের পাল্লা ভারি হওয়া আবশ্যক।'
সেদিন আর কোন প্রশ্ন স্যার আমাকে করেন নি।'
-
এক নিশ্বাঃসে পুরোটা পড়ে ফেললাম।কোথাও একটুও থামিনি। পড়া শেষে যেই মাত্র সাজিদের ডায়েরিটা বন্ধ করতে যাবো, অমনি দেখলাম, পেছন থেকে সাজিদ এসে আমার কান মলে ধরেছে।সে বললো,- 'তুই তো সাংঘাতিক লেভেলের চোর।'
আমি হেসে বললাম,- 'হা হা হা। স্যারকে তো ভালো জব্দ করেছিস ব্যাটা।'
কথাটা সে কানে নিলো বলে মনে হলো না।নিজের সম্পর্কে কোন কমপ্লিমেন্টই সে আমলে নেয় না। গামছায় মুখ মুছতে মুছতে সে খাটের উপর শুয়ে পড়লো।
আমি তার কাঁধে হাত রাখলাম। বললাম,- 'সাজিদ......'
- 'হু'
- 'একটা কথা বলবো?'
- 'বল।'
- 'জানিস, একসময় যুবকেরা হিমু হতে চাইতো।হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে, মরুভূমিতে গর্ত খুঁড়ে জ্যোৎস্না দেখার স্বপ্ন দেখতো।দেখিস,এমন একদিন আসবে, যেদিন যুবকেরা সাজিদ হতে চাইবে। ঠিক তোর মতো......'
এই বলে আমি সাজিদের দিকে তাকালাম।দেখলাম, ততক্ষণে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। অঘোর ঘুম........

স্রষ্টা কেন মন্দ কাজের দায় নেন না?

ক্লাশে নতুন একজন স্যার এসেছেন।নাম- মফিজুর রহমান।

হ্যাংলা-পাতলা গড়ন।বাতাস আসলেই যেন ঢলে পড়বে মতন অবস্থা শরীরের।ভদ্রলোকের চেহারার চেয়ে চোখ দুটি অস্বাভাবিক রকম বড়।দেখলেই মনে হয় যেন বড় বড় সাইজের দুটি জলপাই, কেউ খোদাই করে বসিয়ে দিয়েছে।

ভদ্রলোক খুবই ভালো মানুষ।উনার সমস্যা একটিই- ক্লাসে উনি যতোটা না বায়োলজি পড়ান, তারচেয়ে বেশি দর্শন চর্চা করেন।ধর্ম কোথা থেকে আসলো, ঠিক কবে থেকে মানুষ ধার্মিক হওয়া শুরু করলো, 'ধর্ম আদতে কি' আর, 'কি নয়' তার গল্প করেন।

-

আজকে উনার চতুর্থ ক্লাশ। পড়াবেন Analytical techniques & bio-informatics। চতুর্থ সেমিষ্টারে এটা পড়ানো হয়।

স্যার এসে প্রথমে বললেন,- 'Good morning, guys....'

সবাই সমস্বরে বললো,- 'Good morning, sir...'

এরপর স্যার জিজ্ঞেস করলেন,- 'সবাই কেমন আছো? '

স্যারের আরো একটি ভালো দিক হলো- উনি ক্লাশে এলে এভাবেই সবার কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন।সাধারণত হায়ার লেভেলে যেটা সব শিক্ষক করেন না। তারা রোবটের মতো ক্লাশে আসেন,যন্ত্রের মতো করে লেকচারটা পড়িয়ে বেরিয়ে যান।সেদিক থেকে মফিজুর রহমান নামের এই ভদ্রলোক অনেকটা অন্যরকম।

আবারো সবাই সমস্বরে উত্তর দিলো।কিন্তু গোলমাল বাঁধলো এক জায়গায়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কয়েকজন উত্তর দিয়েছে এভাবে- 'আলহামমমমদুলিল্লাহ ভালো।'

স্যার কপালের ভাঁজ একটু দীর্ঘ করে বললেন,- 'আলহামদুলিল্লাহ্ ভালো বলেছো কে কে?'

অদ্ভুত প্রশ্ন। সবাই থতমত খেলো।

একটু আগেই বলেছি স্যার একটু অন্যরকম। প্রাইমারি লেভেলের টিচারদের মতো ক্লাশে এসে বিকট চিৎকার করে Good Morning বলেন, সবাই কেমন আছে জানতে চান।এখন 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলার জন্য কি প্রাইমারি লেভেলের শিক্ষকদের মতো বেত দিয়ে পিটাবেন নাকি?

সাজিদের তখন তার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক বাবুল চন্দ্র দাশের কথা মনে পড়ে গেলো।এই লোকটা ক্লাশে কেউ দুটোর বেশি হাঁচি দিলেই বেত দিয়ে আচ্ছামতন পিটাতেন। উনার কথা হলো- 'হাঁচির সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে দু'টি। দু'টির বেশি হাঁচি দেওয়া মানে ইচ্ছে করেই বেয়াদবি করা।'

যাহোক, বাবুল চন্দ্রের পাঠ তো কবেই চুকেছে, এবার মফিজ চন্দ্রের হাতেই না গণ পিটুনি খাওয়া লাগে।

ক্লাশের সর্বমোট সাতজন দাঁড়ালো। এরা সবাই 'আলহামদুলিল্লাহ্ ভালো' বলেছে। এরা হচ্ছে- রাকিব, আদনান, জুনায়েদ, সাকিব, মরিয়ম,রিতা এবং সাজিদ।

স্যার সবার চেহারাটা একটু ভালোমতো পরখ করে নিলেন। এরপর পিক করে হেসে দিয়ে বললেন,- 'বসো।'

সবাই বসলো। আজকে আর মনে হয় এ্যাকাডেমিক পড়াশুনা হবেনা। দর্শনের তাত্ত্বিক আলাপ হবে।

ঠিক তাই হলো। মফিজুর রহমান স্যার আদনানকে দাঁড় করালো। বললেন,- 'তুমিও বলেছিলে সেটা, না?'

- 'জ্বি স্যার।'- আদনান উত্তর দিলো।

স্যার বললেন,- 'আলহামদুলিল্লাহ্'র অর্থ কি জানো?'

আদনান মনে হয় একটু ভয় পাচ্ছে। সে ঢোঁক গিলতে গিলতে বললো,- 'জ্বি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ্ অর্থ হলো- সকল প্রশংসা কেবলি আল্লাহর।'

স্যার বললেন,- ' সকল প্রশংসা কেবলি আল্লাহর।'

স্যার এই বাক্যটি দু'বার উচ্চারণ করলেন।এরপর আদনানের দিকে তাকিয়ে বললেন,- 'বসো।'

আদনান বসলো। এবার স্যার রিতাকে দাঁড় করালেন। স্যার রিতার কাছে জিজ্ঞেস করলেন,- 'আচ্ছা, পৃথিবীতে চুরি-ডাকাতি আছে?'

রিতা বললো,- 'আছে।'

- 'খুন-খারাবি, রাহাজানি, ধর্ষণ?'
-- 'জ্বি,আছে।'
- 'কথা দিয়ে কথা না রাখা, মানুষকে ঠকানো,লোভ-লালসা এসব?'
- 'জ্বি, আছে।'
- 'এগুলো কি প্রশংসাযোগ্য?'
- 'না।'
'তাহলে মানুষ একটি ভালো কাজ করার পর তার সব প্রশংসা যদি আল্লাহর হয়, মানুষ যখন চুরি-ডাকাতি করে, লোক ঠকায়, খুন-খারাবি করে,ধর্ষণ করে, তখন সব মন্দের ক্রেডিট আল্লাহকে দেওয়া হয়না কেন? উনি প্রশংসার ভাগ পাবেন, কিন্তু দূর্নামের ভাগ নিবেন না, তা কেমন হয়ে গেলো না?'
রিতা মাথা নিঁচু করে চুপ করে আছে।স্যার বললেন,- 'এখানেই ধর্মের ভেল্কিবাজি। ইশ্বর সব ভালোটা বুঝেন, কিন্তু মন্দটা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। আদতে, ইশ্বর বলে কেউ নেই।যদি থাকতো, তাহলে তিনি এরকম একচোখা হতেন না। বান্দার ভালো কাজের ক্রেডিটটা নিজে নিয়ে নিবেন, কিন্তু বান্দার মন্দ কাজের বেলায় বলবেন- 'উহু, অইটা থেকে আমি পবিত্র। অইটা তোমার ভাগ।'
স্যারের কথা শুনে ক্লাশে যে ক'জন নাস্তিক আছে, তারা হাত তালি দেওয়া শুরু করলো। সাজিদের পাশে যে নাস্তিকটা বসেছে, সে তো বলেই বসলো,- 'মফিজ স্যার হলেন আমাদের বাঙলার প্লেটো।'
স্যার বলেই যাচ্ছেন ধর্ম আর স্রষ্টার অসারতা নিয়ে।
-
এবার সাজিদ দাঁড়ালো। স্যারের কথার মাঝে সে বললো,- 'স্যার, সৃষ্টিকর্তা একচোখা নন। তিনি মানুষের ভালো কাজের ক্রেডিট নেন না। তিনি ততোটুকুই নেন, যতোটুকু তিনি পাবেন।ইশ্বর আছেন।'
স্যার সাজিদের দিকে একটু ভালোমতো তাকালেন।বললেন,- 'শিওর?'
- 'জ্বি।'
- 'তাহলে মানুষের মন্দ কাজের জন্য কে দায়ী?'
- 'মানুষই দায়ী।- সাজিদ বললো।
- 'ভালো কাজের জন্য?'
- 'তাও মানুষ।'
স্যার এবার চিৎকার করে বললেন,- 'এক্স্যাক্টলি, এটাই বলতে চাচ্ছি। ভালো/মন্দ এসব মানুষেরই কাজ।সো, এর সব ক্রেডিটই মানুষের।এখানে স্রষ্টার কোন হাত নেই। সো, তিনি এখান থেকে না প্রশংসা পেতে পারেন, না তিরস্কার।সোজা কথায়, স্রষ্টা বলতে কেউই নেই।'
ক্লাশে পিনপতন নিরবতা। সাজিদ বললো,- 'মানুষের ভালো কাজের জন্য স্রষ্টা অবশ্যই প্রশংসা পাবেন, কারন, মানুষকে স্রষ্টা ভালো কাজ করার জন্য দুটি হাত দিয়েছেন, ভালো জিনিস দেখার জন্য দুটি চোখ দিয়েছেন, চিন্তা করার জন্য মস্তিষ্ক দিয়েছেন, দুটি পা দিয়েছেন। এসবকিছুই স্রষ্টার দান।তাই ভালো কাজের জন্য তিনি অবশ্যই প্রশংসা পাবেন।'
স্যার বললেন,- 'এই গুলো দিয়ে তো মানুষ খারাপ কাজও করে, তখন?'
- 'এর দায় স্রষ্টার নয়।'
- 'হা হা হা হা। তুমি খুব মজার মানুষ দেখছি।হা হা হা হা।'
সাজিদ বললো,- 'স্যার, স্রষ্টা মানুষকে একটি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন।এটা দিয়ে সে নিজেই নিজের কাজ ঠিক করে নেয়। সে কি ভালো করবে, না মন্দ।'
স্যার তিরস্কারের সুরে বললেন, - 'ধর্মীয় কিতাবাদির কথা বাদ দাও,ম্যান। কাম টু দ্য পয়েণ্ট এন্ড বি লজিক্যাল।'
সাজিদ বললো, - 'স্যার, আমি কি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি ব্যাপারটা?'
- 'অবশ্যই।'- স্যার বললেন।
সাজিদ বলতে শুরু করলো-
'ধরুন, খুব গভীর সাগরে একটি জাহাজ ডুবে গেলো। ধরুন, সেটা বার্মুডা ট্রায়াঙ্গাল। এখন কোন ডুবুরিই সেখানে ডুব দিয়ে জাহাজের মানুষগুলোকে উদ্ধার করতে পারছে না।বার্মুডা ট্রায়াঙ্গালে তো নয়ই। এই মূহূর্তে ধরুন

সেখানে আপনার আবির্ভাব ঘটলো। আপনি সবাইকে বললেন,- 'আমি এমন একটি যন্ত্র বানিয়ে দিতে পারি, যেটা গায়ে লাগিয়ে যেকোন মানুষ খুব সহজেই ডুবে যাওয়া জাহাজের মানুষগুলোকে উদ্ধার করতে পারবে।ডুবুরির কোনরকম ক্ষতি হবে না।'
স্যার বললেন,- 'হুম, তো?'
- 'ধরুন, আপনি যন্ত্রটি তৎক্ষণাৎ বানালেন, এবং একজন ডুবুরি সেই যন্ত্র গায়ে লাগিয়ে সাগরে নেমে পড়লো ডুবে যাওয়া মানুষগুলোকে উদ্ধার করতে।'
ক্লাশে তখন একদম পিনপতন নিরবতা। সবাই মুগ্ধ শ্রোতা।কারো চোখের পলকই যেন পড়ছেনা।
সাজিদ বলে যেতে লাগলো-
'ধরুন, ডুবুরিটা ডুব দিয়ে ডুবে যাওয়া জাহাজে চলে গেলো। সেখানে গিয়ে সে দেখলো, মানুষগুলো হাঁসপাশ করছে।সে একে একে সবাইকে একটি করে অক্সিজেনের সিলিন্ডার দিয়ে দিলো। এবং তাদের একজন একজন করে উদ্ধার করতে লাগলো।'
স্যার বললেন,- 'হুম।'
- 'ধরুন, সব যাত্রীকে উদ্ধার করা শেষ।বাকি আছে মাত্র একজন। ডুবুরিটা যখন শেষ লোকটাকে উদ্ধার করতে গেলো, তখন ডুবুরিটা দেখলো- এই লোকটাকে সে আগে থেকেই চিনে।'
এতটুকু বলে সাজিদ স্যারের কাছে প্রশ্ন করলো,- 'স্যার, এরকম কি হতে পারেনা?'
স্যার বললেন,- 'অবশ্যই হতে পারে। লোকটা ডুবুরির আত্মীয় বা পরিচিত হয়ে যেতেই পারে। অস্বাভাবিক কিছু নয়।'
সাজিদ বললো,- 'জ্বি। ডুবুরিটা লোকটাকে চিনতে পারলো। সে দেখলো,- এটা হচ্ছে তার চরম শত্রু।এই লোকের সাথে তার দীর্ঘ দিনের বিরোধ চলছে।এরকম হতে পারেনা,স্যার?
- 'হ্যাঁ, হতে পারে।'
সাজিদ বললো,- 'ধরুন, ডুবুরির মধ্যে ব্যক্তিগত হিংসাবোধ জেগে উঠলো।সে শত্রুতাবশঃত ঠিক করলো যে, এই লোকটাকে সে বাঁচাবেনা। কারন, লোকটা তার দীর্ঘদিনের শত্রু। সে একটা চরম সুযোগ পেলো এবং প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে উঠলো। ধরুন, ডুবুরি অই লোকটাকে অক্সিজেনের সিলিন্ডার তো দিলোই না, উল্টো উঠে আসার সময় লোকটাকে পেটে একটা জোরে লাথি দিয়ে আসলো।'
ক্লাশে তখনও পিনপতন নিরবতা। সবাই সাজিদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।
স্যার বললেন,- 'তো, তাতে কি প্রমান হয়,সাজিদ?'
সাজিদ স্যারের দিকে ফিরলো। ফিরে বললো,- 'Let me finish my beloved sir....'
- 'Okey, you are permitted. carry on'- স্যার বললেন।
সাজিদ এবার স্যারকে প্রশ্ন করলো,- 'স্যার, বলুন তো, এই যে, এতগুলো ডুবে যাওয়া লোককে ডুবুরিটা উদ্ধার করে আনলো, এর জন্য আপনি কি কোন ক্রেডিট পাবেন?'
স্যার বললেন,- 'অবশ্যই আমি ক্রেডিট পাবো। কারন, আমি যদি অই বিশেষ যন্ত্রটি না বানিয়ে দিতাম, তাহলে তো এই লোকগুলোর কেউই বাঁচতো না।'
সাজিদ বললো,- 'একদম ঠিক স্যার। আপনি অবশ্যই এরজন্য ক্রেডিট পাবেন।কিন্তু, আমার পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে- 'ডুবুরিটা সবাইকে উদ্ধার করলেও, একজন লোককে সে শত্রুতা বশঃত উদ্ধার না করে মৃত্যুকূপে ফেলে রেখে এসেছে। আসার সময় তার পেটে একটি জোরে লাথিও দিয়ে এসেছে। ঠিক?'
- 'হুম।'
- 'এখন স্যার, ডুবুরির এহেন অন্যায়ের জন্য কি আপনি দায়ী হবেন? ডুবুরির এই অন্যায়ের ভাগটা কি সমানভাবে আপনিও ভাগ করে নেবেন?'
স্যার বললেন,- 'অবশ্যই না। ওর দোষের ভাগ আমি কেন নেবো? আমি তো তাকে এরকম অন্যায় কাজ করতে বলিনি।সেটা সে নিজে করেছে।সুতরাং, এর পুরো দায় তার।'
সাজিদ এবার হাসলো। হেসে সে বললো,- 'স্যার, ঠিক একইভাবে, আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ভালো কাজ করার জন্য। আপনি যেরকম ডুবুরিকে একটা বিশেষ যন্ত্র বানিয়ে দিয়েছেন, সেরকম সৃষ্টিকর্তাও মানুষকে অনুগ্রহ করে হাত,পা,চোখ,নাক,কান,মুখ,মস্তিষ্ক এসব দিয়ে দিয়েছেন। সাথে দিয়েছেন একটি স্বাধীন

ইচ্ছাশক্তি।এখন এসব ব্যবহার করে সে যদি কোন ভালো কাজ করে, তার ক্রেডিট স্রষ্টাও পাবেন, যেরকম বিশেষ যন্ত্রটি বানিয়ে আপনি ক্রেডিট পাচ্ছেন।আবার, সে যদি এগুলো ব্যবহার করে কোন খারাপ কাজ করে, গর্হিত কাজ করে, তাহলে এর দায়ভার স্রষ্টা নেবেন না।যেরকম, ডুবুরির অই অন্যায়ের দায় আপনার উপর বর্তায় না। আমি কি বোঝাতে পেরেছি,স্যার?'

ক্লাশে এতক্ষণ ধরে পিনপতন নিরবতা বিরাজ করছিলো। এবার ক্লাশের সকল আস্তিকেরা মিলে একসাথে জোরে জোরে হাত তালি দেওয়া শুরু করলো।

স্যারের জবাবের আশায় সাজিদ স্যারের দিকে তাকিয়ে আছে। স্যার বললেন,- 'হুম। আই গট দ্য পয়েণ্ট।'- এই বলে স্যার সেদিনের মতো ক্লাশ শেষ করে চলে যান।

শূন্যস্থান থেকে স্রষ্টার দূরত্ব

সাজিদের কাছে একটি মেইল এসেছে সকালবেলা।মেইলটি পাঠিয়েছে তার নাস্তিক বন্ধু বিপ্লব ধর। বিপ্লব দা'কে আমিও চিনি। সদা হাস্য এই লোকটার সাথে মাঝে মাঝেই টি.এস.সিতে দেখা হতো।দেখা হলেই উনি একটি হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন,- 'তুই কি এখনো রাতের বেলা ভূত দেখিস?'

বিপ্লব দা মনে হয় হাসিটি প্রস্তুত করেই রাখতো।দেখা হওয়া মাত্রই প্রদর্শন। বিপ্লব দা'কে চিনতাম সাজিদের মাধ্যমে। সাজিদ আর বিপ্লব দা একই ডিপার্টমেন্টের। বিপ্লব দা সাজিদের চেয়ে দু ব্যাচ সিনিয়র।
সাজিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে যে প্রথমে নাস্তিক হয়ে গিয়েছিলো, তার পুরো ক্রেডিটটাই বিপ্লব দা'র। বিপ্লব দা তাকে বিভিন্ন নাস্তিক, এ্যাগনোষ্টিকদের বই-টই পড়িয়ে নাস্তিক বানিয়ে ফেলেছিলো। সাজিদ এখন আর নাস্তিক নেই।

আমি ক্লাশ শেষে রুমে ঢুকে দেখলাম সাজিদ বরাবরের মতোই কম্পিউটার গুতাচ্ছে।আমাকে দেখামাত্রই বললো,- 'তোর দাওয়াত আছে।'
- 'কোথায়?'- আমি জিজ্ঞেস করলাম।
সাজিদ বললো,- 'বিপ্লব দা দেখা করতে বলেছেন।'
আমার সাথে উনার কোন লেনদেন নেই।আমাকে এভাবে দেখা করতে বলার হেতু কি বুঝলাম না।সাজিদ বললো,- 'ঘাবড়ে গেলি নাকি? তোকে একা না, সাথে আমাকেও।'
এই বলে সাজিদ বিপ্লব দা'র মেইলটি ওপেন করে দেখালো।মেইলটি হুবহু এরকম-

'সাজিদ,
আমি তোমাকে একজন প্রগতিশীল, উদারমন সম্পন্ন, মুক্তোমনা ভাবতাম।পড়াশুনা করে তুমি কথিত ধর্মীয় গোঁড়ামি আর অন্ধ বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে এসেছিলে।কিন্তু তুমি যে আবার সেই অন্ধ বিশ্বাসের জগতে ফিরে যাবে- সেটা কল্পনাও করিনি আমি।আজ বিকেলে বাসায় এসো। তোমার সাথে আলাপ আছে।'

আমরা খাওয়া-দাওয়া করে, দুপুরের নামাজ পড়ে বিপ্লব দা'র সাথে দেখা করার জন্য বের হলাম।বিপ্লব দা আগে থাকতেন বনানী, এখন থাকেন কাঁটাবন। জ্যাম-ট্যাম কাটিয়ে আমরা যখন বিপ্লব দা'র বাসায় পৌঁছি, তখন আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে।বিপ্লব দা'র সাথে হ্যান্ডশেক করে আমরা বসলাম না। সাজিদ বললো,- 'দাদা, আলাপ একটু পরে হবে। আসরের নামাজটা পড়ে আসি আগে।'
বিপ্লব দা না করলেন না।আমরা বেরিয়ে গেলাম।পার্শ্ববর্তী মসজিদে আসরের নামাজ পড়ে ব্যাক করলাম উনার বাসায়।
বিপ্লব দা ইতোমধ্যেই কফি তৈরি করে রেখেছেন।খুবই উন্নতমানের কফি।কফির গন্ধটা পুরো ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো মূহুর্তেই।
সাজিদ কফি হাতে নিতে নিতে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো,- 'জানিস, বিপ্লব দা'র এই কফি বিশ্ববিখ্যাত।ভূ-মধ্য সাগরীয় অঞ্চলের কফি।এইটা কানাডা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। বিপ্লব দা কানাডা থেকে অর্ডার করিয়ে আনেন।'
কফির কাপে চুমুক দিয়ে মনে হলো আসলেই সত্যি।এত ভালো কফি হতে পারে-ভাবাই যায় না।
সাজিদ এবার বিপ্লব দা'র দিকে তাকিয়ে বললো,- 'আলাপ শুরু হোক।'
বিপ্লব দা'র মুখে সদা হাস্য ভাবটা আজকে নেই। উনার পরম শিষ্যের এরকম অধঃপতনে সম্ভবত উনার মন কিছুটা বিষন্ন। তিনি বললেন,- 'তোমার সিদ্ধান্তের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তবে, তোমাকে একটি বিষয়ে বলার জন্যই আসতে বলেছি। হয়তো তুমি ব্যাপারটি জেনে থাকবে-তবুও।'
সাজিদ কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললো,- 'জানা বিষয়টাও আপনার মুখ থেকে শুনলে মনে হয় নতুন জানছি। আমি আপনাকে কতোটা পছন্দ করি তা তো আপনি জানেনেই।'

বিপ্লব দা কোন ভূমিকায় গেলেন না।সরাসরি বললেন,- 'ওই যে, তোমার সৃষ্টিকর্তা, উনার ব্যাপারে বলতে চাই। তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, তুমি হয়তো এ ব্যাপারে জানো। সম্প্রতি বিজ্ঞান প্রমান করেছে, এই মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্তার কোন দরকার নেই।মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে শুন্য থেকেই।আগে তোমরা, মানে বিশ্বাসীরা বলতে, একটা সামান্য সুঁচও যখন কোন কারিগর ছাড়া এমনি এমনি তৈরি হতে পারেনা, তাহলে এই গোটা মহাবিশ্ব কিভাবে তৈরি হবে আপনাআপনি? কিন্তু বিজ্ঞান এখন বলছে, এই মহাবিশ্ব শুন্য থেকে আপনাআপনিই তৈরি হয়েছে।কারো সাহায্য ছাড়াই।'

এই কথাগুলো বিপ্লব দা এক নাগাড়ে বলে গেলেন।মনে হয়েছে তিনি কোন নিঃশ্বাসই নেন নি এতক্ষণ।

সাজিদ বললো,- 'অদ্ভুত তো। তাহলে তো আমাকে আবার নাস্তিক হয়ে যেতে হবে দেখছি। হা হা হা হা।'

সাজিদ চমৎকার একটা হাসি দিলো। সাজিদ এইভাবে হাসতে পারে, তা আমি আজই প্রথম দেখলাম। বিপ্লব দা সেদিকে মনোযোগ দিয়েছেন বলে মনে হলো না। উনি মোটামুটি একটা লেকচার শুরু করেছেন।আমি আর সাজিদ খুব মনোযোগি ছাত্রের মতো উনার বৈজ্ঞানিক কথাবার্তা শুনছিলাম। তিনি যা বোঝালেন, বা বললেন, তার সার সংক্ষেপ এরকম।-

'পদার্থ বিজ্ঞানে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে কোয়াণ্টাম মেকানিক্স। এই কোয়ান্টাম মেকানিক্সে একটি থিওরি আছে, সেটি হলো- 'কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশান। এই কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের মূল কথা হলো,- 'মহাবিশ্বে পরম শুন্য স্থান বলে আদতে কিছু নেই। মানে, আমরা যেটাকে 'Nothing' বলে এতদিন জেনে এসেছি, বিজ্ঞান বলছে, আদতে 'Nothing' বলতে কিছুই নেই।প্রকৃতি শূন্য স্থান পছন্দ করেনা। তাই, যখনই কোন শুন্যস্থান (Nothing) তৈরি হয়, সেখানে এক সেকেন্ডের বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে কণা এবং প্রতিকণা (Matter & anti-matter) তৈরি হচ্ছে, এবং একটির সাথে অন্যটির ঘর্ষণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

তোমরা জানো কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের ধারনা কোথা হতে এসেছে?'

আমি বললাম,- 'না।'

বিপ্লব দা আবার বলতে শুরু করলেন,- ' এই ধারনা এসেছে হাইজেনবার্গের বিখ্যাত 'অনিশ্চয়তা নীতি' থেকে। হাইজেনবার্গের সেই বিখ্যাত সূত্রটা তোমরা জানো নিশ্চয়?'

সাজিদ বললো,- 'হ্যাঁ। হাইজেনবার্গ বলেছেন, আমরা কখনও একটি কণার অবস্থান এবং এর ভরবেগের সঠিক পরিমাণ একসাথে একুরেইটলি জানতে পারবো না। যদি অবস্থান সঠিকভাবে জানতে পারি, তাহলে এর ভরবেগের মধ্যে গলদ থাকবে।আবার যদি ভরবেগ সঠিকভাবে জানতে পারি, তাহলে এর অবস্থানের মধ্যে গলদ থাকবে।দুটো একইসাথে সঠিকভাবে জানা কখনোই সম্ভব না। এইটা যে সম্ভব না, এটা বিজ্ঞানের অসারতা না, আসলে এটা হলো কণার ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য। '

বিপ্লব দা বললেন,- 'এক্সাক্টলি। একদম তাই।হাইজেনবার্গের এই নীতিকে শক্তি আর সময়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।হাইজেনবার্গের এই নীতি যদি সত্যি হয়, তাহলে মহাবিশ্বে 'শূন্যস্থান' বলে কিছু থাকতে পারেনা। যদি থাকে, তাহলে তার অবস্থান ও ভরবেগ দুটোই শূন্য চলে আসে, যা হাইজেনবার্গের নীতি বিরুদ্ধ।'

এইটুকু বলে বিপ্লব দা একটু থামলো। কফির পট থেকে কফি ঢালতে ঢালতে বললেন,- 'বুঝতেছো তোমরা?'

সাজিদ বুঝছে কিনা জানিনা, তবে আমার কাছে ব্যাপারটি দূর্বোধ্য মনে হলেও, বিপ্লব দা'র উপস্থাপন ভঙ্গিমা সেটাকে অনেকটাই প্রাঞ্জল করে তুলছে।ভালো লাগছে।

বিপ্লব দা কফিতে চুমুক দিলেন। এরপর আবার বলতে শুরু করলেন,- 'তাহলে তোমরা বলো না, যে বিগ ব্যাং এর আগে তো কিছুই ছিলো না।না সময়, না শক্তি, না অন্যকিছু।তাহলে বিগ ব্যাং এর বিস্ফোরনটি হলো কিভাবে? এর জন্য নিশ্চয় কোন শক্তি দরকার? কোন বাহ্যিক বল দরকার,তাই না? এইটা বলে তোমরা স্রষ্টার ধারনাকে জায়েজ করতে।তোমরা বলতে, এই বাহ্যিক বলটা এসেছে স্রষ্টার কাছ থেকে। কিন্তু দেখো, বিজ্ঞান বলছে, এইখানে স্রষ্টার কোন হাত নেই। বিগ ব্যাং হবার জন্য যে শক্তি দরকার ছিলো, সেটা এসেছে এই কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশান থেকে।সুতরাং, মহাবিশ্ব তৈরিতে স্রষ্টার অস্তিত্বকে বিজ্ঞান ডাইরেক্ট 'না' বলে দিয়েছে।আর, তোমরা এখনো স্রষ্টা স্রষ্টা করে কোথায় যে পড়ে আছো।'

এতটুকু বলে বিপ্লব দা'র চোখমুখ ঝলমলিয়ে উঠলো। মনে হচ্ছে, উনি যে উদ্দেশ্যে আমাদের ডেকেছেন তা সফল হয়ে গেছে। আমরা হয়তো উনার বিজ্ঞানের উপর এই জ্ঞানগর্ভ লেকচার শুনে এক্ষুনি নাস্তিকতার উপর ঈমান নিয়ে আসবো।

যাহোক, ইতোমধ্যে সাজিদ দু কাপ কফি গিলে ফেলেছে। নতুন এক কাপ ঢালতে ঢালতে সে বললো,- 'এই ব্যাপারে ষ্টিফেন হকিংয়ের বই আছে।নাম- 'The grand design'। এটা আমি পড়েছি।'
সাজিদের কথা শুনে বিপ্লব দা'কে খুব খুশি মনে হলো।তিনি বললেন,- 'বাহ, তুমি তাহলে পড়াশুনা ষ্টপ করোনি? বেশ বেশ! পড়াশুনা করবে।বেশি বেশি পড়বে।'
সাজিদ হাসলো। হেসে সে বললো, - 'কিন্তু দাদা, এই ব্যাপারে আমার কনফিউশান আছে।'
- 'কোন ব্যাপারে?'- বিপ্লব দা'র প্রশ্ন।
- 'ষ্টিফেন হকিং আর লিওনার্ড ম্লোদিনোর বই The grand design এর ব্যাপারে।'
বিপ্লব দা একটু থতমত খেলো মনে হলো। মনে হয় উনি মনে মনে বলছে- এই ছেলে দেখছি খোদার উপর খোদাগিরি করছে।
তিনি বললেন,- 'ক্লিয়ার করো।'
সাজিদ বললো,- আমি দুইটা দিক থেকেই এটার ব্যাখ্যা করবো।বিজ্ঞান এবং ধর্ম। যদি অনুমতি দেন।'
- 'অবশ্যই।'- বিপ্লব দা বললেন।
আমি মুগ্ধ শ্রোতা। গুরু এবং এক্স-শিষ্যের তর্ক জমে উঠেছে।
সাজিদ বললো,- 'প্রথম কথা হচ্ছে, ষ্টিফেন হকিংয়ের এই থিওরিটা এখনো 'থিওরি', সেটা 'ফ্যাক্ট' নয়।এই ব্যাপারে প্রথম কথা বলেন বিজ্ঞানি লরেন্স ক্রাউস।তিনি এইটা নিয়ে একটি বিশাল সাইজের বই লিখেছিলেন।বইটার নাম ছিলো- 'A Universe from nothing'।
অনেক পরে, এখন ষ্টিফেন এটা নিয়ে উনার The grand design এ কথা বলেছেন। উনার এই বইটা প্রকাশ হবার পর সি এন এনের এক সাংবাদিক হকিংকে জিজ্ঞেস করেছিলো,- 'আপনি কি ইশ্বরে বিশ্বাস করেন?'
হকিং বলেছিলো,- 'ইশ্বর থাকলেও থাকতে পারে, তবে, মহাবিশ্ব তৈরিতে তার প্রয়োজন নেই।'
বিপ্লব দা বললো,- 'সেটাই।উনি বোঝালেন যে, ইশ্বর মূলত ধার্মিকদের একটি অকার্যকর বিশ্বাস।'
- 'হকিং কি বুঝিয়েছেন জানিনা, কিন্তু হকিংয়ের অই বইটি অসম্পূর্ণ।কিছু গলদ আছে।'
বিপ্লব দা কফির কাপ রাখতে রাখতে বললেন,- 'গলদ? মানে?'
- 'দাঁড়ান, বলছি। গলদ মানে, উনি কিছু বিষয় বইতে ক্লিয়ার করেন নি। যেহেতু এটা বিজ্ঞান মহলে প্রমানিত সত্য নয়, তাই এটা বিজ্ঞান মহলে প্রচুর বিতর্কিত হয়েছে।
উনার বইতে যে গলদগুলো আছে, সেগুলো সিরিয়ালি বলছি।
গলদ নাম্বার ০১-
হকিং বলেছেন, শূন্য থেকেই কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের মাধ্যমে বস্তু কণা তৈরি হয়েছে,এবং সেটা মহাকর্ষ বলের মাধ্যমে নিউট্রালাইজ হয়েছে।
এখানে প্রশ্ন হলো,- 'শূন্য বলতে হকিং কি একদম Nothing (কোনকিছুই নেই) বুঝিয়েছেন, নাকি Quantum Vaccum (বস্তুর অনুপস্থিতি) বুঝিয়েছেন সেটা ক্লিয়ার করেন নি।হকিং বলেছেন, শূন্যস্থানে বস্তু কণার মাঝে কোয়াণ্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশান হতে হলে সেখানে মহাকর্ষ বল প্রয়োজন। কিন্তু অই শূন্যস্থানে (যখন সময় আর স্থানও তৈরি হয়নি) ঠিক কোথা থেকে এবং কিভাবে মহাকর্ষ বল এলো, তার কোন ব্যাখ্যা হকিং দেয় নি।
গলদ নাম্বার- ০২
হকিং তার বইতে বলেছেন, মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে একদম শূন্য থেকে, কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের মাধ্যমে। তখন 'সময়' (Time) এর আচরন আজকের সময়ের মতো ছিলো না। তখন সময়ের আচরন ছিলো 'স্থান' (Space) এর মতো। কারন, এই ফ্ল্যাকচুয়েশান হবার জন্য প্রাথমিকভাবে সময়ের দরকার ছিলো না, স্থানের দরকার ছিলো।কিন্তু হকিং তার বইতে এই কথা বলেন নি যে,যে সময় (Time) মহাবিশ্বের একদম শুরুতে 'স্থান' এর মতো আচরন করেছে, সেই 'সময়' পরবর্তীতে ঠিক কবে আর কখন থেকে আবার Time এর মতো আচরন শুরু করলো এবং কেন?'
আমি বিপ্লব দা'র মুখের দিকে তাকালাম। তার চেহারার উৎফুল্ল ভাবটা চলে গেছে।
সাজিদ বলে যাচ্ছে-
গলদ নাম্বার- ০৩

পদার্থবিদ্যার যে সূত্র মেনে কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশান হয়ে মহাবিশ্ব তৈরি হলো, তখন শূন্যাবস্থায় পদার্থবিদ্যার এই সূত্রগুলো বলবৎ থাকে কি করে? এইটার ব্যাখ্যা হকিং দেয়নি।
গলদ নাম্বার - ০৪
আপনি বলেছেন, প্রকৃতি শূন্যস্থান পছন্দ করেনা। তাই, শূন্যস্থান পূরণ করতে আপনা আপনি কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশান হয়ে মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো- যেখানে আপনি শূন্যস্থান নিয়ে কথা বলছেন, যখম সময় ছিলো না,স্থান ছিলো না, তখন আপনি প্রকৃতি কোথায় পেলেন?'

সাজিদ হকিংয়ের বইয়ের পাঁচ নাম্বার গলদের কথা বলতে যাচ্ছিলো। তাকে থামিয়ে দিয়ে বিপ্লব দা বললেন,- 'ওকে ওকে। বুঝলাম। আমি বলছি না যে এই জিনিসটা একেবারে সত্যি। এটা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হবে।আলোচনা-সমালোচনা হবে।আরো পরীক্ষা-নীরিক্ষা হবে।তারপর ডিসাইড হবে যে এটা ঠিক না ভুল।'
সাজিদের কাছে বিপ্লব দা'র এরকম মৌন পরাজয় আমাকে খুব তৃপ্তি দিলো।মনে মনে বললাম,- 'ইয়েস সাজিদ, ইউ ক্যান।'
সাজিদ বললো,- 'হ্যাঁ, সে পরীক্ষা চলতে থাকুক। যদি কোনদিন এই থিওরি সত্যিও হয়ে যায়, তাহলে আমাকে ডাক দিয়েন না দাদা। কারন, আমি কোরান দিয়েই প্রমান করে দিতে পারবো।'
সাজিদের এই কথা শুনে আমার হেঁচকি উঠে গেলো। কি বলে রে? এতক্ষন যেটাকে গলদপূর্ণ বলেছে, সেটাকে আবার কোরান দিয়ে প্রমান করবে বলছে? ক্যামনে কি?'
বিপ্লব দা'ও বুঝলো না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন,- 'কি রকম?'
সাজিদ হাসলো। বললো,- 'শূন্য থেকেই মহাবিশ্ব সৃষ্টির কথা আল কোরানে বলা আছে দাদা।'
আমি আরো অবাক। কি বলে এই ছেলে?
সে বললো,- 'আমি বলছি না যে কোরান কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের কথাই বলেছে।কোরান যার কাছ থেকে এসেছে, তিনি তার সৃষ্টি জগতের সৃষ্টির ব্যাখ্যা দিয়েছেন।এখন সেটা বিগ ব্যাং আসলেও পাল্টাবে না, কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশান থিওরি আসলেও পাল্টাবে না। একই থাকবে।'
বিপ্লব দা বললো,- 'কোরানে কি আছে বললে যেন?'
- 'সূরা বাকারার ১১৭ নাম্বার আয়াতে আছে-

'যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে আনায়ন করেন (এখানে মূল শব্দ 'বাদিয়্যু'/Originator- সেখান থেকেই অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের ধারনা) এবং যখন তিনি কিছু করবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন শুধু বলেন হও, আর তা হয়ে যায়।'

'Creator of the heavens and the earth from nothingness, He has only to say when He wills a thing, “Be,” and it is'....

দেখুন, আমি আবারো বলছি, আমি এটা বলছি না যে, আল্লাহ তা'লা এখানে কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের কথাই বলেছেন। তিনি তার সৃষ্টির কথা বলেছেন। তিনি 'অনস্তিত্ব' (Nothing) থেকে 'অস্তিত্বে' (Something) এ এনেছেন।এমন না যে, আল্লাহ তার হাত দিয়ে প্রথমে মহাবিশ্বের ছাদ বানালেন। তারপর তাতে সূর্য, চাঁদ, গ্যালাক্সি এগুলা একটা একটা বসিয়ে দিয়েছেন। তিনি কেবল নির্দেশ দিয়েছেন।
হকিংও একই কথা বলছে। কিন্তু তারা বলছে এটা এমনি এমনি হয়ে গেছে, শূন্য থেকেই। আল্লাহ বলছেন, না, এমনি হয়নি। আমি যখন নির্দেশ করেছি 'হও' (কুন), তখন তা হয়ে গেলো।
হকিং ব্যাখ্যা দিতে পারছে না এই কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের জন্য মহাকর্ষ বল কোথা থেকে এলো, 'সময়' কেন, কিভাবে 'স্থান 'হলো, পরে আবার সেটা 'সময়' হলো।
কিন্তু আমাদের স্রষ্টা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন 'হতে', আর তা হয়ে গেলো।

ধরুন একটা ম্যাজিশিয়ান ম্যাজিক দেখাচ্ছে। ম্যাজিশিয়ান বসে আছে ষ্টেজের এক কোণায়।কিন্তু সে তার চোখের ইশারায় ম্যাজিক দেখাচ্ছে।দর্শক দেখছে, খালি টেবিলের উপরে হঠাৎ একটা কবুতর তৈরি হয়ে গেল,এবং সেটা উড়েও গেলো।

দর্শক কি বলবে এটা কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের মাধ্যমে হয়ে গেছে? না, বলবে না।

এর পেছনে ম্যাজিশিয়ানের কারসাজি আছে।সে ষ্টেজের এক কোণা থেকে চোখ দিয়ে ইশারা করেছে বলেই এটা হয়েছে।

স্রষ্টাও সেরকম।তিনি শুধু বলেছেন, 'হও', আর মহাবিশ্ব আপনা আপনিই হয়ে গেলো।.....

আপনাদের সেই শূন্যস্থান থেকে স্রষ্টার দূরত্ব কেবল অই 'হও' পর্যন্তই।

মাগরিবের আজান পড়তে শুরু করেছে। বিপ্লব দা'কে অনেকটাই হতাশ দেখলাম। আমরা বললাম,- 'আজ তাহলে উঠি?'

উনি একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন,- 'এসো।'

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমি অবাক হয়ে সাজিদের দিকে তাকিয়ে আছি। কে বলবে এই ছেলেটা গত ছ'মাস আগেও নাস্তিক ছিলো। নিজের গুরুকেই কি রকম কুপোকাত করে দিয়ে আসলো।কোরানের সূরা বাকারার ১১৭ নাম্বার আয়াতটি কতো হাজার বার পড়েছি, কিন্তু এভাবে কোনদিন ভাবিনি।আজকে এটা সাজিদ যখন বিপ্লব দা কে বুঝাচ্ছে, মনে হচ্ছে আজকেই নতুন শুনছি এই আয়াতের কথা। গর্ব হতে লাগলো আমার।

তাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দেন। সত্যিই কি তাই?

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে বসে বই পড়ছিলাম।

সাজিদ পড়ছিলো এ্যান্থনি মাসকারেনহাস এর বই- 'The Legacy Of Blood'।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর বিদেশি সাংবাদিকের লেখা বই। সাজিদের অনেকদিনের ইচ্ছে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর সে একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করবে।তাই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যতো বই আছে, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছে সে।
আমি অবশ্য সাজিদকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যই রয়ে গেছি। এসব বই-টই পড়ার ব্যাপারে আমার যথেষ্ট অনীহা আছে।থার্ড পিরিয়ডে সাজিদ ফোন করে বললো ক্লাশ শেষে যেন ওর সাথে দেখা করি।দেখা করতে এসেই আটকে গেছি। সোজা নিয়ে এলো লাইব্রেরিতে। মোটা মোটা বইগুলো নিয়ে সে বসে পড়েছে।খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে আর গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো ডায়েরিতে ঠুকে নিচ্ছে।
আমি আর কি করবো? সাজিদকে মুখের উপর 'তুই বসে থাক' বলে চলেও আসা যাবে না। তাহলেই হয়েছে।
আমি ঘুরে ঘুরে শেলফে সাজিয়ে রাখা বইগুলো দেখছি। হুমায়ুন আহমেদের একটি বই হাতে নিলাম।বইটির নাম- 'দীঘির জলে কার ছায়া গো।'
হুমায়ুন আহমেদ নামের এই ভদ্রলোক বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয় লেখক। যদিও উনার তেমন বই আমি পড়িনি, কিন্তু সাজিদের মুখে উনার বেশ প্রশংসা শুনি।উনার বেশকিছু কালজয়ী চরিত্র আছে।একবার নাকি উনার নাটকের একটি প্লট পাল্টানোর জন্য মানুষ মিছিল নিয়েও বেরিয়েছিলো।বাব্বা! কি সাংঘাতিক!
'দিঘীর জলে কার ছায়া গো' নামের বইটি উল্টাতে লাগলাম।উল্টাতে উল্টাতে একটি জায়গায় আমার চোখ আটকে গেলো। বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারউইনের ব্যাপারে কিছু একটা লেখা। পড়তে শুরু করলাম-

'আহসানকে পেয়ে শওকত সাহেব আনন্দিত। তিনি নতুন একটা বই পড়ছেন।
বইয়ে বিবর্তনবাদের জনক ডারউইন সাহেবকে ধরাশায়ী করা হয়েছে।তাঁর পূর্বপুরুষ বানর- এটা তিনি মেনে নিতেই পারতেন না।এখন সমস্যার সমাধান হয়েছে।তিনি আহসানের দিকে ঝুঁকে এসে বললেন,- 'তুমি ডারউইনবাদে বিশ্বাস কর?'
আহসান বলল,- 'জ্বী চাচা, করি।'
- 'তোমার বিশ্বাস তুমি এখন যে-কোনো একটা ভাল ডাস্টবিন দেখে ফেলে আসতে পারো।'
আহসান বলল,- ' জ্বী আচ্ছা, করি।'
- 'পুরো বিষয়টা না শুনেই জ্বী আচ্ছা বলবে না। আগে পুরো বিষয়টা শোন।'
আহসান হতাশভঙ্গিতে পুরো বিষয়টা শোনার জন্য প্রস্তত হলো।সহজে এই বিরক্তিকর মানুষটার কাছ থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না।
শওকত সাহেব বললেন,- 'তোমাদের ডারউইনের থিওরি বলে পাখি এসেছে সরীসৃপ থেকে।
তুমি এখন একটা সাপ ও ময়ূর পাশাপাশি রাখো। চিন্তা কর যে, ময়ূরের পূর্বপুরুষ সাপ, যে সাপ এখন ময়ূয়ের প্রিয় খাদ্য।বলো, তোমার কিছু বলার আছে?'
- 'এই মুহূর্তে কিছু বলার নেই চাচা।'
- 'মনে মনে দশের ওপরে ৯৫০টা শূন্য বসাও।
এই বিশাল প্রায় অসীম সংখ্যা দিয়ে ১ কে ভাগ করো।কী পাবে জানো? শূন্য।এটা হলো এ্যাটমে এ্যাটমে ধাক্কাধাক্কি করে DNA অনু তৈরীর সম্ভাবনা। মিলার নামে কোন সাইন্টিস্টের নাম শুনেছ? ছাগলটাইপ সাইনটিস্ট।'
- 'চাচা, শুনিনি।'
- 'ঐ ছাগলটা ১৯৫০ সনে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে অন্য ছাগল সাইন্টিস্টদের মধ্যে হৈচৈ ফেলে দিয়েছিল।ছাগলটা করেছে কী, ল্যাবরেটরিতে আদি পৃথিবীর আবহাওয়া তৈরী করে ঘনঘন ইলেক্ট্রিক কারেন্ট পাস করেছে। কিছু প্রোটিন অনু তৈরী করে বলেছে- এভাবেই পৃথিবীতে প্রাণের শুরু।প্রাণ সৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্তার কোন

প্রয়োজন নেই। এখন সেই ছাগল মিলারকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে হাসাহাসি। Life ম্যাগাজিনে কী লেখা হয়েছিল পড়ে শোনাই।'
- 'চাচা, আরেকদিন শুনি? জটিল কিছু শোনার জন্য আমি এ মুহূর্তে মানসিকভাবে তৈরী না।'
- 'জটিল কিছু বলছি না। জলবৎ তরলং। মন দিয়ে শোনো।'
শওকত সাহেব পড়তে শুরু করলেন। আহসান হতাশ চোখে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল.......'
-
এইটুকু পড়ে আমি বেশ আনন্দ পেলাম। লেখক হুমায়ুন আহমেদ এখানে ব্যাটা ডারউইনকে একহাত নিলেন।শওকত সাহেবের মতো আমিও কোনভাবেই মানতে পারিনা যে, আমাদের পূর্বপুরুষ বানর।ভাবতেই ঘেন্না লাগে!
-
বইটি নিয়ে আমি সাজিদের কাছে গেলাম। এসে দেখি সে ব্যাগপত্র গোছানো শুরু করেছে।সে বললো,- 'চল, বাসায় যাবো।'
আমি তাকে হাতের বইটি দেখিয়ে বললাম,- ' এই বইটা পড়েছিস? মজার একটি কাহিনী আছে।হয়েছে কি জানিস............'
আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সাজিদ বললো,- 'শওকত সাহেব নামের এক ভদ্রলোক আহসান নামের একটি ছেলের সামনে ডারউইনের গোষ্ঠী উদ্ধার করেছে,তাই তো?'
আমি অবাক হলাম। বললাম,- 'হ্যাঁ। কিন্তু আমি এই ব্যাপারে বলবো কি করে বুঝলি?'
সাজিদ ব্যাগ কাঁধে নিতে নিতে বললো,- 'এটা ছাড়া এই বইতে আর তেমন বিশেষ কিছু নাই যেটা দেখাতে তুই এভাবে আমার কাছে ছুটে আসবি।তাই অনুমান করলাম।'
আমি আর কিছুই বললাম না। বইটি শেলফে রেখে দিয়েই হাঁটা ধরলাম।
-
সিঁড়ির কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ বিপ্লব দা'র সাথে দেখা।
উনার সাথে শেষবার দেখা হয়েছিলো উনার বাসায়।সেবার সাজিদ আর বিপ্লব দা'র মধ্যে কোয়ান্টাম ফিজিক্স নিয়ে যা বিতর্ক হয়েছিলো,দেখার মতো। বিতর্কে বিপ্লব দা সাজিদের কাছে গোঁ হারা হেরেছিলো। সেটা ভাবতেই এখনো আমার পৈশাচিক আনন্দ হয়।
আমাদের দেখেই বিপ্লব দা হেসে দিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন।
এরমধ্যে হঠাৎ করে বৃষ্টি চলে এলো। মধ্যাকাশে সূয্যি মামা তখনও বহাল তবিয়তে জ্বলজ্বল করছে, আবার ওদিকে বৃষ্টির বিশাল বিশাল ফোঁটা।গ্রাম্য লোকজনের কাছে এই বৃষ্টির একটি মজার ব্যাখ্যা আছে। তারা বলে, শিয়ালের বিয়ে হলে এরকম বৃষ্টি হয়।রোদের মধ্যেই বৃষ্টি।শিয়াল প্রজাতির মধ্যে বিয়ে-টিয়ের প্রচলন আছে কিনা কে জানে।
-
বিপ্লব দা সহ আমরা ক্যান্টিনে ঢুকলাম। বৃষ্টি কমলে বেরুতে হবে।
সাজিদ তিন কাপ চা অর্ডার করলো। এরপর বিপ্লব দা'র দিকে তাকিয়ে বললো,- 'দাদা ভাই, চা খেতে অসুবিধে নেই তো?'
- 'না না, ইট'স ওকে'- বিপ্লব দা উত্তরে বললো।
এরপর আবার বিপ্লব দা বললো,- 'সাজিদ, তোমার সাথে একটি ব্যাপারে আলাপ করার ছিলো।'
ততক্ষণে চা চলে এসেছে। বৃষ্টির মধ্যে গরম গরম ধোঁয়া উঠা চা'য়ের কাপে চুমুক দেবার ফ্লেভারটাই অন্যরকম।
সাজিদ তার কাপে চুমুক দিতে দিতে বললো,- 'হ্যাঁ দাদা, বলুন। কোন টপিক?'
বিপ্লব দা বললো,- 'ওই যে, তোমরা যে বইটাকে স্রষ্টার বাণী বলো, সেটা নিয়ে। কোরান।'
সাজিদ বললো,- 'সমস্যা নেই। বলুন কি বলবেন?'
বিপ্লব দা বললেন,- 'কোরানে একটা সূরা আছে।সূরাটার নাম বাকরা।'
সাজিদ বললো,- 'সূরাটির নাম বাকরা নয়, বাকারা। বাকারা অর্থ- গাভী। ইংরেজিতে- The Cow...
- 'ওই আর কি।এই সূরার ৬-৭ নাম্বার লাইনগুলো তুমি কি পড়েছো?'

- 'পুরো কোরআনই আমরা মাসে কয়েকবার করে পড়ি। এটা মার্কস কিংবা প্লেটো'র রচনা নয় যে একবার পড়া হয়ে গেলেই শেলফে আজীবনের জন্য সাজিয়ে রাখবো।'
বিপ্লব দা বললেন,-' এই লাইনগুলোতে বলা হচ্ছে-
“Verily, those who disbelieve, it is the same to them whether you warn them or do not warn them, they will not believe.
Allah has set a seal on their hearts & on their hearings, and on their eyes there is a covering. Theirs will be a great torment.”- Baqara 6-7....
এরপর বিপ্লব দা সেটার বাংলা অর্থ করে বললেন,-

“ নিশ্চয় যারা অস্বীকার করে, তাদের আপনি সাবধান করুন আর না-ই করুন, তারা স্বীকার করবেনা।আল্লাহ তাদের হৃদয়ে এবং তাদের কর্ণ কুহরে মোহর মেরে দিয়েছেন; তাদের দৃষ্টির ওপর আবরণ টেনে দিয়েছেন।তাদের জন্য আছে ভয়াবহ শাস্তি।”

এইটুকু বলে বিপ্লব দা থামলেন। সাজিদ বললো,- 'What's wrong with these verses? '
বিপ্লব দা বললেন,- 'দেখো, এখানে বলছে কাফিরদের হৃদয়ে আর কানে তোমাদের আল্লা মোহর আই মিন সিল মেরে দেয়। সিল মারা মানে তালাবদ্ধ করে দেওয়া, তাই না?'
- 'হু।'
- 'এখন কাফিরদের হৃদয়ে আর কানে যদি সিল মারা থাকে, তারা তো সত্যের বাণী, আই মিন তোমরা যেটাকে ধর্মের বাণী বলো আর কি, সেটা বুঝতে পারবে না। উপলব্ধি করতে পারবে না। আল্লা যেহেতু তাদের হৃদয়ে আর কানে সিল মেরে দিচ্ছে, তাই তারা ধর্মের বাণীগুলো বুঝতে পারছে না।তাই তারা কাফির থেকে যাচ্ছে।নাস্তিক হচ্ছে।তাদের কি দোষ বলো? আল্লাই তো চান না তারা আস্তিক হোক।চাইলে তিনি নিশ্চয় হৃদয়ে আর কানে সিল মেরে দিতো না। আবার, শেষে এসে বলছে, তাদের জন্য আজাব অপেক্ষা করছে।এটা কেমন কথা? একদিকে সিল মেরে দিয়ে সত্য বোঝার থেকে দূরে রাখছেন, আবার ওইদিকে আজাবও প্রস্তুত করে রাখছেন।ব্যাপারটা কি ঠিক? বলো?'
বিপ্লব দা'র কথাগুলো আমার কাছে খুব যৌক্তিক মনে হলো।আসলেই তো। এই আয়াতগুলো নিয়ে তো এভাবে কোনদিন ভাবি নি। আল্লাহ একদিকে বলছেন কাফিরদের অন্তরে মোহর মেরে দেন, আবার তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।ব্যাপারটা কি?
সাজিদ মুচকি হাসলো। চা'য়ের কাপে শেষ চুমুকটুকু দিয়ে বললো,- 'দাদা, ইসলামের ইতিহাস পড়লে আপনি একশ্রেণীর মীরজাফরদের কথা জানতে পারবেন। এরা করতো কি জানেন? রাসূল সাঃ এর কাছে আসতো। হাতের মুঠির মধ্যে পাথর নিয়ে বলতো,- মুহাম্মদ, আমার হাতে কি আছে বলতে পারলে আমি এক্ষুনি ইসলাম কবুল করবো।দেখি তুমি কেমন নবি?
রাসূল সাঃ হাসতেন। হেসে বলতেন,- তোমার হাতের জিনিসই বলুক সেগুলো কি।
তখন পাথরগুলো কথা বলতে শুরু করতো।এটা দেখে সেই লোকগুলো খুব অবাক হতো।অবাক হয়ে বলতো,- এ সাক্ষাৎ জাদুকর।এই বলে পালাতো।অথচ, তারা বলেছিলো হাতে কি আছে বলতে পারলে ইসলাম কবুল করবে।কিন্তু রাসূল সাঃ তাদের পরীক্ষায় পাশ করে গেলে তারা তাকে জাদুকর, জ্যোতিষী ইত্যাদি বলে চলে যেতো।মুনাফিকী করতো। এসব আয়াতে মূলত এই শ্রেণীর কাফিরদের কথাই বলা হয়েছে।যাদের সামনে সত্য উদঘাটিত হওয়ার পরও তারা তা অস্বীকার করে।'
বিপ্লব দা বললেন,- 'কিন্তু অন্তরে মোহর মেরে দিয়ে তাদের সত্য জানা থেকে বঞ্চিত করে, আবার তাদের শাস্তি দেওয়াটা কি ঠিক?'
- 'মোহর আল্লাহ ইচ্ছে করে মেরে দেন না।এটা সিষ্টেমেটিক্যালি হয়ে যায়।'
বিপ্লব দা হাসা শুরু করলেন। বললেন,- 'Very Interesting! সিষ্টেমেটিক্যালি সিল পরে যায়? হা হা হা।'
সাজিদের এই কথাটা আমার কাছেও শিশুসুলভ মনে হলো। সিষ্টেমেটিক্যালি সিল পরে যায়? আল্লাহ মারেন না।এটা কেমন কথা? আয়াতে তো স্পষ্টই আছে- 'আল্লাহ তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন।'

সাজিদ বললো,- 'দাদা, ধরুন, আমি বললাম,- 'যারা খাবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে, আপনি তাদের খেতে বলুন আর না বলুন, তারা কোনভাবেই খাবে না।আল্লাহ তাদের দেহ শুকিয়ে দেন।তাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেন।তাদের জন্য রয়েছে কঠিন অসুখ।
খেয়াল করুন, - এখানে তারা অসুস্থ হচ্ছে, তাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, তারা কঠিন অসুখে পরতে যাচ্ছে- কেন এসব হচ্ছে? আল্লাহ কি ইচ্ছা করেই তাদের সাথে এগুলো করছে? নাহ। এগুলো তাদের কর্মফল।তাদের যতোই জোর করা হোক, তারা যখন কোনভাবেই খাবেনা বলে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে - তখন সিষ্টেমেটিক্যালি না খাওয়ার ফলে তাদের শরীর শুকিয়ে যাবে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে।তারা কঠিন রোগে পতিত হবে। এসবকিছুর জন্য তারাই দায়ী।এখানে আল্লাহর ইচ্ছে বা অনিচ্ছে কিছুই নেই। কিন্তু, সিষ্টেমটা আল্লাহই চালাচ্ছেন।আল্লাহ একটি সিষ্টেম রেডি করে দিয়েছেন। আপনি না খেলে আপনার শরীর আল্লাহ শুকিয়ে দেবেন।আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেবেন।দিনশেষে, আপনার একটি কঠিন রোগ হবে। এটা একটা সিষ্টেম।এই সিষ্টেমে আপনি তখনই পড়বেন- যখন আপনি নিজ থেকে খাবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবেন।

ঠিক সেভাবেই- যারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যে, তাদের সামনে যতো প্রমান, যতো দলিলই আসুক, তারা সত্যকে মেনে নিবে না, অস্বীকার করবেই করবে, তাদের অন্তরে আর কানে সিষ্টেমেটিক্যালি একটি সিল পরে যাচ্ছে। না খাওয়ার ফলে আপনি যেভাবে শুকিয়ে যান, আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, আপনার কঠিন অসুখ হয়, ঠিক সেভাবে, বিশ্বাস করবেন না বলে সিদ্ধান্ত যখন নিয়েই ফেলেছেন- তখন আপনার অন্তরে,কানে সিল পরে যাচ্ছে, আর দিনশেষে, আপনার জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন অসুখ, আই মিন আজাব।এরজন্য আল্লাহকে ব্লেইম করা হবে কেন?'
সাজিদ একনাগাড়ে কথাগুলো বলে গেলো। বিপ্লব দা'র মুখ খানিকটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। তিনি সম্ভবত বুঝে গেছেন ব্যাপারটা।
আমি বললাম,- 'বাব্বা! কি দিয়ে কি বুঝিয়ে দিলি রে ভাই। আমি হলে তো হ-য-ব-র-ল করে ফেলতাম।
সাজিদ মুচকি হাসলো।
-
বৃষ্টি অনেকক্ষন আগেই থেমে গেছে। আমরা বিপ্লব দা'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম সেদিন।

নীলাঞ্জন দা মনে-প্রাণে একজন খাঁটি বাংলাদেশি।
বাংলাদেশ, বাংলাদেশের স্বাধীণতা মুক্তিসংগ্রামকে তিনি কোনকিছুর সাথে কম্প্রোমাইজ করতে রাজি নন।

সাজিদের সাথে নীলাঞ্জন দা'র খুবই ভালো সম্পর্ক।নীলাঞ্জন দা'কে আমরা ভালোবেসে নিলু দা বলেই ডাকি।উনি একাধারে কবি,রাজনীতিবিদ,এবং সাংবাদিক।

আজকে সাজিদের সাথে নিলু দা'র একটি বিষয়ে আলাপ হবে।কয়েকদিন আগে নিলু দা ব্লগে আল কোরআনের একটি আয়াতকে 'সন্ত্রাসবাদী আয়াত' বলে কটাক্ষ করে একটি পোষ্ট করেছে।
সে ব্যাপারে সুরাহা করতে নিজ থেকেই নিলু দা'র বাসায় যাচ্ছি আমরা।

আমরা বিকেল চারটে'য় নিলু দা'র বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। উনার বাসায় এর আগে কখনো আসিনি। উনার সাথে দেখা হতো প্রেস ক্লাব আর বিভিন্ন প্রোগ্রামে।তবে, উনি যে নীলক্ষেতে থাকেন, সেটা জানি।
নীলক্ষেতে এসে সাজিদ নিলু দা'কে ফোন দিলো।
নিলু দা'কে ফোন দিতেই ওপাশ থেকে সুন্দর একটি রিংটোন বেজে উঠলো।
রিংটোনে সেট করা ছিলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ ই মার্চের সেই বিখ্যাত ভাষণ।
সাজিদ ফোনের লাউড স্পীকার অন করে দিলো।আমরা আবার শুনলাম, বঙ্গবন্ধুর সেই চিরচেনা ভাষণটি।
বঙ্গবন্ধু বলছে- 'আমরা তাদের ভাতে মারবো, আমরা তাদের পানিতে মারবো। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীণতার সংগ্রাম।'
পর পর দু'বার রিং হওয়ার পর তৃতীয়বারে নিলু দা ফোন রিসিভ করলেন।
সাজিদকে নিলু দা ভালোমত বাসার ঠিকানা বুঝিয়ে দিলেন।

বাইরে থেকে কলিংবেল বাজতেই বুড়ো মতো এক ভদ্রলোক দরজা খুলে দিলো।
আমরা ভেতরে গেলাম।
বলে নিই, আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি, সেটা নিলু দা'কে জানানো হয়নি।
নিলু দা'র একটি গুণের কথা বলা হয়নি।কবিতা লেখা,সাংবাদিকতা এর পাশাপাশি নিলু দা খুব ভালো ছবিও আঁকে।
আমরা ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই বুড়ো লোকটি আমাদের সোজা নিলু দা'র রুমে নিয়ে গেলো।মনে হয়, উনার উপর এই নির্দেশটাই ছিলো।
আমরা নিলু দা'র রুমে এসে দেখি উনি ছবি আঁকছেন। মুক্তিযুদ্ধের ছবি।প্রায়ই আঁকা হয়ে গেছে।
জলপাই রঙা পোশাকের একজন মিলিটারি।মিলিটারির বাম হাতে একটি রাইফেল। একজন অর্ধ নগ্ন মহিলা।মহিলার চুল খোলা। মহিলা বেঁচে নেই। মিলিটারিটা মহিলাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।মনে হয় ভাঁগাড়ে নিক্ষেপ করবে- এরকম কিছু।পাশেই একটি ডাষ্টবিন টাইপ কিছু।চার'টে কাক বসে আছে সেটার উপর।জয়নুলের 'দূর্ভিক্ষ' ছবিটার মতোই।
আমাদের দিকে না ফিরেই নিলু দা বললেন,- 'কিরে, এত ঘটা করে দেখা করতে এসছিস যে?'
সাজিদ বললো,- 'ও মা, তোমার সাথে দেখা হয়না কদ্দিন, দেখতে মন চাইলো বলে চলে এলাম। ডিষ্টার্ব করেছি বুঝি?'
- 'আরে না না , তা বলিনি' - এইটুকু বলে নিলু দা ঘাঁড় ঘুরিয়ে আমাদের দিকে তাকালো।আমাকে দেখে নিলু দা বলে উঠলো,- 'আরিফ না?'
- 'হু'- সাজিদ বললো।
- 'আরেব্বাস! আজ দেখি আমার বাসায় চাঁদের হাট। তুমি তো জম্পেশ কবিতা লিখো ভাই আরিফ। বিচিত্রায় তোমার কবিতা আমি প্রায়ই পড়ি।'

নিলু দা'র মুখে এরকম কথা শুনে আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম।সাজিদ বললো,- 'জানো দাদা, তাকে কতো করে বলি, কবিতার একটা পাণ্ডুলিপি রেডি কর বইমেলার জন্যে।কিন্তু সে বলে, ওর নাকি ভয় করে।দ্যাখো তো দাদা।'
নিলু দা বললো,- 'হ্যাঁ হ্যাঁ, পাণ্ডুলিপি রেডি করো।একবার বই বের হয়ে গেলে দেখবে ভয় টয় সব দৌঁড়ে পালাবে।তোমার লেখার হাত দারুন। আমি পড়ি তো।বেশ ভালো লিখো।'
সাজিদ বললো,- 'দাদা, ওটা কি মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রিক ছবি? যেটা আঁকছো?'
- 'হু'- নিলু দা'র উত্তর।
- 'আচ্ছা দাদা, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমার বিশেষ পড়াশুনা নেই। তুমি তো আবার এই লাইনের।আজ তোমার কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনবো।'
নিলু দা মুচকি হাসলেন। তুলির শেষ আঁচড় খানা দিয়ে খাটের উপর উঠে বসলেন।আমরা দু'জন ততক্ষণে দুটি চেয়ারে বসে পড়েছি।
বুড়ো ভদ্রলোক ট্রে তে করে কফি নিয়ে এসেছেন।
নিলু দা কফিতে চুমুক দিতে দিতে মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলতে শুরু করলেন,-
'১৯৭১ সাল।পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে নির্যাতিত,নিষ্পেষিত বাঙালিরা। যখনই তারা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সোচ্চার হয়েছে, তখনই পাকিস্তানিরা বাঙালিদের উপর চালিয়েছে অত্যাচার,নির্যাতন।'
নিলু দা'র কণ্ঠ ভারি হয়ে এলো। মুক্তিযুদ্ধের আলাপ উঠলেই উনি এরকম আবেগকেন্দ্রিক হয়ে যান।
তিনি বলে যাচ্ছেন- 'এই অত্যাচার, এই নির্যাতনের মাত্রা এতই ভয়াবহ হয়ে উঠলো যে- বাঙালিরা শেষপর্যন্ত নিজেদের এবং নিজেদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য হলো।
তখন চলছে উত্তপ্ত মার্চ মাস। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলা ও বাঙালি জাতির কর্ণধার, ইতিহাসের বরপুত্র,জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে সসস্ত্র যুদ্ধের ডাক দিলেন।'
সাজিদ বললো,- 'দাদা, তোমার ফোনের রিংটোনে শুনি তো। আমরা তাদের ভাতে মারবো, আমরা তাদের পানিতে মারবো।
বাবারে! কি সাংঘাতিক কথা।'
নিলু দা কপালের ভাঁজ দীর্ঘ করে বললেন,- 'সাংঘাতিক বলছিস কেন? বরং বল, এটিই হলো বাঙালির মহাকাব্য।সেদিন এরকমভাবে বাঙালিদের অনুপ্রাণিত না করলে আমরা কি স্বাধীনতার স্বাদ পেতাম?'
- 'তাই বলে মেরে ফেলার কথা? এটা তো আইন হাতে তুলে নেবার মতো।'- সাজিদ বললো।
নিলু দা বললো,- 'যেখানে নিজেদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হবার পথে, সেখানে তুই আইন বানাচ্ছিস? যুদ্ধের ময়দানে কোন আইন চলে না।'
- 'তারপর?'
- 'শেখ মুজিবের সেই ঐতিহাসিক ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালিরা ঝাপিয়ে পড়লো যুদ্ধে।'
আমি বললাম,- 'তারা পাকিস্তানিদের মারলো, এবং মরলো, তাই না?'
- 'হ্যাঁ।'
- 'যুদ্ধের পরে 'আমরা তাদের ভাতে মারবো, পানিতে মারবো' অথবা, 'যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ো' এরকম কথার জন্য শেখ মুজিবকে কি জেল-টেল খাটতে হয়েছে? বা কেউ তাকে সন্ত্রাসে উস্কানিদাতা কিংবা খুনে মদদদাতা বলে ব্লেইম করেছে?'- সাজিদ জিজ্ঞেস করলো।
- 'তোর মাথায় কি গোবর নাকি রে সাজিদ? এটা কোন কথা বললি? শেখ মুজিবকে এটার জন্য ব্লেইম করবে কেন? যুদ্ধের ময়দানে এটা ছিলো একজন কমান্ডারের কমান্ড।এটা অপরাধ নয়।বরং, এটার জন্য তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।নির্যাতিত বাঙালিদের মুক্তির দিশারি, মহান এ নেতা। এভাবে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আমরা পেলাম একটি স্বাধীন ভূ-খন্ড।একটি স্বাধীন পতাকা।'
- 'আচ্ছা দাদা, ঠিক একই কাজ যদি পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে অন্য কেউ করে, ধরুন, নির্যাতিত,নিষ্পেষিত, দলিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য পৃথিবীর অন্য কোথাও যদি অন্যকোন নেতা এরকম কথা বলে- যদি বলে,- শত্রুদের যেখানেই পাও, হত্যা করো। আর, এই কমান্ডে উদ্বুদ্ধ হয়ে যদি নির্যাতিত মানুষগুলো যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে- আপনি সেটাকে কোন চোখে দেখবেন?'

- 'অবশ্যই আমি ওই নেতার পক্ষে থাকবো এবং তার এই কথার, এই কাজের প্রশংসা করবো।'- নিলু দা বললেন।
- 'যেমন?'
- 'যেমন আমি চে গুয়েভারার সংগ্রামকে স্বাগত জানাই, আমি জোসেফ ষ্ট্যালিন, মাও সে তুংয়ের সংগ্রামকে স্বাগত জানাই।এরা সবাই নির্যাতিতদের অধিকারের জন্য লড়েছেন।'
এবার সাজিদ বললো,- 'দাদা, আপনি আরবদের ইতিহাস জানেন?'
- 'কি রকম?'
- 'চৌদ্দ শত বৎসর আগের কথা।আরবের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বীপরিতে একটি নতুন ধর্মবিশ্বাস সেখানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।'
- 'হু'
- কিছু মানুষ স্বেচ্ছায়, কোনরকম জোরজবরদস্তি ছাড়াই এই ধর্মটির প্রতি অনুরাগি হয়ে পড়ে। তারা দলে দলে এই ধর্মবিশ্বাস মেনে নিতে শুরু করে।কিন্তু সমাজপতিদের এটা সহ্য হয়নি।যারা যারা এই ধর্মটিকে মেনে নিচ্ছিলো- তাদের উপরই নেমে আসছিলো অকথ্য নির্যাতন। বুকের উপর পাথর তুলে দেওয়া, উটের পেছনে রশি দিয়ে বেঁধে মরুভূমিতে ঘুরানো, গর্দান নিয়ে নেওয়া কতো কি। একপর্যায়ে, এই ধর্মের প্রচারক, এবং তার সঙ্গী-সাথীদের দেশ ছাড়া করা হলো। এমন কোন নির্যাতন নেই, যা তাদের উপর নেমে আসে নি।
স্বদেশ হারা, স্বজন হারা হয়ে তারা তখন বিধ্বস্ত।
৭১ এ আমাদের শত্রু যেমন ছিলো পাকিস্তান, ১৪০০ বছর আগের সে সময়টায় মুসলমানদের শত্রু ছিলো মুশরিকরা।তাহলে, এই অত্যাচার, নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, তাদের নেতা যদি ঘোষণা দেয়- তোমরা মুশরিকদের যেখানেই পাও, হত্যা করো', তাহলে দাদা এতে কি কোন অপরাধ, কোন সন্ত্রাসবাদ প্রকাশ পায়?'
নিলু দা চুপ করে আছে।
সাজিদ বলে যেতে লাগলো,- 'শেখ মুজিবের 'আমরা তাদের ভাতে মারবো , পানিতে মারবো' যদি বাঙালির মহাকাব্য হয়, এটা যদি সন্ত্রাসবাদে উস্কানি না হয়, তাহলে আরেকটি যুদ্ধের ঘোষণা স্বরূপ বলা- 'তোমরা মুশরিকদের যেখানেই পাও হত্যা করো' এই কথাটা কেন সন্ত্রাসবাদী কথা হবে? এটি কেন জঙ্গীবাদে উস্কানি হবে?
কিন্তু, হত্যার নির্দেশ দেবার পরের আয়াতে আছে- 'মুশরিকদের কেউ যদি তোমাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় দাও।'
শেখ মুজিব কি বলেছিলেন,- 'আমরা তাদের ভাতে মারবো, পানিতে মারবো। কিন্তু তাদের কেউ এসে আমাদের কাছে আশ্রয় চাইলে, আমরা তাদের নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় দেবো, বলেছিলেন? বলেন নি। পৃথিবীর কোন কমান্ডার শত্রুদের এরকম নিরাপদ আশ্রয় দেবার কথা বলে নি। বরং, নির্দেশ দেয়- দেখা মাত্রই গুলি করার।'
আমি বললাম,- 'হু'।
সাজিদ বললো,- 'দাদা, কোরআনে আরো আছে- 'কেউ যদি বিনা অপরাধে কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে খুন করলো, সে যেন পুরো মানবজাতিকেই খুন করলো।' এরকম একটি কথা, পৃথিবীর কোন মানুষ,কোন নেতা,কোন গ্রন্থে কি আছে? নেই।
৭১ এ পাকিস্তানিদের মারার ঘোষণা দিয়েও শেখ মুজিব যদি আপনার কাছে মহানায়ক হন, তাহলে ১৪০০ বছর আগে, এরকম ঘোষণা আরেকজন দিয়ে থাকলে- তিনি কেন আপনার চোখে খলনায়ক হবেন? অপরাধী হবেন? একই কথা, একই নির্দেশের জন্য আপনি একজনকে মহামানব মনে করেন, অন্যজনকে মনে করেন সন্ত্রাসী, কেন দাদা? স্রেফ কি ধর্ম বিরোধিতার জন্য?
একজনের এরকম ঘোষণাকে ফোনের রিংটোন করে রেখেছেন, অন্যজনের এরকম ঘোষণাকে সন্ত্রাসবাদী কথাবার্তা, জঙ্গীবাদী কথাবার্তা বলে কটাক্ষ করে লেখা লিখেন, কেন? এটা কি ফেয়ার,দাদা?'
- 'হুম।'- নিলু দা কিছুটা একমত।
সাজিদ বললো,- 'দাদা, অনেক নাস্তিককে কোরআনের একটি আয়াতকে অন্য আয়াতের সাথে কন্ট্রাডিক্টরি বলতে দেখেছি। অথচ, তারা কোনদিনও সূরা তাওবার 'তোমরা মুশরিকদের যেখানেও পাও হত্যা করো' এটাকে সূরা

মায়েদার 'কেউ যদি নিরাপরাধ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলো,সে যেন পুরো মানবজাতিকেই হত্যা করলো' এটার সাথে কন্ট্রাডিক্ট্রি বলতে দেখি না।
অথচ, সেভাবে ভাবলে, এই দুই আয়াতে দু রকম কথা বলা হচ্ছে।একবার মেরে ফেলতে বলছে, একবার বলছে- মারলে পুরো মানবজাতিকে হত্যা করার মতো চরম পাপ হবে।কিন্তু তবুও নাস্তিকরা এই দুটোকে এক পাল্লায় এনে কথা বলে না। কেন বলে না? কারন, তারাও জানে দুটো আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই দুটোকে এক করে বলতে গেলেই নাস্তিকরা ধরা পড়বে, তাইই বলে না।'

নিলু দা সব শুনলেন। শুনে বললেন,- 'এরজন্যই বুঝি মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনতে এসছিলি?'
- 'না দাদা, শুধু ডাবল-ষ্ট্যান্ডবাজিটা উপলব্ধি করতে এসেছি। হা হা হা।'
নেহাৎ ভালো সম্পর্ক বলেই নিলু দা সেদিন রাগ করেন নি হয়তো।

ল্যাম্পপোষ্টের অস্পষ্ট আলোয় একজন বয়স্ক লোকের ছায়ামূর্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো।গায়ে মোটা একটি শাল জড়ানো। পৌষের শীত। লোকটা হালকা কাঁপছেও।

আমরা খুলনা থেকে ফিরছিলাম। আমি আর সাজিদ।
ষ্টেশান মাষ্টারের রুমের পাশের একটি বেঞ্চিতে লোকটা আঁটসাঁট হয়ে বসে আছে।
ষ্টেশানে এরকম কতো লোকই তো বসে থাকে।তাই সেদিকে আমার বিশেষ কোন কৌতুহল ছিলো না।কিন্তু সাজিদকে দেখলাম সেদিকে এগিয়ে গেলো।
লোকটার কাছে গিয়েই সাজিদ ধপাস করে বসে পড়লো।আমি দূর থেকে খেয়াল করলাম, লোকটার সাথে সাজিদ হেসে হেসে কথাও বলছে।
আশ্চর্য! খুলনার ষ্টেশান।এখানে সাজিদের পরিচিত লোক কোথা থেকে এলো? তাছাড়া, লোকটিকে দেখে বিশেষ কেউ বলেও মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে কোন বাদাম বিক্রেতা।বাদাম বিক্রি শেষে প্রতিদিন ওই জায়গায় বসেই রাত কাটিয়ে দেয়।
আমাদের রাতের ট্রেন। এখন বাজে রাত দু'টো।এই সময়ে সাজিদের সাথে কারো দেখা করার কথা থাকলে তা তো আমি জানতামই। অদ্ভুত!

আমি আরেকটু এগিয়ে গেলাম। একটু অগ্রসর হতেই দেখলাম, ভদ্রলোকের হাতে একটি বইও আছে।দূর থেকে আমি বুঝতে পারি নি।
সাজিদ আমাকে ইশারা দিয়ে ডাকলো। আমি গেলাম।
লোকটার চেহারাটা বেশ চেনা চেনা লাগছে,কিন্তু সঠিক মনে করতে পারছি না।
সাজিদ বললো,- 'এইখানে বোস।ইনি হচ্ছেন হুমায়ুন স্যার।'
হুমায়ুন স্যার? এই নামে কোন হুমায়ুন স্যারকে তো আমি চিনি না।সাজিদকে জিজ্ঞেস করতে যাবো যে কোন হুমায়ুন স্যার, অমনি সাজিদ আবার বললো,- 'হুমায়ুন আজাদকে চিনিস না? ইনি আর কি।'
এরপর সে লোকটার দিকে ফিরে বললো,- 'স্যার, এ হলো আমার বন্ধু, আরিফ।'
লোকটা আমার দিকে তাকালো না। সাজিদের দিকে তাকিয়ে আছে।ঠোঁটে মৃদু হাসি।
আমার তখনো ঘোর কাটছেই না।কি হচ্ছে এসব? আমিও ধপাস করে সাজিদের পাশে বসে গেলাম।

সাজিদ আর হুমায়ুন আজাদ নামের লোকটার মধ্যে আলাপ হচ্ছে।এমনভাবে কথা বলছে, যেন তারা পরস্পর পরস্পরকে অনেক আগে থেকেই চিনে।
লোকটা সাজিদকে বলছে,- 'তোকে কতো করে বলেছি, আমার লেখা 'আমার অবিশ্বাস' বইটা ভালোমতো পড়তে। পড়েছিলি?'
সাজিদ বললো,- 'হ্যাঁ স্যার। পড়েছি তো।'
- 'তাহলে আবার আস্তিক হয়ে গেলি কেন? নিশ্চয় কোন ত্যাদড়ের ফাঁদে পড়েছিস? কে সে? নাম বল? পেছনে যে আছে, কি জানি নাম?'
- 'আরিফ......'
- 'হ্যাঁ, এই ত্যাদড়ের ফাঁদে পড়েছিস বুঝি? দাঁড়া, তাকে আমি মজা দেখাচ্ছি........'
এই বলে লোকটা বসা থেকে উঠতে গেলো।
সাজিদ জোরে বলে উঠলো,- 'না না স্যার। ও কিচ্ছু জানে না।'
- 'তাহলে?'
- 'আসলে স্যার, বলতে সংকোচ বোধ করলেও সত্য এটাই যে, নাস্তিকতার উপর আপনি যেসব লজিক দেখিয়েছেন, সেগুলো এতটাই দূর্বল যে, নাস্তিকতার উপর আমি বেশিদিন ঈমান রাখতে পারি নি।'
এইটুকু বলে সাজিদ মাথা নিঁচু করে ফেললো।

লোকটার চেহারাটা মূহুর্তেই রুক্ষ ভাব ধারন করলো। বললো,- 'তার মানে বলতে চাইছিস, তুই এখন আমার চেয়েও বড় পন্ডিত হয়ে গেছিস? আমার চেয়েও বেশি পড়ে ফেলেছিস? বেশি বুঝে ফেলেছিস?'
সাজিদ তখনও মাথা নিঁচু করে আছে।
লোকটা বললো,- 'যাক গে! একটা সিগারেট খাবো।ম্যাচ নেই। তোর কাছে আছে?'
- 'জ্বি স্যার।'- এই বলে সাজিদ ব্যাগ খুলে একটি ম্যাচ বের করে লোকটার হাতে দিলো।সাজিদ সিগারেট খায় না।তবে, প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো তার ব্যাগে থাকে সবসময়।

লোকটা সিগারেট ধরালো।কয়েকটা জোরে জোরে টান দিয়ে ফুঁস করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো।ধোঁয়াগুলো মূহুর্তেই কুন্ডুলি আকারে ষ্টেশান মাষ্টারের ঘরের রেলিং বেয়ে উঠে যেতে লাগলো উপরের দিকে।আমি সেদিকে তাকিয়ে আছি।

লোকটার কাশি উঠে গেলো। কাশতে কাশতে লোকটা বসা থাকে উঠে পড়লো। এই মূহুর্তে উনার সিগারেট খাওয়ার আর সম্ভবত ইচ্ছে নেই।লোকটা সিগারেটের টুকরোটিকে নিচে ফেলে পা দিয়ে একটি ঘষা দিলো।অমনি সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোটি থেঁতলে গেলো।
সাজিদের দিকে ফিরে লোকটা বললো,- 'তাহলে এখন বিশ্বাস করিস যে স্রষ্টা বলে কেউ আছে?'
সাজিদ হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লো।
- 'স্রষ্টা এই বিশ্বলোক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছে বলে বিশ্বাস করিস তো?'
আবারো সাজিদ হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লো।
এবার লোকটা একটা অদ্ভুত ভয়ঙ্কররকম হাসি দিলো।এই হাসি এতটাই বিদঘুটে ছিলো যে আমার গা ছমছম করতে লাগলো।
লোকটি বললো,- 'তাহলে বল দেখি, স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করলো?'
এই প্রশ্নটি করে লোকটি আবার সেই বিদঘুটে হাসিটা হাসলো। গা ছমছমে।
সাজিদ বললো,- 'স্যার, বাই ডেফিনিশন, স্রষ্টার কোন সৃষ্টিকর্তা থাকতে পারে না।যদি বলি X-ই সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টি করেছে, তৎক্ষণাৎ আবার প্রশ্ন উঠবে, তাহলে X- এর সৃষ্টিকর্তা কে? যদি বলি Y, তাহলে আবার প্রশ্ন উঠবে, Y এর সৃষ্টিকর্তা কে? এভাবেই চলতে থাকবে। কোন সমাধানে যাওয়া যাবে না।'
লোকটি বললো,- 'সমাধান আছে।'
- 'কি সেটা?'
- 'মেনে নেওয়া যে- স্রষ্টা নাই,ব্যস!'- এইটুকু বলে লোকটি আবার হাসি দিলো। হা হা হা হা।
সাজিদ আপত্তি জানালো। বললো,- 'আপনি ভুল, স্যার।'
লোকটি চোখ কপালে তুলে বললো,- 'কি? আমি? আমি ভুল?'
- 'জ্বি স্যার।'
- 'তাহলে বল দেখি, স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করলো? উত্তর দে।দেখি কতো বড় জ্ঞানের জাহাজ হয়েছিস তুই।'
আমি বুঝতে পারলাম এই লোক সাজিদকে যুক্তির গ্যাড়াকলে ফেলার চেষ্টা করছে।
সাজিদ বললো,- 'স্যার, গত শতাব্দীতেও বিজ্ঞানিরা ভাবতেন, এই মহাবিশ্ব অনন্তকাল ধরে আছে।মানে, এটার কোন শুরু নেই।তারা আরো ভাবতো, এটার কোন শেষও নাই।তাই তারা বলতো- যেহেতু এটার শুরু-শেষ কিছুই নাই, সুতরাং, এটার জন্য একটা সৃষ্টিকর্তারও দরকার নাই।
কিন্তু থার্মোডাইনামিক্সের তাপ ও গতির সূত্রগুলো আবিষ্কার হওয়ার পর এই ধারনা তো পুরোপুরিভাবে ভ্যানিশ হয়ই,সাথে পদার্থবিজ্ঞানেও ঘটে যায় একটা বিপ্লব।থার্মোডাইনামিক্সের তাপ ও গতির দ্বিতীয় সূত্র বলছে- 'এই মহাবিশ্ব ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ অস্তিত্ব থেকে পর্যায়ক্রমে উত্তাপহীন অস্তিত্বের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে।কিন্তু এই সূত্রটাকে উল্টোথেকে প্রয়োগ কখনোই সম্ভব নয়।অর্থাৎ, কম উত্তাপ অস্তিত্ব থেকে এটাকে বেশি উত্তাপ অস্তিত্বের দিকে নিয়ে যাওয়া আদৌ সম্ভব নয়।এই ধারনা থেকে প্রমান হয়, মহাবিশ্ব চিরন্তন নয়।এটা অনন্তকাল ধরে এভাবে নেই।এটার একটা নির্দিষ্ট শুরু আছে।থার্মোডাইনামিক্সের সূত্র আরো বলে, - এভাবে চলতে চলতে একসময় মহাবিশ্বের সকল শক্তির অবক্ষয় ঘটবে।আর মহাবিশ্ব ধ্বংস হবে।'

লোকটি বললো,- 'উফফফফ! আসছেন বৈজ্ঞানিক লম্পু। সহজ করে বল ব্যাটা।'
সাজিদ বললো,- 'স্যার, একটা গরম কফির কাপ টেবিলে রাখা হলে, সেটা সময়ের সাথে সাথে আস্তে আস্তে তাপ হারাতে হারাতে ঠান্ডা হতেই থাকবে।কিন্তু সেটা টেবিলে রাখার পর যে পরিমাণ গরম ছিলো, সময়ের সাথে সাথে সেটা আরো বেশি গরম হয়ে উঠবে- এটা অসম্ভব।এটা কেবল ঠান্ডাই হতে থাকবে। একটা পর্যায়ে গিয়ে দেখা যাবে, কফির কাপটা সমস্ত তাপ হারিয়ে একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে। এটাই হচ্ছে থার্মোডাইনামিক্সের সূত্র।'
- 'হুম,তো?'
- 'এর থেকে প্রমান হয়, মহাবিশ্বের একটা শুরু আছে। মহাবিশ্বের যে একটা শুরু আছে- তারও প্রমান বিজ্ঞানিরা পেয়েছে। মহাবিশ্ব সৃষ্টি তত্বের উপর এ যাবৎ যতোগুলো থিওরি বিজ্ঞানিমহলে এসেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য, প্রমানের দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী থিওরি হলো- বিগ ব্যাং থিওরি।বিগ ব্যাং থিওরি বলছে- মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে একটি বিস্ফোরণের ফলে।তাহলে স্যার, এটা এখন নিশ্চিত যে, মহাবিশ্বের একটি শুরু আছে।'
লোকটা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লো।
সাজিদ আবার বলতে শুরু করলো,- স্যার, আমরা সহজ সমীকরণ পদ্ধতিতে দেখবো স্রষ্টাকে সৃষ্টির প্রয়োজন আছে কিনা, মানে স্রষ্টার সৃষ্টিকর্তা থাকতে পারে কিনা।
সকল সৃষ্টির একটা নির্দিষ্ট শুরু আছে এবং শেষ আছে............ ধরি, এটা সমীকরণ ১।
মহাবিশ্ব একটি সৃষ্টি........... এটা সমীকরণ ২।
এখন সমীকরণ ১ আর ২ থেকে পাই-
সকল সৃষ্টির শুরু এবং শেষ আছে।মহাবিশ্ব একটি সৃষ্টি,তাই এটারও একটা শুরু এবং শেষ আছে।
তাহলে, আমরা দেখলাম- উপরের দুটি শর্ত পরস্পর মিলে গেলো,এবং তাতে থার্মোডাইনামিক্সের তাপ ও গতির সূত্রের কোন ব্যাঘাত ঘটে নি।
- 'হু'
- 'আমার তৃতীয় সমীকরণ হচ্ছে- 'স্রষ্টা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।'
তাহলে খেয়াল করুন, আমার প্রথম শর্তের সাথে কিন্তু তৃতীয় শর্ত ম্যাচ হচ্ছে না।
আমার প্রথম শর্ত ছিলো- সকল সৃষ্টির শুরু আর শেষ আছে।কিন্তু তৃতীয় শর্তে কথা বলছি স্রষ্টা নিয়ে।তিনি সৃষ্টি নন, তিনি স্রষ্টা।তাই এখানে প্রথম শর্ত খাটে না।সাথে, তাপ ও গতির সূত্রটিও এখানে আর খাটছে না।তার মানে, স্রষ্টার শুরুও নেই, শেষও নাই।অর্থাৎ, তাকে নতুন করে সৃষ্টিরও প্রয়োজন নাই।তার মানে স্রষ্টার আরেকজন স্রষ্টা থাকারও প্রয়োজন নাই। তিনি অনাদি, অনন্ত।'
এইটুকু বলে সাজিদ থামলো। হুমায়ুন আজাদ নামের লোকটি কপালের ভাঁজ দীর্ঘ করে বললেন,- 'কি ভংচং বুঝালি এগুলা? কিসব সমীকরণ টমীকরণ? এসব কি? সোজা সাপ্টা বল।আমাকে অঙ্ক শিখাচ্ছিস? Laws Of Causality সম্পর্কে ধারনা আছে? Laws Of Causality মতে, সবকিছুর পেছনে একটা Cause বা কারণ থাকে। সেই সূত্র মতে, স্রষ্টার পেছনেও একটা কারণ থাকতে হবে।'
সাজিদ বললো,- 'স্যার, উত্তেজিত হবেন না প্লিজ।আমি আপনাকে অঙ্ক শিখাতে যাবো কোন সাহসে? আমি শুধু আমার মতো ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছি।'
- 'কচু করেছিস তুই।Laws Of Causality দিয়ে ব্যাখ্যা কর। '- লোকটা উচ্চস্বরে বললো।
- 'স্যার, Laws Of Causality বলবৎ হয় তখনই, যখন থেকে Time, Space এবং Matter জন্ম লাভ করে, ঠিক না? কারন, আইনষ্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটিও স্বীকার করে যে- Time জিনিসটা নিজেই Space আর Matter এর সাথে কানেক্টেড।Cause এর ধারনা তখনই আসবে, যখন Time-Space-Matter এই ব্যাপারগুলা তৈরি হবে।তাহলে, যিনিই এই Time-Space-Matter এর স্রষ্টা, তাকে কি করে আমরা Time-Space-Matter এর বাটখারাতে বসিয়ে Laws Of Causality দিয়ে বিচার করবো,স্যার? এটা তো লজিক বিরুদ্ধ, বিজ্ঞান বিরুদ্ধ।'
লোকটা চুপ করে আছে। কিছু হয়তো বলতে যাচ্ছিলো। এরমধ্যেই আবার সাজিদ বললো,- 'স্যার, আপনি Laws Of Causality'র যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেটা ভুল।'

লোকটা আবার রেগে গেলো। রেগেমেগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললো,- 'এই ছোকরা! আমি ভুল বলেছি মানে কি? তুই কি বলতে চাস আমি বিজ্ঞান বুঝি না?'
সাজিদ বললো,- 'না না স্যার, একদম তা বলিনি। আমার ভুল হয়েছে।আসলে, বলা উচিত ছিলো যে- Laws Of Causality'র সংজ্ঞা বলতে গিয়ে আপনি ছোট্ট একটা জিনিস মিস করেছেন।'
লোকটার চেহারা এবার একটু স্বাভাবিক হলো।বললো,- 'কি মিস করেছি?'
- 'আপনি বলেছেন, Laws Of Causality মতে, সবকিছুরই একটি Cause থাকে।আসলে এটা স্যার সেরকম নয়। Laws Of Causality হচ্ছে- Everything which has a beginning has a cause.. অর্থাৎ, এমন সবকিছু, যেগুলোর একটা নির্দিষ্ট শুরু আছে- কেবল তাদেরই Cause থাকে।স্রষ্টার কোন শুরু নেই, তাই স্রষ্টাকে Laws Of Causality দিয়ে মাপাটা যুক্তি এবং বিজ্ঞান বিরুদ্ধ।'
লোকটার মুখ কিছুটা গম্ভীর হয়ে গেলো।বললো,- 'তুই কি ভেবেছিস, এরকম ভারি ভারি কিছু শব্দ ব্যবহার করে কথা বললেই আমি তোর যুক্তি মেনে নিবো? অসম্ভব।'
সাজিদ এবার মুচকি হাসলো। হেসে বললো,- 'স্যার, আপনার হাতে একটি বই দেখছি। অইটা কি বই?'
- ' এটা আমার লেখা বই- 'আমার অবিশ্বাস।'
- 'স্যার, অইটা আমাকে দিবেন একটু?'
- 'এই নে,ধর।'
সাজিদ বইটা হাতে নিয়ে উল্টালো। উল্টাতে উল্টাতে বললো,- 'স্যার, এই বইয়ের কোন লাইনে আপনি আছেন?'
লোকটা ভুরু কুঁচকে বললো,- 'মানে?'
- 'বলছি, এই বইয়ের কোন অধ্যায়ের, কোন পৃষ্টায়, কোন লাইনে আপনি আছেন?'
- 'তুই অদ্ভুত কথা বলছিস। আমি বইয়ে থাকবো কেন?'
- 'কেন থাকবেন না? আপনি এর স্রষ্টা না?'
- 'হ্যাঁ।'
- 'এই বইটা কালি আর কাগজ দিয়ে তৈরি। আপনিও কি কালি আর কাগজ দিয়ে তৈরি স্যার?'
- 'খুবই ষ্টুপিডিটি টাইপ প্রশ্ন। আমি এই বইয়ের স্রষ্টা। এই বই তৈরির সংজ্ঞা দিয়ে কি আমাকে ব্যাখ্যা করা যাবে?'
সাজিদ আবার হেসে দিলো।বললো,- 'না স্যার।এই বই তৈরির যে সংজ্ঞা, সে সংজ্ঞা দিয়ে মোটেও আপনাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। ঠিক সেভাবে, এই মহাবিশ্ব যিনি তৈরি করেছেন, তাকেও তার সৃষ্টির Time-Space-Matter-Cause এসব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না।
আপনি কালি,কলম বা কাগজের তৈরি নন, তার উর্ধ্বে।কিন্তু আপনি Time-Space-Matter-Cause এর উর্ধ্বে নন।আপনাকে এগুলো দিয়ে ব্যাখ্যা করাই যায়।কিন্তু সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন এমন একজন,যিনি নিজেই Time-Space-Matter-Cause এর সৃষ্টিকর্তা।তাই তাকে Time-Space-Matter-Cause দিয়ে পরিমাপ করা যাবে না।অর্থাৎ, তিনি এসবের উর্ধ্বে।অর্থাৎ, তার কোন Time-Space-Matter-Cause নাই।অর্থাৎ, তার কোন শুরু-শেষ নাই।অর্থাৎ, তার কোন সৃষ্টিকর্তা নাই।'
লোকটা উঠে দাঁড়ালো।উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো- 'ভালো ব্রেইনওয়াশড! ভালো ব্রেইনওয়াশড! আমরা কি এমন তরুণ প্রজন্ম চেয়েছিলাম? হায়! আমরা কি এমন তরুণ প্রজন্ম চেয়েছিলাম?'
এটা বলতে বলতে লোকটা হাঁটা ধরলো। দেখতে দেখতেই উনি ষ্টেশানে মানুষের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন।

ঠিক সেই মূহুর্তেই আমার ঘুম ভেঙে গেলো। ঘুম ভাঙার পর আমি কিছুক্ষণ ঝিম মেরে ছিলাম।ঘড়িতে সময় দেখলাম।রাত দেড়টা বাজে।সাজিদের বিছানার দিকে তাকালাম।দেখলাম, সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে।আমি উঠে তার কাছে গেলাম। গিয়ে দেখলাম সে যে বইটা পড়ছে, সেটার নাম- 'আমার অবিশ্বাস। বইয়ের লেখক- হুমায়ুন আজাদ।
সাজিদ বই থেকে মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো।তার ঠোঁটের কোণায় একটি অদ্ভুত হাসি।

আমি বিরাট একটা শক খেলাম। নাহ! এটা হতে পারে না। স্বপ্নের উপর কারো হাত নেই- আমি বিড় বিড় করে বলতে লাগলাম।

একটি সাম্প্রদায়িক আয়াত, এবং....

সেদিন শাহবাগ মোড়ে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম।আমি, সাজিদ, রূপম, মিলু, তারেক, শাহরিয়ার আর মিশকাত। প্রথমেই বলে রাখি, আমাদের মধ্যে সাজিদ হলো এক্স-এথেইষ্ট।আগে নাস্তিক ছিলো, এখন আস্তিক। রূপম আর শাহরিয়ার এখনো নাস্তিক।মার্কস-ই হলো তাদের ধ্যান-জ্ঞান। মিলু এগনোষ্টিক। স্রষ্টা কি সত্যিই আছে, নাকি আদৌ নাই- সেই ব্যাপারে কোন সমাধানে মিলু এখনো আসতে পারে নি। তারেক, মিশকাত আর আমি, আমরা মোটামুটি কোনদিকে যাইনি এখনো।

সপ্তাহের প্রতি রোববারে আমরা এখানে আড্ডা দিই।আড্ডা না বলে এটাকে 'পাঠচক্র' বলাই যুতসই। সপ্তাহান্তে এখানে এসে আমরা পুরো এক সপ্তাহে কে কি পড়েছি, পড়ে কি বুঝেছি, কি বুঝিনি এসব আলোচনা করি। ভারি ইংরেজিতে যেটাকে 'বুক রিভিউ' বলা হয় আর কি!
আজকের আলোচক দু'জন। শাহরিয়ার আর সাজিদ। শাহরিয়ার আলোচনা করবে প্লেটো'র 'রিপাবলিক' এর উপর, আর সাজিদ আলোচনা করবে আল কোরআনের উপর।
দুজনই তুখোঁড় আলোচক। 'রিপাবলিক' নিয়ে শাহরিয়ারের আলোচনা বেশ জম্পেশ ছিলো। রিপাবলিকে প্লেটো নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ, শিষ্টাচার, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, রাষ্ট্রের গঠন,উপাদান, পরিবার, নারী-পুরুষের মনস্তত্ত্ব, সমাজে নারী-পুরুষের মূল্যায়ন ইত্যাদির উপর যে সবিস্তর আলোচনা করেছিলেন, শাহরিয়ার খুবই চমৎকারভাবে তার সার সংক্ষেপ আমাদের সামনে তুলে ধরলো।মনে হচ্ছিলো- প্লেটোই যেন আমাদের সামনে আঙুল উঁচিয়ে উঁচিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন কোন জিনিসটার কি ব্যাখ্যা, কি কাজ,কি ধর্ম।
শাহরিয়ারের আলোচনা শেষ হলে সাজিদ তার আলোচনা শুরু করে। সেও আল কোরআন নাজিল হবার কারন, এতে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার, নারী-পুরুষ এবং এতদসংক্রান্ত যে বিষয়গুলো আছে- তার একটি চমৎকার সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরলো।আলোচনা শেষ করার আগে সাজিদ এই বলে শেষ করলো যে,- 'আল কোরআন নাজিল হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য।এটি যে শুধু মুসলিমদের জন্য,তা নয়।আমাদের সুশীলীয় পরিভাষায় যেটাকে অসাম্প্রদায়িক বলে আর কি।'
এতটুকু বলে সাজিদ থেমে গেলো।
দু'জনের আলোচনাই বেশ প্রফুল্ল ছিলো।কিন্তু গন্ডগোল পাকালো রূপম।সাজিদ আল কোরআনকে অসাম্প্রদায়িক কিতাব বলেছে- এটা সে মেনে নিতে পারেনি।
বলে নিই, রূপম সাজিদের ক্লাশমেট। তাই দুজনের মধ্যকার সম্পর্কটি আমি-তুমি বা আমি-আপনি নয়, তুই তুকারির সম্পর্ক।
রূপম খুবই অবজ্ঞার সুরে, সাজিদকে উদ্দেশ্য করে বললো,- 'কোরান অসাম্প্রদায়িক, এইটাও আমাকে শুনতে হলো, হা হা হা হা।'
সাজিদ বললো,- 'হ্যাঁ। অবশ্যই।'
এরপর রূপম বললো,- 'কোরআনের সাম্প্রদায়িক আয়াত মনে হয় তুই এখনো পড়িস নি।তাই জানিস না।'
- 'আমি না পড়ে থাকলে তুই পড়ে আমাকে শোনা'- সাজিদ বললো।
রূপম ইংরেজিতে সূরা আলে-ইমরানের ১১৮ নং আর আল মায়েদার ৫১ নং আয়াতটি পড়ে শোনালো।সাথে অনুবাদ করেও পড়লো। সে বললো,-
'O you, who believe! do not take for intimate friends from among others than your own people'

'হে বিশ্বাসীরা! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহন করো না।'

দেখ! কোরানই তোদের বলছে, আমাদের,মানে অমুসলিমদের বন্ধুরূপে না নিতে।আর তুই বসে বসে এখানে কোরানকে অসাম্প্রদায়িকতার সার্টিফিকেট দিচ্ছিস।হাস্যকর না? এটা অসাম্প্রদায়িকতার নতুন সংজ্ঞা বুঝি? অমুসলিমদের বন্ধু বানাবা না, খবরদার! - হা হা হা।'
আমি একটু চিন্তায় পড়লাম। অবজ্ঞার সুরে বললেও রূপমের কথা একেবারে ফেলে দেবার মতো নয়।

অপেক্ষা করছি সাজিদের উত্তরের জন্য।
সাজিদ একটু ঝেড়ে কেশে নিলো। এরপর বলতে শুরু করলো-

'দেখ রূপম! কোরআন নাজিল হয়েছে হজরত মুহাম্মদ সাঃ এর উপর।এখন কোরআনের আয়াতগুলোকে আমাদের বুঝতে হবে ঠিক সেভাবে, যেভাবে মুহাম্মদ সাঃ বুঝিয়েছেন। প্লেটো'র রিপাবলিক তুই তোর মন মতো ব্যাখ্যা করতে পারিস না বা বুঝে নিতে পারিস না।তোকে ঠিক সেভাবেই বুঝতে হবে, যেভাবে প্লেটো বুঝিয়েছে। এইটুকু তো কমন সেন্সের ব্যাপার, তাই না?'
রূপম বললো,- 'হুম।'
- 'এখন কোরআনকে আমরাও সেভাবেই বুঝবো, যেভাবে মুহাম্মদ সাঃ বুঝিয়েছেন। প্রথমে তুই যে আয়াতের কথা বললি, সেই আয়াতে আসি।অই আয়াতে আল্লাহ আমাদের বলেছেন- অমুসলিমদের বন্ধু হিসেবে গ্রহন না করতে। এখানে আল্লাহ তায়ালা 'বন্ধু' শব্দটার জন্য যে এ্যারাবিক ওয়ার্ডটি ব্যবহার করেছেন, তা হলো - আউলিয়া।রাইট?'
রূপম বললো,- 'হতে পারে।আমি আরবি বুঝি না।'
রূপমের আরবি বুঝার কথাও না। সে হিন্দু ফ্যামিলি থেকে উঠে আসা। ব্লগে মুক্তমনা তথা নাস্তিকদের লেখা-যোখা পড়ে কোরআন নিয়ে যা একটু জানে। সাজিদ আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো- 'আরিফ, মোবাইল খুলে কোরআনের এপ্স থেকে আয়াতটি তিলাওয়াত করে শোনা।'
আমি শুনালাম। রূপম বিশ্বাস করলো যে, সেই আয়াতে 'বন্ধু' শব্দের জন্য আরবি 'আউলিয়া' শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে।
সাজিদ বললো,- 'শুনলি?'
- 'হ্যাঁ।'
- 'এখন, আমরা এটাকে ব্যাখ্যা করবো। এ্যারাবিকে 'আউলিয়া' শব্দটির জন্য দুটি অর্থ করা যায়। এক- বন্ধু, দুই- অভিভাবক। আমরা এখানে সেই অর্থটা নেবো, যেটা রাসূল সাঃ থেকে প্রমান হয়ে আসবে।
তার আগে দুটি বিষয় ক্লিয়ার করি। 'আউলিয়া' শব্দের জন্য 'বন্ধু' আর 'অভিভাবক' দুই অর্থ করা গেলেও, এই দুই শব্দের মধ্যে একটা সুক্ষ্ম পার্থক্য আছে।বন্ধু মানে বন্ধু। এই যেমন, তুই আমার বন্ধু।আমি তোর সাথে এখানে বসে আড্ডা দিচ্ছি, খাচ্ছি।অনেক রাত একসাথে ঘুমিয়েছি।ক্লাশ করি একসাথে ইত্যাদি। আবার, আমার বাবা-মাও আমার বন্ধু।কিন্তু, তুই আর আমার বাবা-মা কি একই রকম বন্ধু? নাহ। পার্থক্য আছে।তারা আমার অভিভাবক, বন্ধু। তোর সাথে বন্ধুত্বের যে ডেফিনিশন, তাদের সাথে সামথিং মোর দ্যান দ্যাট,রাইট?'
রূপম মাথা নাড়লো।
সাজিদ আবার বলতে লাগলো-
'আমার বাবা-মা আমার যাবতীয় সিক্রেট জানে।আমার দূর্বলতা কোথায় জানে।তুই জানিস?'
- 'নাহ।'
- 'এবার মুহাম্মদ সাঃ এর জীবনীতে যা। তুই সেখানে দেখবি- তিনি অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করেছেন। অমুসলিমদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন। তাদের সাথে খেয়েছেন, কাজ করেছেন, কতো কি।মানে, এখন আমি যা যা তোর সাথে করি,সেরকম। তাই না?'
আমাদের সবাই মাথা নাড়লাম। রূপমও মাথা নাড়লো।
- 'তাহলে দেখা যাচ্ছে- অই আয়াতে 'আউলিয়া' অর্থে আমরা 'বন্ধু' শব্দটা নিতে পারবো না।কারন, আল্লাহ তায়ালা যদি 'আউলিয়া' শব্দটি দ্বারা 'বন্ধু'ই বুঝাতেন, তাহলে রাসূল সাঃকখনোই অমুসলিমদের সাথে উঠা-বসা করতেন না।তাহলে প্রশ্ন, এখানে, 'আউলিয়া' শব্দের কোন অর্থ বুঝানো হয়েছে? হ্যাঁ, এখানে- 'আউলিয়া' শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়েছে 'অভিভাবক'। আল্লাহ আমাদের বলেছেন, 'হে বিশ্বাসীরা! তোমরা অমুসলিমদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহন করো না।'
একজন অভিভাবক হলো সেই, যে আমাদের যাবতীয় গোপন খবর জানবে, আমাদের শক্তি,আমাদের কৌশল, আমাদের দূর্বলতা জানবে।এখন আল্লাহ বলেছেন, অমুসলিমদের অভিভাবক হিসেবে নিয়ো না। মানে,

অমুসলিমদের কাছে তোমরা তোমাদের সিক্রেট বলে দিয়ো না।কারন, এতে কোন একসময় হিতে বীপরিত হতে পারে।বিপদ হতে পারে।
- 'কি রকম বিপদ'- তারেক জিজ্ঞেস করলো।
সাজিদ বললো,- 'যেমন, ইসলামের প্রথম জিহাদ কোনটি? বদর যুদ্ধ।তাই না?'
- 'হ্যাঁ।' - আমি বললাম।
- 'সেই যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা কতো ছিলো? মাত্র ৩১৩ জন,আর প্রতিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা ছিলো প্রায় এক হাজার না কতো। তাই তো?'
- 'হু'
- 'ধর, সেই যুদ্ধের আগে মুসলিমরা যদি অমুসলিমদের কাছে গিয়ে বলতো- জানো, আমরা না মাত্র ৩১৩ জন নিয়ে ওদের সাথে লড়বো।
এইটা কি ঠিক হতো?? নাহ, হতো না। কেউ না কেউ এই খবর প্রতিপক্ষের কানে পৌঁছিয়ে দিতো।তখন কি হতো? প্রতিপক্ষের মনে সাহস বেড়ে যেতো। তারা যুদ্ধে শারীরিকভাবে জেতার আগেই মনস্তাত্ত্বিকভাবে জিতে যেতো। এটা কি শুভ হতো? আজকের দিনে কোন দেশ কি এই ফর্মূলা এপ্লাই করবে? আমেরিকা কি তার সামরিক শক্তির কথা চীন বা রাশিয়ার কাছে শেয়ার করে? করে না। ঠিক একইভাবে আল্লাহও বলছেন- ওদের তোমরা অভিভাবক হিসেবে নিয়ো না।
এটা একটা সেইফটি। এখানে বন্ধু বানাতে নিষেধ করেনি, নিষেধ করেছে অভিভাবক না বানাতে।'
আমরা চুপ করে আছি। রূপমও কিছু বলছে না।
এবার সাজিদ বললো,- 'রূপম, ফাষ্ট ইয়ার থেকেই আমি তোর বন্ধু। আমাদের বন্ধুত্বের আজকে চার বছর চলছে।এই চার বছরের বন্ধুত্বে তুই কোনদিন আমাকে তোর ব্যাংক এ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়েছিস? হা হা হা। দিস নি। তোর ক্রেডিট কার্ডের গোপন নাম্বার কোনদিন আমায় বলেছিস? বলিস নি। এমনকি কোনদিন তোর ফেইসবুক পাসওয়ার্ডটিও তো দিলি না ব্যাটা। হা হা হা। কেন দিলি না? কারন, আমি তোর বন্ধু, তোর অভিভাবক নই।
এখন কি আমি তোকে বলতে পারি- রূপম, তুই ব্যাটা আস্ত একটা সাম্প্রদায়িক ফ্রেন্ড, বলতে পারি? হা হা হা।'

সাজিদ রূপমের মুখের দিকে চেয়ে আছে কোন একটি উত্তরের আশায়। রূপম কিছু না বলে পিক করে হেসে দিলো। মনে হচ্ছে সাজিদের কথায় সে খুব মজা পেয়েছে।

কোরআন কি সূর্যকে পানির নিচে ডুবে যাওয়ার কথা বলে?

সাজিদের খুব মন খারাপ।আমি রুমে ঢুকে দেখলাম সে তার খাটের উপর শক্তমুখ করে বসে আছে।
আমি বললাম,- 'ক্লাশ থেকে কবে এলি?'
সে কোন উত্তর দিলো না। আমি কাঁধ থেকে সাড়ে দশ কেজি ওজনের ব্যাগটি নামিয়ে রাখলাম টেবিলের উপর। তার দিকে ফিরে বললাম,- 'কি হয়েছে রে? মুখের অবস্থা তো নেপচুনের উপগ্রহ ট্রাইটনের মতো করে রেখেছিস।'
সে বললো,- 'ট্রাইটন দেখতে কি রকম?'
- 'আমি শুনেছি ট্রাইটন দেখতে নাকি বাঙলা পাঁচের মতো।'
আমি জানি, সাজিদ এক্ষুনি একটা ছোটখাটো লেকচার শুরু করবে। সে আমাকে ট্রাইটনের অবস্থান, আকার-আকৃতি, ট্রাইটনের ভূ-পৃষ্টে নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ, সূর্য আর নেপচুন থেকে ট্রাইটনের দূরত্ব কতো- তার যথাযথ বিবরণ এবং তথ্যাদি দিয়ে প্রমান করে দেখাবে যে, ট্রাইটন দেখতে মোটেও বাঙলা পাঁচের মতো নয়।
এই মূহুর্তে তার লেকচার বা বকবকানি, কোনটাই শোনার আমার ইচ্ছে নেই।তাই, যে করেই হোক, তাকে দ্রুত থামিয়ে দিতে হবে। আমি আবার বললাম,- 'ক্লাশে গিয়েছিলি?'
- 'হু'
- 'কোন সমস্যা হয়েছে নাকি? মন খারাপ? '
সে আবার চুপ মেরে গেলো।এই হলো একটা সমস্যা।সাজিদ যেটা বলতে চাইবে না, পৃথিবী যদি ওলট-পালট হয়েও যায়, তবু সে মুখ খুলে সেটা কাউকে বলবে না।
সে বললো,- 'কিচেনে যা। ভাত বসিয়েছি। দেখে আয় কি অবস্থা।'
আমি আকাশ থেকে পড়ার মতো করে বললাম,- 'ভাত বসিয়েছিস মানে? বুয়া আসে নি?'
- 'না।'
- 'কেন?'
- 'অসুস্থ বললো।'
- 'তাহলে আজ খাবো কি?'
সাজিদ জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো।সেদিকে তাকিয়েই বললো,- 'ভাত বসিয়েছি। কলে যথেষ্ট পরিমাণে পানি আছে। পানি দিয়ে ভাত গিলা হবে।'
সিরিয়াস সময়গুলোতেও তার এরকম রসিকতা আমার একেবারেই ভালো লাগে না।
অগত্যা কিচেনের দিকে হাঁটা ধরলাম।
যেটা ভেবেছি ঠিক সেটা নয়।ভাত বসানোর পাশাপাশি সে ডিম সেদ্ধ করে রেখেছে।আমার পেছন পেছন সাজিদও আসলো। এসে ভাত নামিয়ে কড়াইতে তেল, তেলে কিছু পেঁয়াজ কুঁচি, হালকা গুড়ো মরিচ, এক চিমটি নুন দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে, তাতে ডিম দুটো ছেড়ে দিলো। পাশে আমি পর্যবেক্ষকের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছি। মনে হচ্ছে, সাজিদ কোন রান্না প্রতিযোগিতার প্রতিযোগি, আর আমি চিফ জাস্টিস। অল্প কিছুক্ষণ পরেই ডিম দুটোর বর্ণ লালচে হয়ে উঠলো। মাছকে হালকা ভাঁজলে যেরকম দেখায়, সেরকম। সুন্দর একটি পোঁড়া গন্ধও বেরিয়েছে।
আমি মুচকি হেসে বললাম,- 'খামোখা বুয়া রেখে এতগুলো টাকা অপচয় করি প্রতিমাসে। অথচ, ভুবন বিখ্যাত বুয়া আমার রুমেই আছে। হা হা হা।'
সাজিদ আমার দিকে ফিরে আমার কান মলে দিয়ে বললো,- 'সাহস তো কম না তোর? আমাকে বুয়া বলিস?'
আমি বললাম,- 'ওই দেখ, পুঁড়ে যাচ্ছে।'
সাজিদ সেদিকে ফিরতেই আমি দিলাম এক ভোঁ দৌড়!
-
গোসল সেরে, নামাজ পড়ে, খেয়ে-দেয়ে উঠলাম। রুটিন অনুযায়ী, সাজিদ এখন ঘুমোবে। রাতের যে বাড়তি অংশটা সে বই পড়ে কাটায়, সেটা দুপুর বেলা ঘুমিয়ে পুষিয়ে নেয়।
আমার আজকে কাজ নেই। চাইলেই ঘুরতে বেরোতে পারি।কিন্তু বাইরে যা রোদ! সাহস হচ্ছিলো না।
এরমধ্যেই সাজিদ ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটি কচকচানি রয়ে গেলো। সাজিদকে এরকম মন খারাপ অবস্থায় আমি আগে কখনো দেখি নি। কেন তার মন খারাপ সে ব্যাপারে জানতে না পারলে শান্তি পাচ্ছি না। কিন্তু সাজিদকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। সে কোনদিনও বলবে না।ভাবছি কি করা যায়?
তখন মনে পড়লো তার সেই বিখ্যাত (আমার মতে) ডায়েরিটার কথা, যেটাতে সে তার জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো হুবহু লিখে রাখে।আজকে তার মন খারাপের ব্যাপারটিও নিশ্চয় সে তুলে রেখেছে।
তার টেবিলের ড্রয়ার খুলে তার ডায়েরিটা নিয়ে উল্টাতে লাগলাম।
মাঝামাঝিতে এসে পেয়ে গেলাম মূল ঘটনাটা।যেরকম লেখা আছে, সেভাবেই তুলে ধরছি-

০৭/০৫/১৪
'মফিজুর রহমান স্যার। এই ভদ্রলোক ক্লাশে আমাকে উনার শত্রু মনে করেন। ঠিক শত্রু না, প্রতিদ্বন্দ্বী বলা যায়। আমাকে নিয়ে উনার সমস্যা হলো- উনি উল্টাপাল্টা কথাবার্তা বলে, ক্লাশের ছেলে-মেয়েদের মনে ধর্ম, ধর্মীয় কিতাব, আল্লাহ, রাসূল ইত্যাদি
নিয়ে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করেন।কিন্তু, আমি প্রতিবারই উনার এহেন কাজের প্রতিবাদ করি।উনার যুক্তির বীপরিতে যুক্তি দিই। এমনও হয়েছে, যুক্তিতে আমার কাছে পরাজিত হয়ে উনি ক্লাশ থেকেও চলে গিয়েছিলেন কয়েকবার।
এই কারনে এই বামপন্থি লোকটা আমাকে উনার চক্ষুশূল মনে করেন।
সে যাকগে! আজকের কথা বলি।
আজকে ক্লাশে এসেই ভদ্রলোক আমাকে খুঁজে বের করলেন। বুঝতে পেরেছি, নতুন কোন উছিলা খুঁজে পেয়েছে আমাকে ঘায়েল করার।
ক্লাশে আসার আগে মনে হয় পান খেয়েছিলেন। ঠোঁটের এক কোণায় চুন লেগে আছে।
আমাকে দাঁড় করিয়ে বড় বড় চোখ করে বললেন,- 'বাবা আইনষ্টাইন, কি খবর?'
ভদ্রলোক আমাকে তাচ্ছিল্য করে 'আইনষ্টাইন' বলে ডাকেন। আমাকে আইনষ্টাইন ডাকতে দেখে উনার অন্য শাগরেদবৃন্দগণ হাসাহাসি শুরু করলো।
আমি কিছু না বলে চুপ করে আছি। তিনি আবার বললেন,- 'শোন বাবা আইনষ্টাইন, তুমি তো অনেক বিজ্ঞান জানো, বলো তো দেখি, সূর্য কি পানিতে ডুবে যায়?'
ক্লাশ স্তিমিত হয়ে গেলো। সবাই চুপচাপ।
আমি মাথা তুলে স্যারের দিকে তাকালাম। বললাম,- 'জ্বি না স্যার। সূর্য কখনোই পানিতে ডুবে না।'
স্যার অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে বললেন,- ' ডুবে না? ঠিক তো?'
- 'জ্বি স্যার।'
- 'তাহলে সূর্যাস্ত আর সূর্যোদয় কেন হয় বাবা? বিজ্ঞান কি বলে?'
আমি বললাম, - 'স্যার, সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরে।সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরার সময়, পৃথিবী গোলার্ধের যে অংশটা সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে, সে অংশে তখন সূর্যোদয় হয়, দিন থাকে। ঠিক একইভাবে, পৃথিবী গোলার্ধের যে অংশটা তখন সূর্যের বীপরিত দিকে মুখ করে থাকে, তাতে তখন সূর্যাস্ত হয়, রাত নামে।আদতে, সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয় বলে কিছু নেই।সূর্য অস্তও যায় না। উদিতও হয়না। পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারনে আমাদের এমনটি মনে হয়।'
স্যার বললেন,- 'বাহ! সুন্দর ব্যাখ্যা।'
উনি আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন,- 'তা বাবা, এই ব্যাপারটার উপর তোমার আস্থা আছে তো? সূর্য পানিতে ডুবে-টুবে যাওয়া তে বিশ্বাস-টিশ্বাস করো কি?'
পুরো ক্লাশে তখনও পিনপতন নিরবতা।
আমি বললাম,- 'না স্যার। সূর্যের পানিতে ডুবে যাওয়া-টাওয়া তে আমি বিশ্বাস করিনা।'
এরপর স্যার বললেন,- 'বেশ! তাহলে ধরে নিলাম, আজ থেকে তুমি আর কোরআনে বিশ্বাস করো না।'

স্যারের কথা শুনে আমি খানিকটা অবাক হলাম।পুরো ক্লাশও সম্ভবত আমার মতোই হতবাক।স্যার মুচকি হেসে বললেন,- 'তোমাদের ধর্মীয় কিতাব, যেটাকে আবার বিজ্ঞানময় বলে দাবি করো তোমরা, সেই কোরআনে আছে, সূর্য নাকি পানিতে ডুবে যায়। হা হা হা।'
আমি স্যারের মুখের দিকে চেয়ে আছি। স্যার বললেন, - 'কি বিশ্বাস হচ্ছে না তো? দাঁড়াও, পড়ে শোনাই।'
এইটুক বলে স্যার কোরআনের সূরা কাহাফের ৮৬ নাম্বার আয়াতটি পড়ে শোনালেন-

'(চলতে চলতে) এমনিভাবে তিনি (জুলকারনাঈন) সূর্যের অস্তগমনের জায়গায় গিয়ে পৌঁছুলেন, সেখানে গিয়ে তিনি সূর্যকে (সাগরের) কালো পানিতে ডুবে যেতে দেখলেন।তার পাশে তিনি একটি জাতিকেও (বাস করতে) দেখলেন, আমি বললাম, হে জুলকারনাঈন! (এরা আপনার অধীনস্ত),আপনি
ইচ্ছা করলে (তাদের) শাস্তি দিতে পারেন, অথবা তাদের আপনি সদয়ভাবেও গ্রহণ করতে পারেন।'

এরপর বললেন,- 'দেখো, তোমাদের বিজ্ঞানময় ধর্মীয় কিতাব বলছে যে, সূর্য নাকি সাগরের কালো পানিতে ডুবে যায়। হা হা হা। বিজ্ঞানময় কিতাব বলে কথা।'
ক্লাশের কেউ কেউ, যারা স্যারের মতোই নাস্তিক, তারা হো হো করে হেসে উঠলো। আমি কিছুই বললাম না।চুপ করে ছিলাম।'
-
এইটুকুই লেখা। আশ্চর্য! সাজিদ মফিজুর রহমান নামের এই ভদ্রলোকের কথার কোন প্রতিবাদ করলো না? সে তো এরকম করে না সাধারণত। তাহলে কি.......? আমার মনে নানা ধরনের প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিতে লাগলো সেদিন।
-
এর চারমাস পরের কথা।
হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় সাজিদ আমাকে এসে বললো,- 'আগামিকাল ডিপার্টমেণ্ট থেকে ট্যুরে যাচ্ছি। তুইও সাথে যাচ্ছিস।'
আমি বললাম, - 'আমি? পাগল নাকি? তোদের ডিপার্টমেন্ট ট্যুরে আমি কিভাবে যাবো?'
- 'সে ভাবনাটা আমার। তুকে যা বললাম, জাষ্ট তা শুনে যা।'
পরদিন সকাল বেলা বেরুলাম।তার ফ্রেন্ডদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলো সাজিদ।স্যারেরাও আছেন। মফিজুর রহমান নামের ভদ্রলোকটির সাথেও দেখা হলো। বিরাট গোঁফওয়ালা। এই লোকের পূর্বপুরুষ সম্ভবত ব্রিটিশদের পিয়নের কাজ করতো।
যাহোক, আমরা যাচ্ছি বরিশালের কুয়াকাটা।
পৌঁছাতে পাক্কা চারঘণ্টা লাগলো।
সারাদিন অনেক ঘুরাঘুরি করলাম। স্যারগুলোকে বেশ বন্ধুবৎসল মনে হলো।
ঘড়িতে সময় তখন পাঁচটা বেজে পঁচিশ মিনিট। আমরা সমুদ্রের কাছাকাছি হোটেলে আছি।আমাদের সাথে মফিজুর রহমান স্যারও আছেন।
তিনি সবার উদ্দেশ্যে বললেন,- 'গাইজ, বি রেডি! আমরা এখন কুয়াকাটার বিখ্যাত সূর্যাস্ত দেখবো।তোমরা নিশ্চয় জানো, এটি দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র সমুদ্র সৈকত, যেখান থেকে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দুটোই দেখা যায়।'
আমরা সবাই প্রস্তুত ছিলাম আগে থেকেই। বেরুতে যাবো, ঠিক তখনি সাজিদ বলে বসলো,- 'স্যার, আপনি সূর্যাস্ত দেখবেন?'
স্যার বললেন,- 'Why not! How can I miss such an amazing moment?'
সাজিদ বললো,- 'স্যার, আপনি বিজ্ঞানের মানুষ হয়ে খুব অবৈজ্ঞানিক কথা বলছেন। এমন একটি জিনিস আপনি কি করে দেখবেন বলছেন, যেটা আদতে ঘটেই না।'
এবার আমরা সবাই অবাক হলাম।যে যার চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। সাজিদ দাঁড়িয়ে আছে।
স্যার কপালের ভাঁজ দীর্ঘ করে বললেন,- 'What do u want to mean?'

সাজিদ হাসলো। হেসে বললো,- 'স্যার, খুবই সোজা। আপনি বলছেন, আপনি আমাদের নিয়ে সূর্যাস্ত দেখবেন। কিন্তু স্যার দেখুন, বিজ্ঞান বুঝে এমন লোক মাত্রই জানে, সূর্য আসলে অস্ত যায়না। পৃথিবী গোলার্ধের যে অংশ সূর্যের বীপরিত মুখে অবস্থান করতে শুরু করে, সে অংশটা আস্তে আস্তে অন্ধকারে ছেঁয়ে যায় কেবল। কিন্তু সূর্য তার কক্ষপথেই থাকে।উঠেও না, ডুবেও না। তাহলে স্যার, সূর্যাস্ত কথাটা তো ভুল, তাই না?'
এবার আমি বুঝে গেছি আসল ব্যাপার। মজা নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি।
মফিজুর রহমান নামের লোকটা একরাশ বিরক্তি নিয়ে বললো,- 'দেখো সাজিদ, সূর্য যে উদিত হয়না আর অস্ত যায়না, তা আমি জানি। কিন্তু, এখান থেকে দাঁড়ালে আমাদের কি মনে হয়? মনে হয়, সূর্যটা যেন আস্তে আস্তে পানির নিচে ডুবে যাচ্ছে।এটাই আমাদের চর্মচক্ষুর সাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। তাই, আমরা এটাকে সিম্পলি, 'সূর্যাস্ত' নাম দিয়েছি।বলার সুবিধের জন্যও এটাকে 'সূর্যাস্ত' বলাটা যুক্তিযুক্ত। দেখো, যদি আমি বলতাম,- 'ছেলেরা, একটুপর পৃথিবী গোলার্ধের যে অংশে বাংলাদেশের অবস্থান, সে অংশটা সূর্যের ঠিক বীপরিত দিকে মুখ নিতে চলেছে। তারমানে, এখানে এক্ষুনি আঁধার ঘনিয়ে সন্ধ্যা নামবে।আমাদের সামনে থেকে সূর্যটা লুকিয়ে যাবে।চলো, আমরা সেই দৃশ্যটা অবলোকন করে আসি',
আমি যদি এরকম বলতাম, ব্যাপারটা ঠিক বিদঘুটে শোনাতো। ভাষা তার মাধুর্যতা হারাতো।শ্রুতিমধুরতা হারাতো। এখন আমি এক শব্দেই বুঝিয়ে দিতে পারছি আমি কি বলতে চাচ্ছি, সেটা।'
সাজিদ মুচকি হাসলো। সে বললো,- 'স্যার, আপনি একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। বিজ্ঞান পড়েন, বিজ্ঞান পড়ান। আপনি আপনার সাধারন চর্মচক্ষু দিয়ে দেখতে পান যে- সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে পানির নিচে। এই ব্যাপারটাকে আপনি সুন্দর করে বোঝানোর জন্য যদি 'সূর্যাস্ত' নাম দিতে পারেন, তাহলে সূরা কাহাফে জুলকারনাঈন নামের লোকটি এরকম একটি সাগর পাড়ে এসে যখন দেখলো- সূর্যটা পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে, সেই ঘটনাকে যদি আল্লাহ তা'য়ালা সবাইকে সহজে বুঝানোর জন্য, সহজবোধ্য করার জন্য, ভাষার শ্রুতিমধুরতা ধরে রাখার জন্য, কুলি থেকে মজুর, মাঝি থেকে কাজি, ব্লগার থেকে বিজ্ঞানি,ডাক্তার থেকে ইঞ্জিনিয়ার, ছাত্র থেকে শিক্ষক, সবাইকে সহজে বুঝানোর জন্য যদি বলেন- '
'(চলতে চলতে) এমনিভাবে তিনি (জুলকারনাঈন) যখন সূর্যের অস্তগমনের জায়গায় গিয়ে পৌঁছুলেন, সেখানে গিয়ে তিনি সূর্যকে (সাগরের) কালো পানিতে ডুবে যেতে দেখলেন',
তখন কেন স্যার ব্যাপারটা অবৈজ্ঞানিক হবে? কোরান বলেনা যে, সূর্য পানির নিচে ডুবে গেছে। কোরান এখানে ঠিক সেটাই বলেছে, যেটা জুলকারনাঈন দেখেছে, এবং বুঝেছে। আপনি আমাদের সূর্যাস্ত দেখাবেন বলছেন মানে এই না যে- আপনি বলতে চাচ্ছেন সূর্যটা আসলেই ডুবে যায়।আপনি সেটাই বোঝাতে চাচ্ছেন, যেটা আমরা বাহ্যিকভাবে দেখি।তাহলে, একই ব্যাপার আপনি পারলে, কোরান কেন পারবে না স্যার?
আপনারা কথায় কথায় বলেন,- 'The Sun rises in the east & sets in the west' এগুলা নাকি Universal Truth..
কিভাবে এগুলো চিরন্তন সত্য হয় স্যার, যেখানে সূর্যের সাথে উঠা-ডুবার কোন সম্পর্কই নাই?
কিন্তু এগুলো আপনাদের কাছে অবৈজ্ঞানিক নয়। আপনারা কথায় কথায় সূর্যোদয়, সূর্যাস্তের কথা বলেন। অথচ, সেইম কথা কোরান বললেই আপনারা চিৎকার করে বলে উঠেন- কোরান অবৈজ্ঞানিক। কেন স্যার?'

সাজিদ একনাগাড়ে এতসব কথা বলে গেলো। স্যারের মুখটা কিছুটা পানসে দেখা গেলো। তিনি বললেন,- 'দীর্ঘ চারমাস ধরে, এরকম সুযোগের অপেক্ষা করছিলে তুমি, মি. আইনষ্টাইন?'
আমরা সবাই হেসে দিলাম।
সাজিদও মুচকি হাসলো। বড় অদ্ভুত সে হাসি।।

পদ্মার বুক চিরে আমাদের লঞ্চ চলছে।
দু'পাশ থেকে শুনতে পাচ্ছি পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ।সাধারণত, লঞ্চগুলোর মাথার উপর বিশাল সাইজের একটি ছাউনি থাকে।কিন্তু আমাদের লঞ্চটির উপরিভাগ খালি। কোন ছাউনি নেই।
আকাশটা একদম উদোম। উপরে তারা-নক্ষত্র ভর্তি সুবিশাল আকাশ, নিচে আছে স্রোতস্বিনী পদ্মা।
চাঁদের প্রতিফলিত আলোতে নদীর পানি ঝিকমিক ঝিকমিক করছে। সে এক অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য!

আমরা যাচ্ছি রসুলপুর গ্রামে। বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার প্রত্যন্ত একটি গ্রাম।
সাজিদের অনুরোধ, এবারের কোরবানির ঈদটা তার সাথে তাদের বাড়িতে করতে হবে। তাই যাওয়া।
তাছাড়া, যখন শুনলাম পদ্মা-মেঘনার সঙ্গমস্থল এর উপর দিয়ে যাওয়া হবে, তখন আর লোভ সামলানো গেলো না। আমি এর আগে কখনো এই নদীদুটোকে স্বচক্ষে দেখিনি। তাই বিনা অজুহাতে তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম।

লঞ্চে আমরা তিনজন মাত্র মানুষ। আমি, সাজিদ এবং একজন লঞ্চ চালক। মধ্যবয়স্ক এই লোকটার নাম মহব্বত আলি। যারা নৌকা চালায় তাদের মাঝি বলা হয়। যারা জাহাজ চালায় তাদের বলে নাবিক। যারা লঞ্চ চালায় তাদের কি বলে? আমি জানি না।
মহব্বত আলি নামের এই লোক লঞ্চের এক মাথায় জড়োসড়ো হয়ে বসে বসে ঝিমুচ্ছে। মাঝিদের মতো তার বৈঠা চালানোর চিন্তা নেই। তেলের ইঞ্জিন।
আমি আর সাজিদ লঞ্চের একেবারে মাঝখানে বসে আছি। একটি চাদর পাতা হয়েছে।সাথে আছে পানির বোতল, চিনা বাদাম, ভাজা মুড়ি।
মাথার উপরে আকাশ।
হঠাৎ করে আমার তখন মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসটির কথা মনে পড়ে গেলো।আমি সাজিদকে প্রশ্ন করলাম,- 'তুই কি মানিক দার 'পদ্মা নদীর মাঝি' পড়েছিস?'
সাজিদ বললো,- 'হু'।
আমিও কতোবার পড়েছি এই উপন্যাস। সব চরিত্রগুলোর নাম আমার ঠিক মনে নেই।তবে, উপন্যাসের নায়কের বউটা ল্যাঙরা ছিলো এবং নায়কের সাথে তার শ্যালিকার প্রেম ছিলো, এই ঘটনাগুলো আবছা আবছা মনে করতে পারি।
সাজিদ আমাকে বললো,- 'হঠাৎ উপন্যাসে চলে গেলি কেন?'
- 'না, এমনি।'
এইটুক বলে দু'জনে খানিক্ষন চুপচাপ ছিলাম।এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম,- 'আচ্ছা, অই উপন্যাসের কোন চরিত্রটি তোর কাছে সবচে ইণ্টারেষ্টিং লেগেছে?'
আমি ভাবলাম, সাজিদ হয় উপন্যাসের নায়ক কিংবা নায়কের শ্যালিকার কথাই বলবে।কিন্তু সাজিদ বললো,- ' অই উপন্যাসে ইণ্টারেষ্টিং ক্যারেক্টার আছে কেবল একটিই। সেটি হলো হোসেন মিয়া।'
আমি খানিকটা অবাক হলাম। অবাক হলাম কারন, সাজিদ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে এক সেকেন্ডও ভাবেনি। কতো আগে পড়া একটি উপন্যাস থেকে সে এমন একটি ক্যারেক্টারের নাম বলেছে, যেটি উপন্যাসটির কোন মূল চরিত্রের মধ্যেই পড়েনা।হোসেন মিয়া নামে এই উপন্যাসে কোন চরিত্র আছে, সেটিই আমি ভুলে গিয়েছিলাম।
আমি জিজ্ঞেস করলাম,- 'হোসেন মিয়া? নায়কটা নয় কেন?'
সাজিদ বললো,- 'কুবের মাঝির মতো কতো শতো মাঝি পদ্মাপাড়ে অহরহ দেখা যায়, যাদের ঘরে মালার মতো একটি খোঁড়া পা ওয়ালা, কিংবা অন্ধ স্ত্রী আছে, আছে তিন চারটে করে পেটুক সন্তান।আছে কপিলার মতো সুন্দরি শ্যালিকা।তাদের মাঝেও পরকীয়া আছে, দৈহিক সম্পর্ক আছে। কিন্তু হোসেন মিয়া? হোসেন মিয়ার মতো কোন চরিত্র আছে এই পদ্মাপাড়ে? যে কিনা নিজের মতো করে একটি দ্বীপ সাজিয়ে তুলে, সেখানে মানুষজনকে বিনা পয়সায় থাকতে দেয়? আছে? কি বাস্তবে, কি সাহিত্যে...............'

আমি আরো একবার সাজিদের সাহিত্য জ্ঞান দেখে বিমুগ্ধ হলাম। সে এমনভাবে চরিত্রগুলোর নামধাম বলে গেলো, যেন সে এইমাত্র উপন্যাসটি পড়ে শেষ করেছে।

আমরা রসুলপুরে পৌঁছাই ভোর সাড়ে চার'টে তে। তখন কিছু কিছু জায়গায় ফজরের আজান পড়ছে।যেখানে নেমেছি, সেখান থেকে বেশকিছু পথ হাঁটতে হবে।
খানিকটা হেঁটে একটা মাটির ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। বুঝতে পারলাম, এটা মসজিদ।ভেতরে একটি কুপি বাতি মিটমিট করে জ্বলছে।
ব্যাগপত্র রেখে দু'জনে ওজূ করে নিলাম। মসজিদে মানুষও আমরা তিনজন। আজব! তিন সংখ্যাটা দেখি একদম পিঁছু ছাড়ছেনা।লঞ্চেও ছিলাম তিনজন। মসজিদে এসেও দেখি আমরা তিনজন।
নামাজ শেষ হয়েছে একটু আগে। আমরা বসে আছি মসজিদের বারান্দায়।আরেকটু আলো ফুঁটলে বেরিয়ে পড়বো। ঈমাম সাহেব আমাদের পাশে বসে কোরআন তিলাওয়াত করছেন। মাঝারি বয়স। দাঁড়িতে মেহেদি লাগিয়েছেন বলে দাঁড়িগুলো লালচে দেখাচ্ছে। উনি সূরা আর রহমান তিলাওয়াত করছেন। 'ফাবি আইয়্যি আলা-য়্যি রাব্বিকুমা তুকাযযিবান' অংশটিতে এসে খুব সুন্দর করে টান দিচ্ছেন। পরান জুড়ানিয়া।
আর রাহমান তিলাওয়াত করে উনি কোরআন শরীফ বন্ধ করলেন। বন্ধ করে কোরআন শরীফে দুটি চুমু খেলেন।এরপর সেটাকে একবার কপালে আর একবার বুকে লাগিয়ে একটি কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে একটা কাঠের তাকে তুলে রাখলেন।
আমরা লোকটার দিকে তাকিয়ে আছি। লোকটা আমাদের দিকে ফিরে বললেন,- "আমনেরা কি শহর হইতে আইছেন?"
সাজিদ বললো,- 'জ্বি।'
-"আমনেরা কি লেহাপড়া করেন?"
সাজিদ আবার বললো,- 'জ্বি।'
-"মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ। আমনেরা শহরে পইড়্যাও বিগড়াইয়া যান নাই। শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।"
লোকটার কথা আমি ঠিক বুঝিনি। সাজিদ বুঝেছে। সে জিজ্ঞেস করলো,- 'চাচা, শহরে পড়াশুনা করলে বিগড়িয়ে যায়, আপনাকে কে বললো?'
লোকটা হঠাৎ গম্ভীরমুখ করে বললেন,- 'হেইয়া আবার কেডায় কইবে বাপ! মোর ঘরেই তো জন্মাইছে একখান সাক্ষাৎ ইবলিশ।'
- 'কি রকম?'- সাজিদের প্রশ্ন।
- 'মোর এুক্কয়াই পোলা। পড়ালেহা করতে পাডাইল্যাম ঢাকার শহরে। হেইনে যাইয়া কি যে পড়ালেহা করসে! এহন কয়, আল্লা-বিল্লা কইয়া বোলে কিস্যু নাই। এই যে, এহন তো বাড়ি আইছে। আইয়া কইতেয়াছে কি বোঝঝেন, কয় বোলে কোরবানি দিয়া মোরা ধর্মের নামে পশুহত্যা হরি। এইগুলা বোলে ধর্মের নাম ভাইঙ্গা খাওনের ধান্দা হরি মোরা। কিরপিক্যা যে এইডারে ঢাকায় পড়তে পাডাইল্যাম বাপ! হালুডি হরাইলে আইজ এই দিন দেহা লাগতে না!"
লোকটার সব কথা আমি বুঝতে পারিনি। তবে, এইটুকু বুঝেছি যে, লোকটার ছেলে ঢাকায় পড়ালেখা করতে এসে নাস্তিক হয়ে গেছে।
সাজিদ বললো,- 'আপনার ছেলে এখন বাড়িতে আছে?'
- 'হ'
সাজিদ আমার দিকে ফিরে বললো, - 'দেখেছিস, মেঘনার এতো বড় বুকেও কিন্তু নাস্তিকদের বসবাস আছে। হা হা হা।'

সিদ্ধান্ত হলো ছেলেটার সাথে দেখা করে যাবো।
সকাল ন'টায় ছেলেটার সাথে আমাদের দেখা হলো।বয়সে আমাদের চেয়ে ছোট হবে। জিজ্ঞেস করে জানলাম, ছেলেটা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিষয় নিয়ে পড়ছে। ফাষ্ট ইয়ারে। নাম- মোঃ রফিক।
সাজিদ রফিক নামের ছেলেটার কাছে জিজ্ঞেস করলো,- 'কোরবানি নিয়ে তোমার প্রশ্ন কি?'

ছেলেটা বললো,- 'এইটা একটা কু-প্রথা। এভাবে পশু হত্যা করে উৎসব করার কোন মানে হয়?'

সাজিদ বললো,- 'তুমি কি বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু জানো?'

ছেলেটি চোখ বড় বড় করে বললো,- 'আপনি কি আমাকে বিজ্ঞান শিখাচ্ছেন নাকি? ইণ্টারমিডিয়েট লেভেল পর্যন্ত আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম।'

সাজিদ বললো,- 'তা বেশ। খাদ্যশৃঙখল সম্পর্কে নিশ্চই জানো?'

- 'জানি। জানবো না কেন?'

- 'খাদ্যশৃঙখল হলো, প্রকৃতিতে উদ্ভিদ আর প্রাণীর মধ্যকার একটি খাদ্যজাল। যেসব উদ্ভিদ সূর্যের আলো ব্যবহার করে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করে নেয়, তাদের বলা হয় উৎপাদক। এই উৎপাদককে বা সবুজ উদ্ভিদকে যারা খায়, তারা হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর খাদক.......'

ছেলেটা বললো,- 'মশাই, এসব আমি জানি। আপনার আসল কথা বলুন।'

ছেলেটার কথার মধ্যে কোনরকম আঞ্চলিকতার টান নেই।তাই বুঝতে অসুবিধে হচ্ছেনা।

পাশ থেকে ছেলেটার বাবা বলে উঠলেন,- 'এ, হেরা বয়সে কোলং তোর চাইয়া বড় অইবে! মান-ইজ্জত দিয়া কথা কইতে পারোনা?'

ছেলেটা তার বাবার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। সে দৃষ্টিতে পড়াশুনা জানা ছেলের মূর্খ বাবার প্রতি অবজ্ঞার ছাপ স্পষ্ট।

সাজিদ বললো,- 'বেশ। তোমাদের গরু আছে?'

- 'আছে।'

- কয়টা?'

ছেলেটার বাবা বললেন,- 'হ বাপ, মোগো গরু আছে পাঁচখান। দুইডা গাই, এক্কুয়া ষাঁড় গরু। লগে আবার বাছুরও আছে দুইডা!

- 'আচ্ছা রফিক, ধরো- তোমাদের যে দুটি গাভি আছে, তারা এইবছর দুটি করে বাচ্চা দিলো। তাহলে তোমাদের মোট গরুর সংখ্যা হবে ৯ টি।ধরো, তোমরা পশু হত্যায় বিশ্বাসী নও।তাই, তোমরা গরুগুলো বিক্রিও করো না। কারন, তোমরা জানো, বিক্রি হলেই গরুগুলো কোথাও না কোথাও কোরবানি হবেই।ধরো, এরপরের বছর গরুগুলো আরো দুটি করে বাচ্চা দিলো।মোট গরু তখন ১৩ টি। এরপরের বছর দেখা গেলো, বাচুরগুলোর মধ্য থেকে দুটি গাভি হয়ে উঠলো, যারা বাচ্চা দিবে।এখন মোট গাভির সংখ্যা ৪ টি। ধরো, ৪ টি গাভিই এরপরের বছর আরো দুটি করে বাচ্চা দিলো।তাহলে, সে বছর তোমাদের মোট গরুর সংখ্যা কতো দাঁড়ালো?'

ছেলেটির বাবা আঙুলে হিসাব কষে বললেন,- 'হ, ১৯টা অইবে!'

সাজিদ বললো,- 'বলোতো রফিক, ১৯ টা গরু রাখার মতো জায়গা তোমাদের আছে কিনা? ১৯ টা গরুকে খাওয়ানোর মতো সামর্থ্য, পর্যাপ্ত ভূষি, খৈল, ঘাস আছে কিনা তোমাদের?'

- 'না'- ছেলেটা বললো।

- 'তাহলে, আল্টিমেইটলি তোমাদের কিছু গরু বিক্রি করে দিতে হবে। এদের যারা কিনবে তারা তো গরু কিনে গুদামে ভরবে না, তাই না? তারা গরুগুলোকে জবাই করে মাংশ বিক্রি করবে। গরুর মাংশ আমিষের চাহিদা পূরণ করবে,আর চামড়াগুলো শিল্পের কাজে লাগবে, তাই না?'

- 'হুম'

- 'এটা হলো প্রকৃতির ব্যালেন্স। তাহলে,প্রকৃতির ব্যালেন্স ঠিক রাখার জন্য পশুগুলোকে জবাই করতেই হচ্ছে।সেটা এমনি হোক, অথবা কোরবানে।'

ছেলেটা বললো,- 'সেটা নিয়ে তো আপত্তি নেই।আপত্তি হচ্ছে, এটাকে ঘিরে উৎসব হবে কেন?'

সাজিদ বললো,- 'বেশ! উৎসব বলতে তুমি হয়তো মিন করছো, যেখানে নাচ-গান হয়, ফূর্তি হয়, আড্ডা,ড্রিংকস হয়। মিছিল হয়, শোভাযাত্রা হয়, তাই না? কিন্তু দেখো, মুসলমানদের এই উৎসব সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে নাচ-গান নেই,আড্ডা-মাস্তি নেই।ড্রিংক'স নেই, মিছিল-শোভাযাত্রা নেই।আছে ত্যাগ আর তাকওয়ার পরীক্ষা।আছে, অসহায়দের মুখে হাসি ফোটানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা-তদবির।সমাজ থেকে শ্রেণী বৈষম্য দূর করে, ধনী-গরীব সবার সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়। এরকম উৎসবে সম্ভবত কার্ল মার্ক্সেরও দ্বিমত থাকার কথা না। কার্ল মার্ক্স কে চিনো?'

ছেলেটা এরপর কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলো।তারপর বললো,- 'আরজ আলি মাতুব্বরকে চিনেন আপনি?'
সাজিদ বললো,- 'হ্যাঁ, চিনি তো।'
- 'কোরবানি নিয়ে উনার কিছু যৌক্তিক প্রশ্ন আছে।'
- 'কি প্রশ্ন, বলো?'
ছেলেটা প্রথম প্রশ্নটি বললো। সেটি ছিলো-

'আল্লাহ ইব্রাহীমের কাছে তার সবচাইতে প্রিয় বস্তুর উৎসর্গের আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু, ইব্রাহীমের কাছে সবচাইতে প্রিয় বস্তু তার ছেলে ইসমাঈল না হয়ে তার নিজ প্রান কেন হলো না?'

সাজিদ মুচকি হেসে বললো,- 'খুবই লজিক্যাল প্রশ্ন বটে।
আমি যদি আরজ আলি মাতুব্বরের সাক্ষাৎ পেতাম, তাহলে জিজ্ঞেস করতাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে, তাদের কাছে তাদের নিজের প্রাণের চেয়ে দেশটা কেন বেশি প্রিয় হলো? কেন দেশ রক্ষার জন্য নিজেদের প্রাণটাকে মৃত্যুর মুখে ছেড়ে দিলো?
দুটো জিনিসই সেইম ব্যাপার। ইব্রাহিমের কাছে নিজের চেয়েও প্রিয় ছিলো পুত্রের প্রাণ, আর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে নিজের চেয়ে প্রিয় ছিলো নিজের মাতৃভূমি।
কিন্তু, পরীক্ষার ধরন ছিলো আলাদা। ইব্রাহিমকে বলা হলো, প্রিয় জিনিস কুরবানি করতে, আর মুক্তিযোদ্ধাদের বলা হলো- প্রিয় জিনিস রক্ষা করতে।কিন্তু, আমরা দেখতে পেলাম - দু দলের কারো কাছেই প্রিয় বস্তু নিজের প্রাণ নয়।
সুতরাং, আরজ আলি মাতুব্বরের মাতব্বরিটা এইখানে ভুল প্রমানিত হলো।'

ছেলেটা কাঁচুমাচু করে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলো।
আরজ আলি মাতুব্বর বলেছেন,- 'আল্লাহ পরীক্ষাটা করেছেন ইব্রাহিমকে।ইব্রাহিমের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেই পরীক্ষাটা কেন তার অনুসারীদের দিতে হবে?'

সাজিদ বললো,- 'এইটাও খুব ভালো প্রশ্ন। আমরা মুহাম্মদ সাঃ কে অনুসরন করি। তাহলে, আমরা কি বলতে পারি যে,- কই, আমাদের উপর তো জিব্রাঈল আঃ ওহী নিয়া কখনোই আসে নাই। তাহলে, মুহাম্মদের উপরে আসা ওহি আমরা কেন মানতে যাবো? বলো, প্রশ্নটা কি আমরা করতে পারি?'
ছেলেটা চুপ করে আছে। সাজিদ বললো,- 'আরজ আলি মাতুব্বরের Leader & Leadership বিষয়ে আদতে কোন জ্ঞানই ছিলো না। তাই তিনি এইরকম প্রশ্ন করে নিজেকে সক্রেটিস বানাতে চেয়েছিলেন।'
ছেলেটা তার তৃতীয় প্রশ্ন করলো-

'আরজ আলি মাতুব্বর বলেছেন,- নবী ইব্রাহিমকে তো কেবল পুত্র ইসমাঈলকে কোরবানি করা সংক্রান্ত পরীক্ষায়ই দিতে হয়নি, অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হবার মতো কঠিন পরীক্ষাও তাকে দিতে হয়েছিলো। তাহলে, মুসলমানরা ইব্রাহিমের স্মৃতি ধরে রাখতে পশু কোরবানি করলেও, ইব্রাহিমের আরেকটি পরীক্ষা মতে- মুসলমানরা নিজেদের অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে না কেন?'
আরজ আলি মাতুব্বরের আগের প্রশ্নগুলো আমার কাছে শিশুসুলভ মনে হলেও, এই প্রশ্নটিকে অনেক ম্যাচিউর মনে হলো। আসলেই তো। দুইটাই ইব্রাহীম আঃ এর জন্য পরীক্ষা ছিলো। তাহলে, একটি পরীক্ষার স্মৃতি ধরে রাখতে আমরা যদি পশু কোরবানি করি, তাহলে নিজেদের অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করি না কেন?
পদ্মা থেকে সাঁ সাঁ শব্দে বাতাস আসতে শুরু করেছে।
সাজিদ বললো,- 'রফিক, তার আগে তুমি আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি কি শেখ মুজিবকে ভালোবাসো? তার আদর্শকে?'
ছেলেটা বললো,- 'অবশ্যই। তিনি না হলে তো বাংলাদেশের অস্তিত্বই থাকতো না। তিনি আমাদের জাতির পিতা।'

- 'তুমি ঠিক বলেছো। শেখ মুজিব না হলে বাংলাদেশ হয়তো কোনদিন স্বাধীনই হতো না। সে যাহোক, শেখ মুজিবকে জীবনে দুটি বড় ধরনের পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছিলো।
প্রথমে, একটা দেশকে স্বাধীন করার লড়াইয়ে সামনে থেকে নের্তৃত্ব দেওয়া।
দ্বিতীয়ত, স্বপরিবারে খুন হওয়া। আমি কি ঠিক বললাম রফিক?'
- 'হু'
- 'এখন, তুমি শেখ মুজিবের আদর্শ বুকে ধারন করো। তুমি ৭১ এর চেতনায় নিজেকে বলিয়ান ভাবো। তুমি ৭ ই মার্চে বিশাল মিছিলে যোগদান করো। ১৬ ই ডিসেম্বরে সভা-সমাবেশে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বলে শ্লোগান দাও। কিন্তু, ১৫- ই আগষ্টে রাস্তায় বেরিয়ে কোনদিন বলেছো- হে মেজর ডালিমের বংশধর, হে খন্দকার মোস্তাকের বংশধর, তোমরা কে কোথায় আছো, এসো- আমাকেও মুজিবের মতো স্বপরিবারে খুন করো', বলো কি?'
আমি সাজিদের কথা শুনে হো হো হো করে হাসা শুরু করলাম। ছেলেটার মুখ তখন একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সাজিদ আবার বলতে শুরু করলো,- 'তুমি এটা বলো না।শেখ মুজিবের আদর্শ বুকে ধারন করে এরকম কেউই এটা বলেনা। যদি কেউ এরকম বলে, তাহলে তাকে মানুষে বলবে,- 'কি ব্যাপার? লোকটাকে কি ভাদ্র মাসের কুকুরে কামড়িয়েছে নাকি?'
সাজিদের কথা শুনে এবার রফিকের বাবাও হা হা হা করে হাসতে লাগলো। ছেলেকে পরাজিত হতে দেখে পৃথিবীর কোন বাবা এত খুশি হতে পারে, এই দৃশ্য না দেখলে বুঝতামই না।

আমরা রসুলপুরের পথে হাঁটা ধরলাম।পদ্মাপাড়ের জনবসতিগুলো দেখতে একেবারে ছবির মতো। নিজেকে তখন আমার হোসেন মিয়ার ময়না দ্বীপের বাসিন্দা মনে হচ্ছিলো। আর সাজিদ? তাকে আপনারা আপাতত হোসেন মিয়া রূপেই ভাবতে পারেন।

বিরাট আলিশান একটি বাড়ি। মোঘল আমলের সম্রাটেরা যেরকম বাড়ি বানাতো, অনেকটাই সেরকম। বাড়ির সামনে দৃষ্টিনন্দন একটি ফুলের বাগান। ফুলের বাগানের মাঝে ছোট ছোট কৃত্রিম ঝর্ণা আছে। এই বাড়ির মালিকের রুচিবোধের প্রশংসা করতেই হয়। ঝঞ্ঝাট ঢাকা শহরের মধ্যে এটি যেন এক টুকরো স্বর্গখন্ড।
কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হলো, বাগানের কোথাও লাল রঙের কোন ফুল নেই।এতবড় বাগানবাড়ি, অথচ, কোথাও একটি গোলাপের চারা পর্যন্ত নেই। বিস্ময়ের ব্যাপার তো বটেই।

আমরা এসেছি সাজিদের এক দূর সম্পর্কের খালুর বাসায়। ঢাকা শহরে বড় বড় ব্যবসা আছে।বিদেশেও নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়েছেন। ছেলে-মেয়েদের কেউ লন্ডন, কেউ কানাডা আর কেউ সুইজারল্যান্ড থাকে। ভদ্রলোক উনার স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকাতেই রয়ে গেছেন কেবল শিকড়ের টানে।
তবে, ঢাকায় নিজের বাড়িখানাকে যেভাবে তৈরি করেছেন, বোঝার উপায় নেই যে এটি ঢাকার কোন বাড়ি নাকি মস্কোর কোন ভি আই পি ভবন।
আমাকে এদিক-সেদিক তাকাতে দেখে সাজিদ প্রশ্ন করলো,- 'এভাবে চোরের মতো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিস কেন?'
আমি ভ্যাবাচেকা খাওয়ার মতো করে বললাম,- 'না, আসলে তোর খালুকে নিয়ে ভাবছি।'
- 'উনাকে নিয়ে ভাবার কি আছে?'
আমি বললাম,- 'অসুস্থ মানুষদের নিয়ে ভাবতে হয়।এটাও একপ্রকার মানবতা, বুঝলি?'
সাজিদ আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে বললো,- 'অসুস্থ মানে? কে অসুস্থ?'
- 'তোর খালু।'
- 'তোকে কে বললো উনি অসুস্থ?'
আমি দাঁড়ালাম। বললাম,- 'তুই এতকিছু খেয়াল করিস, এটা করিস নি?'
- 'কোনটা?
- 'তোর খালুর বাগানের কোথাও কিন্তু লাল রঙের কোন ফুলগাছ নেই। প্রায় সব রঙের ফুলগাছ আছে, লাল ছাড়া।এমনকি, গোলাপের একটি চারাও নেই।'
- 'তো?'
- 'তো আর কি? তিনি হয়তো কালার ব্লাইন্ড। স্পেশেফিকলি, রেড কালার ব্লাইন্ড।'
সাজিদ কিছু বললো না। হয়তো সে এটা নিয়ে আর কোন কথা বলতে চাচ্ছে না, অথবা, আমার যুক্তিতে সে হার মেনেছে।

সাজিদ কলিংবেল বাজালো।
ঘরের দরজা খুলে দিলো একটি তের-চৌদ্দ বছর বয়েসী ছেলে। সম্ভবত কাজের ছেলে।
আমরা ভেতরে ঢুকলাম। ছেলেটি বললো,- 'আপনারা এখানে বসুন।আমি কাকাকে ডেকে দিচ্ছি।'
ছেলেটা একদম শুদ্ধ বাংলায় কথা বলছে। বাড়ির মালিককে স্যার বা মালিক না বলে কাকা বলছে।সম্ভবত, উনার কোন গরীব আত্মীয়ের ছেলে হবে হয়তো। যাদের খুব বেশি টাকা-পয়সা হয়, তারা গ্রাম থেকে গরিব আত্মীয়দের বাসার কাজের চাকরি দিয়ে দয়া করে।
ছেলেটা ভদ্রলোককে ডাকার জন্য সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলো।ঘরের ভেতরটা আরো চমৎকার। নানান ধরনের দামি দামি মার্বেল পাথর দিয়ে দেওয়াল সাজানো।
দু'তলার কোন এক রুম থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের সুর ভেসে আসছে,- 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে......'
আমি সাজিদকে বললাম,- 'কি রে, তোর এরকম মোঘলাই ষ্টাইলের একটা খালু আছে, কোনদিন বললি না যে?'
সাজিদ রসকষহীন চেহারায় বললো,- 'মোঘলাই ষ্টাইলের খালু তো, তাই বলা হয়নি।'
- 'তোর খালুর নাম কি?'
- 'এম.এম. আলি।'

ভদ্রলোকের নামটাও উনার বাড়ির মতোই গাম্ভীর্যপূর্ণ। আমি জিজ্ঞেস করলাম,- 'এম. এম. আলি মানে কি?'
সাজিদ আমার দিকে তাকালো। বললো,- 'মোহাম্মদ মহব্বত আলি।'
ভদ্রলোকের বাড়ি আর ঐশ্বর্যের সাথে নামটা একদম যাচ্ছে না। এইজন্যে হয়তো মোহাম্মদ মহব্বত আলি নামটাকে শর্টকাট করে এম.এম. আলি করে নিয়েছেন।

ভদ্রলোক আমাদের সামনের সোপায় পায়ের উপর পা তুলে বসলেন। মধ্যবয়স্ক। চেহারায় বার্ধক্যের কোন ছাপ নেই। চুল পেকেছে, তবে কলপ করায় তা ভালোমতো বোঝা যাচ্ছে না।
তিনি বললেন,- 'তোমাদের মধ্যে সাজিদ কে?'
আমি লোকটার প্রশ্ন শুনে অবাক হলাম খুব। সাজিদের খালু, অথচ সাজিদকে চিনে না। এটা কি রকম কথা?
সাজিদ বললো,- 'জ্বি, আমি।'
- 'হুম, I guessed that'- লোকটা বললো। আরো বললো,- 'তোমার কথা বেশ শুনেছি, তাই তোমার সাথে আলাপ করার ইচ্ছে জাগলো।'
আমাদের কেউ কিছু বললাম না। চুপ করে আছি।
লোকটা আবার বললো,- 'প্রথমে আমার সম্পর্কে দরকারি কিছু কথা বলে নিই। আমার পরিচয় তো তুমি জানোই,সাজিদ। যেটা জানো না, সেটা হলো,- বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকে আমি একজন অবিশ্বাসী। খাঁটি বাংলায় নাস্তিক। হুমায়ুন আজাদকে তো চেনো, তাই না? আমরা একই ব্যাচের ছিলাম। আমি নাস্তিক হলেও আমার ছেলেমেয়েরা কেউই নাস্তিক নয়।সে যাহোক, এটা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।আমি ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী।'
সাজিদ বললো,- 'খালু, আমি এসব জানি।'
লোকটা অবাক হবার ভান করে বললো,- 'জানো? ভেরি গুড। ক্লেভার বয়।'
- 'খালু, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন তা বলুন।'
- 'ওয়েট! তাড়াহুড়ো কিসের?'- লোকটা বললো।
এরমধ্যেই কাজের ছেলেটা ট্রে তে করে চা নিয়ে এলো।
আমরা চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। লোকটাকে একটি আলাদা কাপে করে চা দেওয়া হলো। সেটা চা নাকি কফি, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।
লোকটি বললো,- 'সাজিদ, আমি মনে করি, তোমাদের ধর্মগ্রন্থ, আই মিন আল কোরান, সেটা কোন ঐশী গ্রন্থ নয়। এটা মুহাম্মদের নিজের লেখা একটি বই।মুহাম্মদ করেছে কি, এটাকে জাষ্ট স্রষ্টার বাণী বলে চালিয়ে দিয়েছে।'
এইটুকু বলে লোকটা আমাদের দু'জনের দিকে তাকালো। হয়তো বোঝার চেষ্টা করলো আমাদের রিএ্যাকশান কি হয়।
আমরা কিছু বলার আগেই লোকটি আবার বললো, - 'হয়তো বলবে, মুহাম্মদ লিখতে-পড়তে জানতো না। সে কিভাবে এরকম একটি গ্রন্থ লিখবে? ওয়েল! এটি খুবই লেইম লজিক। মুহাম্মদ লিখতে পড়তে না জানলে কি হবে, তার ফলোয়ারদের অনেকে লিখতে-পড়তে পারতো।উচ্চ শিক্ষিত ছিলো। তারা করেছে কাজটা।মুহাম্মদের ইশারায়।'
সাজিদ তার কাপে শেষ চুমুক দিলো। তখনও সে চুপচাপ।
লোকটা বললো,- 'কিছু মনে না করলে আমি একটি সিগারেট ধরাতে পারি? অবশ্য, কাজটি ঠিক হবে না জানি।'
আমি বললাম,- 'শিওর!'
এতক্ষণ পরে লোকটি আমার দিকে ভালোমতো তাকালো। একটি মুচকি হাসি দিয়ে বললো,- 'Thank You...'

সাজিদ বললো,- 'খালু, আপনি খুবই লজিক্যাল কথা বলেছেন। কোরান মুহাম্মদ সাঃ এর নিজের বানানো হতেও পারে। কারন, কোরান যে ফেরেস্তা নিয়ে আসতো বলে দাবি করা হয়, সেই জিব্রাঈল আঃ কে মুহাম্মদ সাঃ ছাড়া কেউই কোনদিন দেখেনি।'
লোকটা বলে উঠলো,- 'এক্সাক্টলি, মাই সান।'
- 'তাহলে, কোরানকে আমরা টেষ্ট করতে পারি, কি বলেন খালু?'

- 'হ্যাঁ হ্যাঁ, করা যায়.......'
সাজিদ বললো,- 'কোরান মুহাম্মদ সাঃ এর বানানো কি না, তা বুঝতে হলে আমাদের ধরে নিতে হবে যে, মুহাম্মদ সাঃ স্রষ্টার কোন দূত নন।তিনি খুবই সাধারন, অশিক্ষিত একজন প্রাচীন মানুষ।'
লোকটা বললো,- 'সত্যিকার অর্থেই মুহাম্মদ অসাধারণ কোন লোক ছিলো না। স্রষ্টার দূত তো পুরোটাই ভূয়া।'
সাজিদ মুচকি হাসলো। বললো,- 'তাহলে এটাই ধরে নিই?'
- 'হুম'- লোকটার সম্মতি।
সাজিদ বলতে লাগলো,- 'খালু, ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, হজরত ঈউসুফ আঃ এর জন্ম হয়েছিলো বর্তমান ফিলিস্তিনে। ঈউসুফ আঃ ছিলেন হজরত ঈয়াকুব আঃ এর কনিষ্ঠতম পুত্র। ঈয়াকুব আঃ এর কাছে ঈউসুফ আঃ ছিলেন প্রাণাধিক প্রিয়।কিন্তু, ঈয়াকুব আঃ এর এই ভালোবাসা ঈউসুফ আঃ এর জন্য কাল হলো। তার ভাইয়েরা ষড়যন্ত্র করে ঈউসুফ আঃ কে কূপে নিক্ষেপ করে দেয়। এরপর, কিছু বণিকদল কূপ থেকে ঈউসুফ আঃ কে উদ্ধার করে তাকে মিশরে নিয়ে আসে। তিনি মিশরের রাজ পরিবারে বড় হন।ইতিহাস মতে, এটি ঘটে- খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকের আমেনহোটেপের রাজত্বকালের আরো তিন'শ বছর পূর্বে। খালু, এই বিষয়ে আপনার কোন দ্বিমত আছে?'
লোকটা বললো,- 'নাহ। কিন্তু, এগুলো দিয়ে তুমি কি বোঝাতে চাও?'
সাজিদ বললো,- 'খালু, ইতিহাস থেকে আমরা আরো জানতে পারি, খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে চতুর্থ আমেনহোটেপের আগে যেসকল শাসকেরা মিশরকে শাসন করেছে, তাদের সবাইকেই 'রাজা' বলে ডাকা হতো। কিন্তু, খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে চতুর্থ আমেনহোটেপের পরে যেসকল শাসকেরা মিশরকে শাসন করেছিলো, তাদের সবাইকে 'ফেরাউন' বলে ডাকা হতো। ঈউসুফ আঃ মিশরকে শাসন করেছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকের চতুর্থ আমেনহোটেপের আগে।আর, মূসা আঃ মিশরে জন্মলাভ করেছিলেন চতুর্থ আমেনহোটেপের কমপক্ষে আরো দু'শো বছর পরে।অর্থাৎ, মূসা আঃ যখন মিশরে জন্মগ্রহন করেন, তখন মিশরের শাসকদের আর 'রাজা' বলা হতো না, 'ফেরাউন' বলা হতো।'
- 'হুম, তো?'
- 'কিন্তু খালু, কোরানে ঈউসুফ আঃ এবং মূসা আঃ দুইজনের কথাই আছে। অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, কোরান ঈউসুফ আঃ এর বেলায় শাসকদের ক্ষেত্রে 'রাজা' শব্দ ব্যবহার করলেও, একই দেশের, মূসা আঃ এর সময়কার শাসকদের বেলায় ব্যবহার করেছে 'ফিরাউন' শব্দটি। বলুন তো খালু, মরুভূমির বালুতে উট চরানো বালক মুহাম্মদ সাঃ ইতিহাসের এই পাঠ কোথায় পেলেন? তিনি কিভাবে জানতেন যে, ঈউসুফ আঃ এর সময়ের শাসকদের 'রাজা' বলা হতো, মূসা আঃ সময়কার শাসকদের 'ফেরাউন'? এবং, ঠিক সেই মতো শব্দ ব্যবহার করে তাদের পরিচয় দেওয়া হলো?'
মহব্বত আলি নামের ভদ্রলোকটি হো হো হো করে হাসতে লাগলো। বললো,- 'মূসা আর ঈউসুফের কাহিনী তো বাইবেলেও ছিলো। মুহাম্মদ সেখান থেকে কপি করেছে, সিম্পল।'
সাজিদ মুচকি হেসে বললো,- 'খালু, ম্যাটার অফ সরো দ্যাট, বাইবেল এই জায়গায় চরম একটি ভুল করেছে। বাইবেল ঈউসুফ আঃ এবং মূসা আঃ দুজনের সময়কার শাসকদের জন্যই 'ফেরাউন' শব্দ ব্যবহার করেছে, যা ঐতিহাসিক ভুল। আপনি চাইলে আমি আপনাকে বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামেণ্ট থেকে প্রমান দেখাতে পারি।'
লোকটা কিছুই বললো না। চুপ করে আছে। সম্ভবত, উনার প্রমান দরকার হচ্ছে না।
সাজিদ বললো,- 'যে ভুল বাইবেল করেছে, সে ভুল অশিক্ষিত আরবের বালক মুহাম্মদ সাঃ এসে ঠিক করে দিলো, তা কিভাবে সম্ভব, যদি না তিনি কোন প্রেরিত দূত না হোন, আর, কোরান কোন ঐশি গ্রন্থ না হয়?'
লোকটি চুপ করে আছে। এরমধ্যেই তিনটি সিগারেট খেয়ে শেষ করেছে। নতুন আরেকটি ধরাতে ধরাতে বললো,- 'হুম, কিছুটা যৌক্তিক।'
সাজিদ আবার বলতে লাগলো,- 'খালু, কোরানে একটি সূরা আছে, সূরা আল ফাজর নামে। এই সূরার ৬ নম্বর আয়াতটি এরকম,- 'তোমরা কি লক্ষ্য করো নি, তোমাদের পালনকর্তা ইরাম গোত্রের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?'
এই সূরা ফাজরে মূলত আদ জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। আদ জাতির আলাপের মধ্যে হঠাৎ করে 'ইরাম' নামে একটি শব্দ চলে এলো, যা কেউই জানতো না এটা আসলে কি। কেউ কেউ বললো, এটা আদ জাতির কোন বীর

পালোয়ানের নাম, কেউ কেউ বললো, এই ইরাম হতে পারে আদ জাতির শারীরিক কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য, কারন, এই সূরায় আদ জাতির শক্তিমত্তা নিয়েও আয়াত আছে। মোদ্দাকথা, এই 'ইরাম' আসলে কি, সেটার সুস্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা কেউই দিতে পারেনি তখন। এমনকি, গোটা পৃথিবীর কোন ইতিহাসে 'ইরাম' নিয়ে কিছুই বলা ছিলো না। কিন্তু, ১৯৭৩ সালে, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি সিরিয়ায় মাটির নিচে একটি শহরের সন্ধান পায়।এই শহরটি ছিলো আদ জাতিদের শহর। সেই শহরে পাওয়া যায়, সুপ্রাচীন উঁচু উঁচু দালান। এমনকি, এই শহরে আবিষ্কার হয় তখনকার একটি লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরিতে একটি তালিকা পাওয়া যায়। এই তালিকায় তারা যেসকল শহরের সাথে বাণিজ্য করতো, সেসব শহরের নাম উল্লেখ ছিলো।আশ্চর্যজনক হলেও সত্য এই- সেই তালিকায় 'ইরাম' নামের একটি শহরের নামও পাওয়া যায়, যেটা আদ জাতিদেরই একটি শহর ছিলো। শহরটি ছিলো একটি পাহাড়ের মধ্যে। এতেও ছিলো সুউচ্চ দালান।

চিন্তা করুন, যে 'ইরাম' শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা এর পূর্বে তাফসিরকারকরাও করতে পারেনি। কেউ এটাকে বীরের নাম, কেউ এটাকে আদ জাতির শারিরীক বৈশিষ্ট্যের নাম বলে ব্যাখ্যা করেছে,

১৯৭৩ সালের আগে যে 'ইরাম' শহরের সন্ধান পৃথিবীর তাবৎ ইতিহাসে ছিলো না, কোন ভূগোলবিদ, ইতিহাসবিদই এই শহর সম্পর্কে কিছুই জানতো না, প্রায় ৪৩ শত বছর আগের আদ জাতিদের সেই শহরের নাম কিভাবে কোরান উল্লেখ করলো? যেটা আমরা জেনেছি ১৯৭৩ সালে, সেটা মুহাম্মদ সাঃ কিভাবে আরবের মরুভূমিতে বসে ১৪০০ বছর আগে জানলো? হাউ পসিবল? তিনি তো অশিক্ষিত ছিলেন।কোনদিন ইতিহাস বা ভূগোল পড়েন নি। কিভাবে জানলেন, খালু?'

আমি খেয়াল করলাম, লোকটার চেহারা থেকে মোঘলাই ভাবটা সরে যেতে শুরু করেছে। পুত্রতুল্য ছেলের কাছ থেকে তিনি এতোটা শক খাবেন, হয়তো আশা করেন নি।

সাজিদ আবার বলতে লাগলো,-

'খালু, আর রহমান নামে কোরানে একটি সূরা আছে। এই সূরার ৩৩ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে,-

'হে জ্বীন ও মানুষ! তোমরা যদি আসমান ও জমিনের সীমানায় প্রবেশ করতে পারো, তবে করো। যদিও তোমরা তা পারবেনা প্রবল শক্তি ছাড়া'

মজার ব্যাপার হলো, এই আয়াতটি মহাকাশ ভ্রমণ নিয়ে। চিন্তা করুন, আজ থেকে ১৪০০ বছর আগের আরবের লোক, যাদের কাছে যানবাহন বলতে কেবল ছিলো উট আর গাধা, ঠিক সেই সময়ে বসে মুহাম্মদ সাঃ মহাকাশ ভ্রমণ নিয়ে কথা বলছে, ভাবা যায়?

সে যাহোক, আয়াতটিতে বলা হলো,- 'যদি পারো আসমান ও জমিনের সীমানায় প্রবেশ করতে, তবে করো' ,

এটি একটি কন্ডিশনাল (শর্তবাচক) বাক্য। এই বাক্যে শর্ত দেওয়ার জন্য If (যদি) ব্যবহার করা হয়েছে।

খালু, আপনি যদি এ্যারাবিক ডিকশনারি দেখেন, তাহলে দেখবেন, আরবিতে 'যদি' শব্দের জন্য দুটি শব্দ আছে। একটি হলো 'লাও', অন্যটি হলো 'ইন'। দুটোর অর্থই 'যদি।' কিন্তু, এই দুটোর মধ্যে একটি সুক্ষ্ম পার্থক্য আছে। পার্থক্যটি হলো- আরবিতে শর্তবাচক বাক্যে 'লাও' তখনই ব্যবহার করা হয়, যখন সেই শর্ত কোনভাবেই পূরণ সম্ভব হবে না। কিন্তু, শর্তবাচক বাক্যে 'যদি' শব্দের জন্য যখন 'ইন' ব্যবহার করা হয়, তখন নিশ্চয় এই শর্তটা পূরণ সম্ভব।

আশ্চর্যজনক ব্যাপার, কোরানে সূরা আর রহমানের ৩৩ নম্বর আয়াতটিতে 'লাও' ব্যবহার না করে 'ইন' ব্যবহার করা হয়েছে। মানে, কোন একদিন জ্বীন এবং মানুষেরা মহাকাশ ভ্রমণে সফল হবেই।আজকে কি মানুষ মহাকাশ জয় করেনি? মানুষ চাঁদে যায়নি? মঙ্গলে যাচ্ছে না?

দেখুন, ১৪০০ বছর আগে যখন মানুষের ধারনা ছিলো একটি ষাঁড় তার দুই শিংয়ের মধ্যে পৃথিবীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক তখন কোরান ঘোষণা করছে, মহাকাশ ভ্রমণের কথা। সাথে বলেও দিচ্ছে, একদিন তা আমরা পারবো। আরবের নিরক্ষর মুহাম্মদ সাঃ কিভাবে এই কথা বলতে পারে?'

এম.এম. আলি ওরফে মোহাম্মদ মহব্বত আলি নামের এই ভদ্রলোকের চেহারা থেকে 'আমি নাস্তিক, আমি একেবারে নির্ভুল' টাইপ ভাবটা একেবারে উধাও হয়ে গেলো। এখন তাকে যুদ্ধাহত এক ক্লান্ত সৈনিকের মতোন দেখাচ্ছে।

সাজিদ বললো,- 'খালু, খুব অল্প পরিমাণ বললাম। এরকম আরো শ খানেক যুক্তি দিতে পারবো, যা দিয়ে প্রমান করে দেওয়া যায়, কোরান মুহাম্মদ সাঃ এর নকল করে লেখা কোন কিতাব নয়, এটি স্রষ্টার পক্ষ থেকে আসা একটি ঐশি গ্রন্থ। যদি বলেন, মুহাম্মদ সাঃ নিজের প্রভাব বিস্তারের জন্য এই কিতাব লিখেছে, আপনাকে বলতে হয়, এই কিতাবের জন্যই মুহাম্মদ সাঃ কে বরণ করতে হয়েছে অবর্ণনীয় কষ্ট, যন্ত্রণা। এই কিতাবের বাণী প্রচার করতে গিয়েই তিনি স্বদেশ ছাড়া হয়েছিলেন।তাকে বলা হয়েছিলো, তিনি যা প্রচার করছেন তা থেকে বিরত হলে তাকে মক্কার রাজত্ব দেওয়া হবে। তিনি তা গ্রহন করেন নি। খালু, নিজের ভালো তো পাগলও বুঝে। মুহাম্মদ সাঃ বুঝলো না কেন? এসবই কি প্রমান করেনা কোরানের ঐশি সত্যতা?'

লোকটা কোন কথাই বলছেনা। সিগারেটের প্যাকেটে আর কোন সিগারেট নেই।
আমরা উঠে দাঁড়ালাম। বের হতে যাবো, অমনি সাজিদ ঘাঁড় ফিরিয়ে লোকটাকে বললো, - 'খালু, একটি ছোট প্রশ্ন ছিলো।'
- 'বলো।'
- 'আপনার বাগানে লাল রঙের কোন ফুল গাছ নেই। কেন?'
লোকটি বললো,- 'আমি রেড কালার ব্লাইন্ড। লাল রঙ দেখি না।'
সাজিদ আমার দিকে ফিরলো। অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো,- 'জ্যোতিষী আরিফ আজাদ, ইউ আর কারেক্ট।

রিলেটিভিটির গল্প

বুধবার। মফিজুর রহমান স্যার পুরো একঘণ্টা ধরে আইনষ্টাইনের ‘থিওরি অফ রিলেটিভিটি’ বুঝালেন ক্লাশে। এই থিওরি কি, কখন আবিষ্কৃত হয়, কিভাবে কাজ করে এসব একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বোঝানোর পরে তিনি পুরো দুই গ্লাস পানি পান করলেন। পানি পান শেষে বললেন, ‘এখন আমি পরীক্ষা করবো কে কিরকম বুঝেছো।এখানে একজন একজন এসে বুঝিয়ে যাও।’

বুধবারে মফিজ স্যারের ক্লাশের এই এক জ্বালা। টানা একঘণ্টা ক্লাশ নেওয়ার পরে আরো টানা একঘণ্টা নিবেন সেটার প্রেজেন্টেশান। অনুপস্থিত থাকারও সুযোগ নেই। ডিপার্টেমেণ্টে এই একজনই আছেন যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এখনো বেঞ্চের উপরে তুলে দাঁড় করিয়ে রেখে ক্লাশ মিস করার শাস্তি দেন। কি বিদঘুটে ব্যাপার!

মফিজ স্যারের টানা একঘণ্টার লেকচার থেকে যে যতোটুকু গলাধঃকরণ করতে পেরেছে, সেটা একে একে সবাই আবার উগরে দিয়ে আসতে লাগলো।

কেউ ৫ মিনিট, কেউ ৭ মিনিট কেউবা ৮ মিনিট করে লেকচারটার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো।সবাই ‘থিওরি অফ রিলেটিভিটি’র বিভিন্ন দিক নিয়ে বলতে লাগলো।

সবার শেষে এলো সাজিদের পালা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাজিদকে চার-পাঁচ মিনিটের একটি লেকচার ঝেড়ে আসতে হবে এখন।

সাজিদ উঠে এলো। মফিজ স্যার উনার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে মুচকি হেসে বললেন, ‘সমাপ্তি পর্বে এবার মহামতি আইনষ্টাইনের কাছ থেকে আমরা সবচে চমকপ্রদ কিছু শুনবো। You may start Sir Mr. Einstein’….

মফিজ স্যারের বিদ্রুপাত্মক বাক্যব্যয় অন্যদের জন্য সবসময় হাসির খোরাক।ক্লাশের সবাই হো হো হো করে হেসে উঠলো। ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়, তাই সাজিদ এখন আর এসব গায়ে মাখে না।

সাজিদ হাসি হাসি মুখে শুরু করলো-

‘বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের ‘থিওরি অফ রিলেটিভিটি’ একদম পানির মতো সোজা। এটা এতোই সোজা যে, ক্লাশ এইটের একটা বাচ্চাও এটাকে খুব সহজে বুঝে নিতে পারে ‘

এতোটুকু শুনে সবাই সাজিদের দিকে বড় বড় চোখে হাঁ করে তাকালো। মফিজ স্যার চেয়ারে হেলান দেওয়া অবস্থাতে ছিলেন। সাজিদের কথা শুনে উনি একটু নড়েচড়ে বসলেন। উনার মোটা কালো ফ্রেমের চশমাটিকে ঠিকঠাক করে নিয়ে বললেন, ‘Come to the point…..’

সাজিদ বললো, ‘স্যার, আমি তো পয়েন্টেই আছি। আমি কি বলবো নাকি বসে পড়বো?’
‘No no, carry on’- মফিজ স্যারের প্রতিউত্তর।
সাজিদ আবার শুরু করলো-

‘এই সোজা থিওরিটিকেই একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের সবচে বড় আবিষ্কার এবং এর আবিষ্কারক মহামতি আইনষ্টাইনকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী মনে করা হয়।

এতোক্ষণ আমাদের সবার প্রিয়, শ্রদ্ধেয় মফিজুর রহমান স্যার আমাদের খুব সুন্দর করে বুঝালেন এই জিনিসটা। এরপর আমার বন্ধুরাও এই থিওরির নানান দিক খুব সুন্দর করে বর্ণনা করে গেলো।যেহেতু আমাকেও কিছু বলতে হবে, তাই আমি এই থিওরির সবচে মজার দিক, 'Time Dilation' নিয়েই বলবো। এই থিওরিটি 'সময়' নিয়ে আমাদের যেভাবে ভাবাতে পেরেছে, বিজ্ঞানের অন্য কোন আবিষ্কার তা পারে নি।

সময় নিয়ে আগেকার মানুষদের ধারনা ছিলো অন্যরকম। তারা ভাবতো, সময় সবখানে সমান। অর্থাৎ, আমার কাছে যেটা একঘণ্টা , সেটা অন্য কোন গ্রহের, অন্য কোন প্রাণীর কাছেও একঘণ্টা। আমার কাছে যেটা একদিন, সেটা অন্য সবার কাছেও একদিন।অর্থাৎ, মাত্রাভেদে সময়ের কোনই পরিবর্তন হয় না।

১৯০০ সাল পর্যন্ত সময় নিয়ে পৃথিবীর মানুষের ধারনা ছিলো এইরকম। ঊনিশ শো সালের কিছু আগে বিখ্যাত বিজ্ঞান লেখক এইচ.জি ওয়েলস সময় নিয়ে কিছু ব্যতিক্রম লেখাজোখা করেন। তিনি তাঁর কিছু সাইন্স ফিকশানে দেখান যে, তাঁর সৃষ্ট কিছু চরিত্র 'বর্তমান' কে পাশ কাটিয়ে ভবিষ্যতের সময়ে চলে যাচ্ছে।অতীতে চলে যাচ্ছে। এইচ.জি ওয়েলস তাঁর এই কথাগুলোকে সাইন্স ফিকশানে ঠাঁই দিলেও, তখনো মানুষের মনে প্রশ্ন ছিলো- 'সত্যিই কি মানুষ কোনদিন ভবিষ্যতে যেতে পারবে? অতীতে যেতে পারবে?'

আইনষ্টাইনের আগ পর্যন্ত এটা সাইন্স ফিকশানে থাকলেও, আইনষ্টাইন এসে প্রমাণ করে দেখালেন যে, 'হ্যাঁ, মানুষ চাইলেই ভবিষ্যত ভ্রমণ করতে পারে।'

কিন্তু কিভাবে? মজাটা এখানেই। আগেকারদিনে মানুষ ভাবতো, সময় সর্বস্থানে, সর্বাবস্থায়, সর্বমাত্রায় একই রকম। ওই যে একটু আগে বললাম, আমার কাছে যেটা একদিন, পৃথিবীর অন্য কোথাও বা অন্য কোন গ্রহে অন্য কারো কাছেও সেটা একদিন।

কিন্তু আইনষ্টাইন এসে বললেন, 'না, সময় ঠিক এরকম নয়। মাত্রাভেদে সময় পাল্টে যায়।'

কিন্তু কিভাবে? আইনষ্টাইন বলেছেন, 'কম গতিশীল কোন বস্তুতে সময় অধিক পরিমাণ দ্রুত চলে।আর, যে বস্তু অধিক গতিতে চলে, তার সময়ও তুলনামূলক কম গতিসম্পন্ন বস্তুর চেয়ে কম দ্রুত চলে। আর এটাকেই বলা হয় 'Time Dilation'..

অর্থাৎ, যে বস্তুর গতি কম, তার সময় চলবে দ্রুত।আর, যে বস্তুর গতি বেশি, তার সময় চলবে আস্তে। ব্যাপারটি কেমন জগাখিচুড়ি জগাখিচুড়ি মনে হচ্ছে, তাই না?

কিন্তু আইনষ্টাইন এটাকে ম্যাথম্যাটিক্যালি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।

ব্যাপারটিকে বোঝানোর জন্য ১৯৮০ সালে বৈজ্ঞানিক লেখক কার্ল সেগান তাঁর বিখ্যাত 'কসমস' সিরিজে পুরো একটি পর্ব করেছেন।

কার্ল সেগান তার সেই সিরিজে এই পর্বের নাম রেখেছেন 'টুইন প্যারাডক্স' বা 'যমজ বিভ্রান্তি।'

শুধু কার্ল সেগান নয়, Time Dilation এর উপর ভিত্তি করে হলিউডে ব্লকবাষ্টার মুভিও তৈরি হয়েছে ২০১৪ সালে। নাম- Interstellar….

ধরা যাক, আমি আর আমার এক জমজ ভাই। আমাদের দু'জনের বয়স এখন ১৮ করে।

হঠাৎ করে আমার মাথায় ভূত চাপলো যে, আমি স্পেসশিপে করে মহাবিশ্ব ভ্রমণে বের হবো। পৃথিবী থেকে পাঁচহাজার আলোকবর্ষের মধ্যে যা কিছু আছে, তা আমি দেখে আসবো।কিন্তু সেটা মাত্র তিন বছরের মধ্যে। অর্থাৎ, স্পেসশিপ নিয়ে আমি মহাবিশ্ব ভ্রমণে বের হলে তিন বছরের মধ্যে পাঁচহাজার আলোকবর্ষ ভ্রমণ করে আসবো।

এখন, কথা হচ্ছে, তিন বছরের মধ্যে আমি যদি পাঁচহাজার আলোকবর্ষ ভ্রমণ করে পৃথিবীতে ফিরতে চাই, আমার স্পেসশিপটাকে তো আলোর গতির (সেকেন্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল) কাছাকাছি গতিতে ছুটতে হবে। তা নাহলে এটা কোনদিনও সম্ভব না। কিন্তু আইনষ্টাইন এও বলেছেন, কোন বস্তু কোনদিনও আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে ছুটতে পারবেনা। এটা অসম্ভব।

ধরে নিলাম, আইনষ্টাইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আমি আর আমার ভাই সেরকম একটি স্পেসশিপ তৈরি করে ফেললাম যা ছুটবে প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাইল।

আমি আমার ভাইয়ের কাছ থেকে অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় নিলাম। ২০১৬ সালের ২৫ শে নভেম্বর আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্পেসশিপে করে রওনা হলাম মহাশূন্যের পথে। যখন বিদায় নিচ্ছি, তখন দুইজনেরই বয়স ঠিক কাটায় কাটায় ১৮ করে।'

এতোটুকু বলার পরে সাজিদ একটু থামলো। কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে। মফিজ স্যারও। তাদের কাছে ব্যাপারটা জানা থাকলেও এভাবে হয়তো ইন্টারেষ্টিং লাগছে।

সাজিদ আবার বলতে আরম্ভ করলো-

'এইখানেই থিওরিটির মজা। আইনষ্টাইন বলেছেন, যেহেতু আমার ভাই পৃথিবীতে আছে আর আমি আলোর কাছাকাছি গতির একটি স্পেসশিপে, সেহেতু আমার গতি (মানে, স্পেসশিপের গতি) আমার ভাইয়ের তুলনায় অনেক অনেক বেশি।

এখন থিওরি মতে, গতিশীল বস্তুতে সময় কম দ্রুত চলে।
তাহলে আমার সময় চলবে আস্তে।
থিওরি আবার বলেছে, কম গতিশীল বস্তুতে সময় অত্যন্ত দ্রুত চলে।
তাহলে, আমার ভাইয়ের সময়গুলো চলবে দ্রুত।

এখন আরো ধরি, স্পেসশিপে যাবার সময় আমার হাতে যে ঘড়ি ছিলো, সেই ঘড়ির সময় অনুযায়ী আমি ঠিক কাটায় কাটায় তিন বছর পরে ৫০০০ আলোকবর্ষ ভ্রমণ করে পৃথিবীতে এলাম।

তাহলে তখন আমার বয়স কতো? ১৮+৩ = ২১।

পৃথিবীতে এসে যখন আমি আমার ভাইয়ের সামনে যাবো, তখন তার বয়স কতো হবে? তাঁর বয়সও কি ২১ হবে?

হাহাহাহাহা। একদম না। আলোর কাছাকাছি গতির স্পেসশিপ নিয়ে আমি যে তিনবছর মহাশুন্যে কাটিয়ে এসেছি, সে তিনবছরে পৃথিবীতে পার হয়ে যাবে প্রায় ৫০ বছর। কেন এমনটা হলো? কিভাবে? কারন, দুইটা মাত্রায় আর গতিতে আমার আর আমার ভাইয়ের সময়ের মধ্যে একটা তারতম্য ঘটে গেছে। আমি দ্রুত গতির স্পেসশিপে

থাকার কারনে আমার সময় যেখানে স্লো (সেটা আমার গতি বিবেচনায় পারফেক্ট) চলেছে, আমার ভাইয়ের সময় সেখানে চলেছে দ্রুত (তার গতির তুলনায় সেটা তাঁর জন্য পারফেক্ট)।

আমার যমজ ভাই, যাবার সময় যার বয়স ছিলো আমার মতোই ১৮, আমি এসে দেখবো সে তখন ৬৮ বছরের একটা বৃদ্ধ। তাঁর হাতে একটা লাঠি।কোমড় নুঁয়ে গেছে। শরীর ভেঙে পড়েছে।

এটাকে রূপকথার গল্পের মতো মনে হলেও এটাই সত্যি। এইজন্য কার্ল সেগান এটাকে 'টুইন প্যারাডক্স' বা 'যমজ বিভ্রান্তি' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এভাবে ২০১৬ সালে এরকম দ্রুত গতির যান নিয়ে মহাবিশ্ব ভ্রমণে বের হয়ে তিনবছর পর এসে আমি চাইলেই ২০৬৬ সালের পৃথিবীকে দেখে ফেলতে পারি মাত্র তিনবছর বয়স বাড়িয়ে।এটাই ভবিষ্যত ভ্রমণ। আমার সমবয়সীরা যখন কেউ কবরে, কেউ মৃত্যুশয্যায়, তখনো আমি থাকতে পারি ২১ বছরের টগবগে তরুণ। ব্যাপারটা এরকম। এটাই 'Time Dilation'.. স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটির সবচে মজার অংশ।'

সাজিদের প্রেজেন্টেশান শেষ। সবাই জোরে জোরে হাততালি দিতে লাগলো।

মফিজুর রহমান দাঁড়ালেন। তারপর ব্যঙ্গাত্মকভাবে সাজিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের কোরানে এই থিওরির ব্যাপারে কি কিছু আছে?'

সাজিদ বুঝতে পারলো যে স্যার তাকে নিয়ে বিদ্রুপ করতে চাচ্ছেন। সে মাথা নিঁচু করে ফেললো।

মফিজ স্যার বললেন, 'না, তোমরাই তো বলো তোমাদের কোরান আধুনিক বিজ্ঞান টিজ্ঞান নিয়ে নাকি কতো কথাই বলেছে সেইই ১৫০০ বছর আগে। তাই জানতে চাচ্ছিলাম আর কি এরকম কিছুও বলেছে কি না। হা হা হা হা।'

স্যারের সাথে তাল মিলিয়ে ক্লাশের আরো কয়েকজন হেসে উঠলো। এরা তারা, যারা সাজিদকে একদম সহ্য করতে পারে না।

সাজিদ বললো, 'স্যার, with due respect, আল কোরআন বিজ্ঞানের কোন থিওরিটিক্যাল বই নয় যে এখানে বিজ্ঞানের সবকিছু সব সাইড নিয়ে বলা থাকবে। এটা মানুষকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে আসেনি। এটার মেইন পারপাস হলো এই- মানুষ যেন জাগতিক জীবনে সৎ, ন্যায় এবং সুন্দর জীবনযাপন করে, তাকওয়াবান হয়ে পরকালে জান্নাত লাভ করতে পারে।যে রিক্সাওয়ালা থিওরি অফ রিলেটিভিটি বুঝেনা বা কখনো বুঝবেনা, সে যদি সৎ হয়, ঈমানদার হয়, তাকওয়াবান হয় তাহলে পরকালে সেও জান্নাতে যাবে।'

মফিজ স্যার বললেন, 'ও, তার মানে কোরআনে এরকম কিছুই বলা নাই? আপসোস! আমি ভাবলাম হয়তো থাকবে।'

সাজিদ মাথা তুলে বললো, ' জ্বি না স্যার, কোরআনে এরকম কিছু আছে।'
সাজিদের কথা শুনে পুরো ক্লাশ থ হয়ে রইলো।

সাজিদ বললো, 'স্যার, আমি এতোক্ষন স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটির যে অংশটি নিয়ে বললাম, সেটার সারমর্ম হলো এই- সময় দুইটা মাত্রায়, দুইটা অবস্থায় দুই রকম আচরন করে।কেন করে সেটাও বললাম।

সময়ের ব্যাপারে এতো চমকপ্রদ তথ্য আমাদের জানিয়েছেন মহামতি আইনষ্টাইন।১৯০৫ সালে। এর আগে তা আমরা জানতাম না। আমরা জানতাম, সময় সবখানে, সব অবস্থায় সমান।

শুধু আমরাই নই, সুপ্রাচীন কাল থেকে তাবৎ পৃথিবীর মানুষের ধারনাই ছিলো এটা। আল কোরআন যখন নাজিল হচ্ছে,তখনও আরবের মানুষদের এটাই ধারনা ছিলো। তারা কল্পনাও করতে পারতো না যে, দুইটা অবস্থানে সময় দুই রকম হতে পারে।

আমার কাছে যেটা ৩ বছর, আমার ভাইয়ের কাছে সেটা যে ৫০ বছর হতে পারে, তারা সেটা ভাবতেও পারে নি।

কিন্তু আল কোরআন এসে তাদের অন্যরকম কিছু জানালো। আল কোরআন জানাচ্ছে- 'হ্যাঁ, এইটা সম্ভব।'

আল কোরআন বলছে-
'ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে আরোহণ করে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ (তোমাদের হিসাব মতে) পঞ্চাশ হাজার বছর।'- সূরা আল মা'আরিজ ০৪

'The angels and the Spirit will ascend to Him during a Day the extent of which is fifty thousand years'

দেখুন, আল্লাহ বলছেন যে, ফেরেস্তারা এমন একটি দিনে আল্লাহর কাছে যায় যেটা আমাদের হিসাব মতে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

তাদের ১ দিন = আমাদের ৫০,০০০ বছর।

তারা মানে কারা? ফেরেস্তারা। ফেরেস্তারা কিসের তৈরি? নূর, অর্থাৎ আলোর। আলোর গতি কি রকম? সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।

এই আলোর তৈরি ফেরেস্তারা এমন একদিনে আল্লাহর কাছে পৌঁছায়, যেটা আমাদের গণনায় ৫০,০০০ বছরের সমান।

এটার সাথে স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটির 'টুইন প্যারাডক্সের' ব্যাপারটা মিলান তো।

'আমি এমন তিনবছরে ৫০০০ আলোকবর্ষ ভ্রমণ করে এলাম যা আমার যমজ ভাইয়ের হিসাব মতে ৫০ বছরের সমান।'
আমার তিনবছর = আমার যমজ ভাইয়ের ৫০ বছর।
ফেরেস্তাদের একদিন = আমাদের ৫০,০০০ হাজার বছর।
এটাই হলো আইনষ্টাইনের থিওরির বিশেষ অংশ।এটার নাম 'Time Dilation'...

১৫০০ বছর আগে কি করে কেউ ভাবতে পারে যে সময়ের এরকম পার্থক্য হতে পারে? ইম্পসিবল।

এটা সেই স্রষ্টা থেকে আসা, যিনি সবকিছুর মতো সময়েরও সৃষ্টিকর্তা।সৃষ্টিকর্তাই তো তার সৃষ্ট সময়ের ব্যাপারে জানবেন, তাই না? সময়ের যে পার্থ্যক্যের ব্যাপারে আমাদের আইনষ্টাইন জানালেন ১৯০৫ সালে, সেটা ১৫০০ বছর আগে নিরক্ষর মুহাম্মদ সাঃ কিভাবে জানবেন যদি না সময়ের সৃষ্টিকর্তাই উনাকে না জানান?

আপনি বলতে পারেন, আল কোরআন কি তাহলে এখানে থিওরি অফ রিলেটিভিটি শিখাচ্ছে? একদম না। আমি আগেও বলেছি, কোরআন বিজ্ঞানের কোন থিওরিটিক্যাল বই নয়। এটা Science এর বই নয়, এটা Sign এর বই। এটা একটা চিরন্তন সত্য স্রষ্টার কাছ থেকে আসা।তাই এটাতে বিভিন্ন উপমায়, উদাহরণে, ভঙ্গিতে এমন কিছু থাকবে যা সময়ের সাথে সাথে বিজ্ঞানের সাথেও মিলে যাবে। এতে অবিশ্বাসীদের কাছে এটার গ্রহণযোগ্যতা, এটার বিশ্বাসযোগ্যতা, এটার অথেনটিসিটি বেড়ে যাবে। এই বই তাঁর এসব Sign দিয়ে অবিশ্বাসীদের মনে দাগ কাটবে। যেমন দাগ কেটেছে ড. গ্যারি মিলারের মনে, বিজ্ঞানী ড. মরিস বুকাইলির মনে, বিজ্ঞানি কিথ মূরদের মনে।যেমন দাগ কাটছে পশ্চিমের হাজার হাজার খ্রিষ্টানদের মনে।এইসব Sign দেখে প্রতিদিন পৃথিবীর আনাচে কানাচে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে শত শত মানুষ।'

ক্লাশ পিরিওড শেষের দিকে। মফিজুর রহমান স্যার উনার চোখের মোটা কালো ফ্রেমের চশমাটা খুলে চশমার কাঁচ পরিষ্কার করতে করতে হাঁটা ধরলেন। দরজার কাছে গিয়ে তিনি মুখ ফিরিয়ে সাজিদের দিকে তাকালেন। সাজিদ বললো, 'আসসালামু আলাইকুম স্যার।'

কম্পিউটারের সামনে উঁবু হয়ে সাজিদ খুব মনোযোগ সহকারে কী যেন লিখছে। জানি না কী লিখছে। তবে যা লিখছে তা খুব যত্ন আর সাবধানে লিখছে তা বোঝা যাচ্ছে। মনে হয় খুব সিরিয়াস কিছু।।
আমি জিজ্ঞেস করলাম
-"কী লিখছিস?
-একটা মেইল পাঠাচ্ছি।'
-মেইল? কাকে? -ডেভিডকে।
-ডেভিডকে? বেড়াতে আসার জন্য বলবি নাকি?

সাজিদ কিছু না বলে ডেভিডের পাঠানো মেইলটা আমার সামনে ওপেন করল। ডেভিড সম্পর্কে আগে কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার। ডেভিড হলো সাজিদের বিদেশি বন্ধু। তাদের দুজনের প্রথম সাক্ষাৎ হয় যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায়। সেখানকার একটা বিজ্ঞান মেলায় একবার সাজিদ গিয়েছিল তার বাবার সাথে। তখন সাজিদ মাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল। বিজ্ঞান মেলায় ডেভিড এবং তার বন্ধুরা একটি অদ্ভুত যন্ত্র প্রদর্শন করেছিল। যন্ত্রটা অনেকটাই ড্রোনের মতো। যন্ত্রটি প্রদর্শনের সময় ডেভিড যখন এটাকে চালু করতে যাচ্ছিল, সেটা কোনোভাবেই চালু হচ্ছিল না। অনেক চেষ্টা করেও ডেভিড এবং তার টিম সেটাকে চালু করতে পারছিল না। তখন সাজিদ ডেভিডের দিকে তাকিয়ে বলেছিল-'Can I help you?'
ডেভিড সাজিদের দিকে তাকিয়ে ছিল বেশ কিছুক্ষণ। এরপর বলল-'Sure.'।
সাজিদ টুকটাক করে কিছু কাজ করে দিয়েছিল। ডেভিড, তার টিম, সাজিদের বাবা এবং প্রদর্শনী দেখতে আসা অনেক লোক সাজিদের কাজের দিকে তাকিয়ে আছে। কাজ শেষ করে সাজিদ বলেছিল-'Try now.'।

ডেভিড তখনো ভ্যাবলা মার্কা চেহারায় সাজিদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল। সাজিদ আবার বলল-'Hello, you can try now, dear.' |
ডেভিড আলাভোলা চেহারায় আবারও বলল-'Sure.'
এবার ডেভিডদের যন্ত্রটি চালু হলো। ভোঁৎ ভোঁৎ শব্দ করতে করতে সেটা চোখের পলকেই আকাশে উড়াল দিল। ডেভিডের হাতে একটি রিমোট। রিমোট টিপে যন্ত্রটিকে ডাইরেকশান দিয়ে উপরে-নিচে নামানো হচ্ছে। এপাশ-ওপাশে সরানো হচ্ছে। ডেভিড সাজিদের দিকে ফিরে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল
-'Hi, I'm David, David Anderson, you?'
সাজিদ মুচকি হেসে বলল-'I'm Sajid.'
-'From?'। -"Bangladesh'
-Great! Can we be friend, Sajid?
সাজিদ হাসিমুখে বলল-'Sure, Why not?' সেই থেকে দুজনের বন্ধুত্ব। ডেভিড ইতােমধ্যে একবার বাংলাদেশে দুই সপ্তাহের জন্য বেড়াতেও এসেছিল। সেবার সে যাবার আগে অনেক কষ্টে একটি বাংলা বাক্য শিখে গিয়েছিল। বাক্যটি ছিল-"আমি তোমাকে ভালবাসি"
ইংরেজি ভাষাভাষীরা বাংলা 'ত' উচ্চারণ করতে পারে না ঠিকমতো। তারা 'ত' কে 'ট' উচ্চারণ করে। সেবার ডেভিড 'আমি তোমাকে ভালবাসি' বাক্যটাকে বলছিল এরকম-'আমমি টোমাকে বালো-বাসি।' শুনে মজা পাচ্ছিলাম আমরা। ডেভিডের মেইলটা পড়লাম। মেইলে লেখা ছিল-

'Hi Sajid,
It has been a while since we last spoke. I hope you are well. I have been good. I am writing this letter to you because I would like to discuss something. I am a devoted Christian and I respect my religion. I am sure you can relate. A few days back, I met with some of my friends, all of whom were atheists. I was not bothered by the fact that

they did not believe in God or Jesus, but something they said hurt me immensely. They said that Jesus was a creation of Egyptian mythology and he had never existed. I remember you telling me that Islam also honors Jesus and respects him as one of the Prophets. I was wondering, could you send me some accounts of Jesus Christ's existence from some (Non-Christians and Non-Muslims) credible sources that will provide evidence that Jesus really did exist in history? You would be happy to learn that I have become more fluent in Bangla now; one of my classmates has been helping me out with it. I am eagerly waiting for your reply. ভেবেছিলাম বাংলাদেশে এসে তোমাকে চমকে দেবো, কিন্তু লিখতে বসে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। তুমি আর আরিফ বেড়াতে এসো। তোমাদের আমি খুব মিস করি। ভালো থেকো।
Yours,
David...'

ডেভিডের মেইলটা পড়ে আমিও চমকে গেলাম। কী রকম ঝরঝরে হাতে বাংলা লিখল সে।।
সাজিদ বলল-"তাকে এই ব্যাপারে মেইল করছি।
সাজিদের মেইল লেখা শেষ। কিন্তু মেইলটা দেখার আমারও খুব লোভ হচ্ছিল। তাই আমি সাজিদকে বললাম- সরে দাঁড়া একটু। আমি দেখি।
-"কী দেখবি?', সাজিদ জানতে চাইল। -
কেন? যা লিখেছিস, তা-ই।
-"কেন দেখবি?"
আমি কটাক্ষ করে বললাম-"স্যার, আপনার লিখার হাত খুব কাঁচা। আপনি যে-বানানে লিখেন, তা পড়ে সদ্য বাংলা শেখা ডেভিডও হাসতে হাসতে খুন হবে। তাই, অ্যাজ ইওর ফ্রেন্ড, লেখাটার প্রুফ রিডিং করে দেওয়া আমার কর্তব্য। আমার প্রিয় বন্ধুর ভুল বানান দেখে সুদূর আমেরিকায় কেউ হাসাহাসি করবে, ব্যাপারটা আমি মেনে নিতে পারব না। অনেকটা মনমরা, কাঁদো কাঁদো গলায় বললাম।
সাজিদ আমার দিকে তাকিয়ে, মুখ ভেংচিয়ে উঠে পড়ল। আমি ধপাস করে বসে পড়লাম তার চেয়ারে। এরপর লেখাটি ওপেন করলাম। সে যেভাবে লিখেছে, ঠিক সেভাবে পড়া শুরু করলাম –
ডেভিড,
আজ প্রথম তোমায় বাংলাতে লিখছি। কখনো তোমায় বাংলায় লিখব, এটা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তুমি বাংলা শিখেছ, এটা আমার জন্য সত্যিই অনেক বড় সারপ্রাইজ। রিয়েলি, আই অ্যাম প্রাউড অফ ইউ ডিয়ার।
যাহোক, ধর্মের প্রতি তোমার আগ্রহ আরো একবার আমাকে বিমুগ্ধ করেছে বন্ধু। তুমি আমার কাছে যিশু (যিনি আমাদের ধর্মে ঈসা আলাইহিস-সালাম নামে পরিচিত) সম্পর্কে জানতে চেয়েছ। জানতে চেয়েছ তাঁর অস্তিত্বের ঐতিহাসিক সত্যতা। কেবল তোমার ধর্মের নয়, আমার ধর্মেরও অন্যতম রাসূল হিসেবে আমারও উচিত এই বিষয়টা পরিষ্কার করা।
তবে তার আগে তোমাকে আমার ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপারে দুটো কথা বলে নিই। উনার ব্যাপারে তোমার ধর্মের বিশ্বাস হলো-
এক: যিশু খ্রিষ্ট ঈশ্বরের পুত্র এবং তিনি নিজে 'তিন ঈশ্বর' -এর একজন।
দুই: উনাকে ইহুদিরা ক্রুশবিদ্ধ করে মেরে ফেলেছে এবং তিনি মৃত অবস্থা থেকে আবার জীবিত হন।
আমার ধর্মবিশ্বাস তোমার এই দুটো বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার ধর্মবিশ্বাস হলো-
এক: উনি আল্লাহর পুত্র নন। আল্লাহর না কোনো সন্তান আছে, না কেউ আল্লাহকে জন্ম দিয়েছে।
দুই: উনাকে মোটেও ক্রুশবিদ্ধ করা হয়নি। যখনি ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য জনৈক ইহুদি উনার ঘরে প্রবেশ করে, তখন আল্লাহ তাঁর কুদরতে উনাকে চতুর্থ আসমানে তুলে নেন এবং যে-লোকে উনাকে ক্রুশবিদ্ধ করতে ঘরে প্রবেশ করে , আল্লাহ ঐ লোকের চেহারাকে অবিকল ঈসা (আঃ)-এর মতো করে দেন। ফলে, উনাকে হত্যা

করতে আসা ইহুদিরা বিভ্রান্ত হয়ে যায় এবং তারা তাদেরই লোককে ঈসা (আঃ) ভেবে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে। কাজেই ঈসা (আঃ) ক্রুশবিদ্ধ হননি।

এটা আমাদের কোরআনের সাক্ষ্য; আর এটাই আমাদের বিশ্বাস। সে যাহোক, তোমাকে যিশু খ্রিষ্ট, আই মিন ঈসা (আঃ)-এর ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে নন-ক্রিস্টিয়ান সোর্স থেকে বলতে গেলে আমাকে উনার ক্রুশবিদ্ধ হওয়া ব্যাপারটাকেও সামনে আনতে হবে। অর্থাৎ, আমার বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে গিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তোমার এবং ইহুদিদের বিশ্বাসের সাথে মিলিয়ে আমাকে দেখাতে হবে যে, যিশু খ্রিষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন। এটা আমি করব কেবল উনার অস্তিত্বের ঐতিহাসিক সত্যতা নির্ণয়ে। জেনে রেখো: এটা আমার বিশ্বাস নয়।

এবার প্রসঙ্গে আসি। ইসলামিক সোর্স এবং ক্রিস্টিয়ান সোর্সের বাইরে গিয়েও আসলে ঈসা (আঃ)-এর অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায়।
ঈসা (আঃ)-এর জন্মের পর থেকে একটি নতুন নামে ক্যালেন্ডার ইয়ারের সময় হিসাব করা হয়। উনার জন্মের আগের সময়কে ধরা হয় 'B.C' হিসেবে। 'B.C মানে 'Before Christ'। উনার জন্মের আগের সময়টাকে 'Before Christ' নামে ধরা হতো। উনার জন্মের পরে 'Before Christ' বা 'B.C' এর বদলে চালু হয় 'A.D' বা 'Anno Domini'। এই 'Anno Domini' শব্দদ্বয় 'Medieval Latin' থেকে এসেছে যার অর্থ-'In the time of our Lord'। এটার সোজা বাংলা হলো ‘ঈসা আঃ-এর সময়কাল হতে। অর্থাৎ, উনার জন্মের পর থেকে সময়টা 'In the time of our Lord' বা 'Medieval Latin' অনুযায়ী 'A.D' হিসেবে ধরা হয়।
এখন আমাদের দেখতে হবে, এই 'A.D' টাইম স্কেলের শুরুর দিকের এমন কোনো সোর্স আছে কিনা যা ঈসা (আঃ)-এর অস্তিত্বের ব্যাপারে আমাদের কোনো ইঙ্গিত দিতে পারে? হ্যাঁ, ইঙ্গিত আছে।

ইতিহাস থেকে আমরা রোমান সম্রাট ‘নিরো’ -র ব্যাপারে জানতে পারি। নিরো ছিলেন পঞ্চম রোমান সম্রাট। উনার রাজত্বকাল স্থায়ী হয়েছিল ৫৪ 'A.D' থেকে ৬৮ 'A.D' পর্যন্ত। তাহলে বুঝাই যাচ্ছে উনি যিশুর জন্মের ৫৪-৬৮ বছরের মধ্যকার সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন। উনার সময়ে একবার রোম শহরে ভয়ঙ্কর আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এই আগুনে রোম শহরের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই আগুনের খবর ইতিহাস বিখ্যাত। তখন খ্রিষ্ট ধর্ম একেবারে শুরুর পর্যায়ে এবং রোমে তখন ছিল ইহুদিদের বসবাস। তথাপি, রোমে ছন্নছাড়া অবস্থায় কিছু খ্রিষ্টান বসবাস করত বলে জানা যায়। খ্রিষ্টানরা তখন রোমে একেবারে নগণ্য হলেও তাদের ব্যাপারে ইহুদিরা সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিল। অর্থাৎ, খ্রিষ্টানরা কোন ইশ্বরের পূজো করে, তাদের ধর্ম কোথায়, কীভাবে উৎপত্তি লাভ করে ইত্যাদি ব্যাপারে ইহুদিরা ওয়াকিবহাল ছিল।রোমের সেই ঐতিহাসিক দাবানলের জন্য তখন রোমবাসীরা সম্রাট নিরোকেই দোষারোপ করে। কিন্তু সম্রাট নিরো নিজের ঘাড়ে দোষ না নিয়ে এই দোষ রোমের সংখ্যালঘু খ্রিষ্টানদের উপর চাপিয়ে দেয়। সম্রাট নিরোর সময়কালের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ছিলেন Senator Tacitus। তিনি তার সবচেয়ে সফল বই 'Annals'-এ এই আগুন এবং নিরোর প্রতি অভিযোগের চিত্র তুলে ধরেন এভাবে-

Nero fastened the guilt... on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of... Pontius Pilatus...’Tacitus এই মন্তব্য করেছিল যিশুর জন্মের ৫০ বছরের মধ্যেই এবং তিনি সুস্পষ্টরূপে তিনটি ব্যাপার এখানে তুলে ধরেছেন।

একঃ নিরো তার উপর আরোপিত দোষ এমন কিছু লোকের উপর চাপিয়ে দিল যারা 'Christian' নামে পরিচিত।
দুইঃ এই 'Christian' নামটি এসেছে 'Christus' নামক কোনো এক ব্যক্তি থেকে। 'Christus' একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ 'Christ'।
তিনঃ এই Christ নামের ব্যক্তিকে 'Extrme Penalty' বা ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।
চারঃ এই ব্যক্তিকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় রাজা Tiberius-এর সময়কালে যা বাইবেলে উল্লিখিত যিশু খ্রিষ্টের জন্ম সালের সাথে ম্যাচ করে।

Tacitus কোনো খ্রিষ্টান ছিলেন না। তিনি ছিলেন Jews বা ইহুদি। তিনি তার এই ঐতিহাসিক বইতে রোমান সম্রাট নিরোর সময়কালের আগুন লাগার ব্যাপারটা তুলে ধরতে গিয়ে যিশু তথা ঈসা (আঃ) এবং তাঁর নামানুসারে প্রচলিত হওয়া ধর্মের ব্যাপারে ইঙ্গিত করেছেন। এখান থেকেই আমরা সুস্পষ্টরূপে বলতে পারি যে, যিশু তথা ঈসা (আঃ) কোনো Mythical Figure নন, তিনি Historical Figure.
খ্রিষ্টান ইতিহাসবিদ 'Edwin Yamauchi' Tacitus এর এই উদ্ধৃতিকে যিশু খ্রিষ্টের অস্তিত্বের ব্যাপারে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য, নির্ভরশীল নন-ক্রিস্টিয়ান সোর্স বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন এভাবে-'Probably the most important reference to Jesus outside the New Testaments.'

আরও একজন রোমান সম্রাটের সময়কাল থেকে যিশু খ্রিষ্টের অস্তিত্বের ব্যাপারে জানা যায়। তিনি হলেন Pliny the Younger! বর্তমান তুরস্ক তখন রোমান সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। সেখানকার (বর্তমান তুরস্কের) রাজ্য পরিচালনা করছিলেন তখন Pliny the Younger.
সময় তখন ১১২ A.D। তখন মূল রোমান সম্রাট ছিল সম্রাট Traian। সম্রাট Trajan-কে ম্রাট Pliny একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে খ্রিষ্টান এবং যিশু খ্রিষ্টের ব্যাপারে উল্লেখ পাওয়া যায়। চিঠিতে তিনি লিখেন-
'They were in the habit of meeting on a certain fixed day before it was light, when they sang in alternate verses a hymn to Christ, as to a god, and bound themselves by a solemn oath, not to any wicked deeds, but never to commit any fraud, theft or adultery, never to falsify their word, nor deny a trust when they should be called upon to deliver it up; after which it custom to separate, and then reassemble to partake of food - but food of an ordinary and innocent kind.'

Pliny-র চিঠি থেকে কিছু স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে। এক: খ্রিষ্টানরা নির্দিষ্ট একটা দিনে প্রার্থনার জন্য একত্রিত হতো।
দুই: লক্ষণীয় ব্যাপার, বলা হচ্ছে তারা Christ নামের এক ব্যক্তির প্রার্থনা করে যাকে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে 'As to God' হিসেবে। এখান থেকে স্পষ্ট, Christ এমন একজন, যিনি মানুষ ছিলেন, একই সাথে ঈশ্বরও (যেহেতু খ্রিষ্টানরা যিশুকে ঈশ্বর জ্ঞান করত)।
Pliny-র এই চিঠি থেকে ১১২ A.D এর দিকে আমরা যিশু খ্রিষ্টের অস্তিত্বের ব্যাপারে জানতে পারি, যা যিশু খ্রিষ্টের জন্মের ১০০ বছরের মধ্যে লেখা হয়।
তাছাড়াও, খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে Josephus নামের এক ইহুদির লেখা 'Jewish Antiquities' নামের বইতেও যিশু খ্রিষ্টের ব্যাপারে উল্লেখ পাওয়া যায়।
তিনি তাঁর বই 'Jewish Antiquities' এ লিখেছেন-'About this time, there lived Jessus, a wise man.'

খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে, Lucian নামের একজন খ্রিষ্ট ধর্মের সমালোচক, যিনি একজন Jewish ছিলেন, তিনি খ্রিষ্টানদের সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেন-
'The Christians... worship a man to this day-the distinguished personage who introduced their novel rites, and was crucified on that account... [It] was impressed on them by their original lawgiver that they are all brothers, from the moment that they are converted, and deny the gods of Greece, and worship the crucified sage, and live after his laws.'
Lucian স্পষ্টই বলেছেন, খ্রিষ্টানরা এমন একজনকে ঈশ্বর জ্ঞান করছে যে কিছু মহৎ বাক্য দিয়ে তাদের মোহিত করেছে এবং পরে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে। এখান। থেকেই আমরা খ্রিষ্টীয় শতকের প্রথম দিক থেকেই যিশু খ্রিষ্ট তথা ঈসা (আঃ)-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। তিনি যে কোনো কাল্পনিক' ফিগার নন-বরং 'ঐতিহাসিক'

ফিগার, তা প্রমাণের জন্য এসবই যথেষ্ট। যারা বলে যিশু তথা ঈসা (আঃ) একজন 'Mythical Figure', তাদের কাছে দাবির সপক্ষে কিছু গালগল্প ছাড়া আর কোনো প্রমাণ নেই।

ও হ্যাঁ, ডেভিড, যারা তোমাকে বলেছে যিশু একজন 'Mythical Figure', আই মিন তোমার এথেইস্ট বন্ধুরা, তারা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত এথেইস্ট রিচার্ড ডকিন্সের কথাকে দৈববাণীর মতো বিশ্বাস করে, তাই না?
মজার ব্যাপার কি জাননা? এই রিচার্ড ডকিন্সও John Lennox-এর সাথে এক বিতর্কে স্বীকার করেছে যিশু খ্রিষ্ট একজন Historical Figure. তিনি বলেন-'I think, Jessus existed'
আমি মনে করি, যিশু তথা ঈসা (আঃ)-এর অস্তিত্বের ব্যাপারে নাস্তিকদের জবাব দেওয়ার জন্য রিচার্ড ডকিন্সের এই উদ্ধৃতিটিই এনাফ।
আমাকে নিয়মিত লিখবে। আর, তুমিও আবার বেরাতে এসো। আর হ্যাঁ, বাংলা রপ্ত করার জন্য আবারও তোমায় অভিনন্দন বন্ধু। ভালো থেকো।
তোমার প্রিয়
সাজিদ
মেইল পুরোটা পড়লাম। ইতোমধ্যেই সাজিদ গোসল শেষ করে এসে গেছে। আমার পাশে এসে বলল: কি রে, আমেরিকায় বেড়াতে যাবি? আমি কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে বলল: কী হলো তোর?”
আমি আমতা আমতা করে বললাম, ডেভিড কি এখনো তোমাকে বলে নাকি ‘টোমাকে বলে জানিস?
সাজিদ হা হা হা করে হেসে উঠল। অনেকদিন পর তাকে আমি এভাবে হাসতে দেখলাম।

রেফারেন্স :

- Edwin Yamauchi, quoted in Lee Strobel, The Case for Christ (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1998)
- Tacitus, Annals 15.44, cited in Strobel, The Case for Christ,
- N.D. Anderson, Christianity: The Witness of History (London: Tyndale, 1969), 19, cited in Gary R. Habermas
- The Historical Jesus (Joplin, Missouri: College Press Publishing Company, 1996, 189N190.
- Edwin Yamauchi, cited in Strobel,
- The Case for Christ, 82.
- Pliny, Epistles x. 96, cited in Bruce,
- Christian Origins, 25; Habermas, The Historical Jesus 198.
- Pliny, Letters, transl. by William Melmoth, rev. by W.MI. Hutchinson (Cambridge: Harvard Univ. Press, 1935), vol. II, X:96, cited in Habermas
- The Historical Jesus, Page 199
- M. Harris, "References to Jesus in Early Classical Authors, in Gospel Perspectives V, 354-55, cited in E. Yamauchi,
- 'Jesus Outside the New Testament: What is the Evidence?,' in
- Jesus Under Fire, ed. by Michael J. Wilkins and J.P. Moreland (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1995), p. 227, note 66.
- Habermas, The Historical Jesus, 199.
- Bruce, Christian Origins, 28.
- Josephus, Antiquities xx. 200 , Cited in Bruce, Christian Origins, 36.
- Yamauchi-Jesus Outside the New Testament' Page 212.

- 'Josephus, Antiquities 18.63-64, cited in YamauchiJesus Outside the New Testament', Page 212.

কোরআন, আকাশ, ছাদ এবং একজন ব্যক্তির মিথ্যাচার

মফিজুর রহমান স্যার সাজিদের দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাকানোর ভঙ্গি এরকম,- 'বাছা! আজকে তোমাকে পেয়েছি!! আজ তোমার বারোটা যদি না বাজিয়েছি, আমার নামও মফিজ না।'

সাজিদ মাথা নিঁচু করে ক্লাশের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ মিনিট দেরি করে ফেলেছে ক্লাশে আসতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ মিনিট দেরি করে ক্লাশে আসা এমন কোন গুরুতর পাপ কাজ নয় যে এরজন্য তার দিকে এভাবে তাকাতে হবে।

সাজিদ সবিনয়ে বললো,- 'স্যার, আসবো?'

মফিজুর রহমান স্যার অত্যন্ত গুরুগম্ভীর গলায় বললেন,- 'হু'।

এমনভাবে বললেন, যেন সাজিদকে দু চার কথা শুনিয়ে দরজা থেকে খেদিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারলেই উনার গা জুড়োয়।

সাজিদ ক্লাশ রুমে এসে বসলো। লেকচারের বেশ অর্ধেকটা শেষ হয়ে গেছে। মফিজুর রহমান স্যার আর পাঁচ মিনিট লেকচার দিয়ে ক্লাশ সমাপ্ত করলেন।

সাজিদের কপালে যে আজ খুবই খারাপি আছে সেটা সে প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছে।

মফিজুর রহমান স্যার সাজিদকে দাঁড় করালেন।

খুব স্বাভাবিক চেহারায়, হাসি হাসি মুখ করে বললেন,- 'সাজিদ, কেমন আছো?'

সাজিদ প্রায় ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো। এই মূহুর্তে সে যদি সত্যি সত্যিই ডুমুরের ফুল অথবা ঘোড়ার ডিম জাতীয় কিছু দেখতো, হয়তো এতটা চমকাতো না। মিরাকল জিনিসটায় তার বিশ্বাস আছে, তবে মফিজুর রহমান স্যারের এই আচরণ তার কাছে তারচেয়েও বেশি কিছু মনে হচ্ছে।

এই ভদ্রলোক এত সুন্দর করে,এরকম হাসিমুখ নিয়ে কারো সাথে কথা বলতে পারে, এটাই এতদিন একটা রহস্য ছিলো।

সাজিদ নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে বললো,- 'জ্বি স্যার, ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ্। আপনি কেমন আছেন?'

তিনি আবারও একটি মুচকি হাসি দিলেন। সাজিদ পুনঃরায় অবাক হলো। মনে হচ্ছে সে কোন দিবাস্বপ্নে বিভোর আছে।

স্বপ্নের একটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে, স্বপ্নে বেশিরভাগ সময় নেগেটিভ জিনিসকে পজিটিভ আর পজিটিভ জিনিসকে নেগেটিভ ভাবে দেখা যায়।মফিজুর রহমান স্যারকে নিয়ে তার মাত্রাতিরিক্ত নেগেটিভ চিন্তা থেকেই হয়তো এরকম হচ্ছে। একটুপরে সে হয়তো দেখবে, এই ভদ্রলোক তার দিকে রাগি রাগি চেহারায় তাকিয়ে আছে এবং বলছে,- 'এ্যাই ছেলে? এত দেরি করে ক্লাশে কেন এসেছো? তুমি জানো আমি তোমার নামে ডীন স্যারের কাছে কমপ্লেইন করে দিতে পারি? আর কোনদিন যদি দেরি করেছো...............'

সাজিদের চিন্তায় ছেদ পড়লো। তার সামনে দাঁড়ানো হালকা-পাতলা গড়নের মফিজুর রহমান নামের ভদ্রলোকটি বললেন,- 'আমিও খুব ভালো আছি।'

ভদ্রলোকের মুখে হাসির রেখাটা তখনও স্পষ্ট।

মফিজুর রহমান স্যার সাজিদকে বললেন,- 'আচ্ছা বাবা আইনষ্টাইন, তুমি কি বিশ্বাস করো আকাশ বলে কিছু আছে?'

সাজিদ এবার নিশ্চিত হলো যে এটা কোন স্বপ্নদৃশ্য নয়। মফিজুর রহমান স্যার তাচ্ছিল্যভরে সাজিদকে 'আইনষ্টাইন' বলে ডাকে। সাজিদকে যখন আইনষ্টাইন বলে, তখন ক্লাশের অনেকে খলখল করে হেসে উঠে। এই মূহুর্তে সাজিদ একটি চাপা হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছে। তাহলে এটা কোন স্বপ্নদৃশ্য নয়।বাস্তব।

সাজিদ বললো,- 'জ্বি স্যার, বিশ্বাস করি।'

ভদ্রলোক আরেকটি মুচকি হাসি দিলেন। উনি আজকে হাসতে হাসতে দিন পার করে দেবার পণ করেছেন কিনা কে জানে।

তিনি বললেন,- 'বাবা আইনষ্টাইন, আদতে আকাশ বলে কিছুই নেই।আমরা যেটাকে আকাশ বলি, সেটা হচ্ছে আমাদের দৃষ্টির প্রান্তসীমা। মাথার উপরে নীল রঙা যে জিনিসটি দেখতে পাও, সেটাকে মূলত বায়ুমন্ডলের কারণেই নীল দেখায়। চাঁদে বায়ুমন্ডল নেই বলে চাঁদে আকাশকে কালো দেখায়। বুঝতে পেরেছেন মহামতি আইনষ্টাইন?'
স্যারের কথা শুনে ক্লাশের কিছু অংশ আবার হাসাহাসি শুরু করলো।
স্যার আবার বললেন,- 'তাহলে বুঝলে তো আকাশ বলে যে কিছুই নাই?'
সাজিদ কিছুই বললো না। চুপ করে আছে।
স্যার বললেন,- 'গতরাতে হয়েছে কি জানো? নেট সার্চ দিয়ে একটি ব্লগ সাইটের ঠিকানা পেলাম। মুক্তমনা ব্লগ নামে। অভিজিৎ নামে এক ব্লগারের লেখা পেলাম সেখানে। খুব ভালো লিখে দেখলাম। যাহোক, অভিজিৎ নামের এই লোকটা কোরানের কিছু বাণী উদ্ধৃত করে দেখালো কতো উদ্ভট এইসব জিনিস। সেখানে আকাশ নিয়ে কি বলা আছে শুনতে চাও?'
সাজিদ এবারো কিছু বললো না। চুপ করে আছে।
স্যার বললেন,- 'কোরানে বলা আছে- '

'আর আমরা আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ। অথচ, তারা আমাদের নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।'
'And We made the sky a protected ceiling, but they, from its signs, are turning away - Al Ambia- 32'
দেখলে তো বাবা আইনষ্টাইন, তোমাদের আল্লাহ বলেছে, আকাশ নাকি সুরক্ষিত ছাদ। তা বাবা, এই ছাদে যাবার কোন সিঁড়ির সন্ধান কোরানে আছে কি? হা হা হা হা।'
চুপ করে থাকতে পারলে বেশ হতো। কিন্তু এই লোকটির মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়িতে সাজিদ মুখ খুলতে বাধ্য হলো।
সে বললো,- 'স্যার, আপনার সেই ব্লগার অভিজিৎ আর আপনার প্রথম ভুল হচ্ছে, আকাশ নিয়ে আপনাদের দু'জনের ধারনা মোটেও ক্লিয়ার না।'
- 'ও, তাই নাকি? তা আকাশ নিয়ে ক্লিয়ার ধারনাটি কি বলো শুনি?'- অবজ্ঞা ভরে লোকটির প্রশ্ন।
সাজিদ বললো,- 'স্যার, আকাশ নিয়ে ইংরেজি অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে বলা আছে,- 'The region of the atmosphere and outer space seen from the earth', অর্থাৎ, পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বায়ুমন্ডলের এবং তার বাইরে যা কিছু দেখা যায়, সেটাই আকাশ।
আকাশ নিয়ে আরো ক্লিয়ারলি বলা আছে উইকিপিডিয়াতে। আপনি নেট ঘেঁটে মুক্তমনা ব্লগ অবধি যেতে পেরেছেন, আরেকটু এগিয়ে উইকিপিডিয়া অবধি গেলেই পারতেন। যাহোক, আকাশ নিয়ে উইকিপিডিয়া তে বলা আছে,- 'The
sky (or celestial dome) is everything that lies above the surface of the Earth, including the atmosphere and outer space', অর্থাৎ, পৃথিবীর ভূ-পৃষ্টের উপরে যা কিছু আছে, তার সবই আকাশের অন্তর্গত। এর মধ্যে বায়ুমন্ডল এবং তার বাইরের সবকিছুও আকাশের মধ্যে পড়ে'।

- 'হু, তো?'
- ' এটা হচ্ছে আকাশের সাধারন ধারনা। এখন আপনার সেই আয়াতে ফিরে আসি।
আপনি কোরান থেকে উল্লেখ করেছেন,-
'আর আমরা আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ। অথচ, তারা আমাদের নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।'
আপনি বলেছেন, আকাশ কিভাবে ছাদ হয়, তাই না?
স্যার, বিংশ শতাব্দীতে বসে বিজ্ঞান জানা কিছু লোক যদি এরকম প্রশ্ন করে, তাহলে আমাদের উচিত বিজ্ঞান চর্চা বাদ দিয়ে গুহার জীবনযাপনে ফিরে যাওয়া।'
- 'What do u mean?'

- 'বলছি স্যার। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিজ্ঞানিরা পৃথিবীর উপরিভাগে যে বায়ুমন্ডল আছে, তাতে কিছু স্তরের সন্ধান পেয়েছেন।আমাদের পৃথিবীর বায়ুমন্ডল এসব পুরু স্তর দ্বারা গঠিত।এই স্তরগুলো হচ্ছে-
১/ ট্রপোস্ফিয়ার
২/ স্ট্রাটোস্ফিয়ার
৩/ মেসোস্ফিয়ার
৪/ থার্মোস্ফিয়ার
৫/ এক্সোস্ফিয়ার।
এই প্রত্যেকটি স্তরের আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে। আপনি কি জানেন, বিজ্ঞানি Sir Venn Allen প্রমান করে দেখিয়েছেন, আমাদের পৃথিবীর ভূ-পৃষ্টের চারদিকে একটি শক্তিশালী Magnetic Field আছে। এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমাদের পৃথিবীপৃষ্ঠের চারদিকে একটি বেল্টের মতো বলয় সৃষ্টি করে রেখেছে। বিজ্ঞানি স্যার Venn Allen এর নামে এই জিনিসটার নাম রাখা হয় Venn Allen Belt...
এই বেল্ট চারপাশে ঘিরে রেখেছে আমাদের বায়ুমন্ডলকে। আমাদের বায়ুমন্ডলের দ্বিতীয় স্তরটির নাম হচ্ছে 'স্ট্রাটোস্ফিয়ার।' এই স্তরের মধ্যে আছে এক জাদুকরি উপ-স্তর। এই উপ-স্তরের নাম হলো 'ওজোন স্তর।'
এই ওজোন স্তরের কাজের কথায় পরে আসছি। আগে একটু সূর্যের কথা বলি। সূর্যে প্রতি সেকেন্ডে যে বিস্ফোরণগুলো হয়, তা আমাদের চিন্তা-কল্পনারও বাইরে। এই বিস্ফোরণগুলোর ক্ষুদ্র একটি বিস্ফোরণের তেজস্ক্রিয়তা এমন যে, তা জাপানের হিরোশিমায় যে এ্যাটমিক বোমা ফেলা হয়েছিলো, সেরকম দশ হাজার বিলিয়ন এ্যাটমিক বোমার সমান। চিন্তা করুন স্যার, সেই বিস্ফোরণগুলোর একটু আঁচ যদি পৃথিবীতে লাগে, পৃথিবীর কি অবস্থা হতে পারে?
এখানেই শেষ নয়। মহাকাশে প্রতি সেকেন্ডে নিক্ষিপ্ত হয় মারাত্মক তেজস্ক্রিয় উল্কাপিন্ড। এগুলোর একটি আঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে পৃথিবী।
আপনি জানেন আমাদের এই পৃথিবীকে এরকম বিপদের হাত থেকে কোন জিনিসটা রক্ষা করে? সেটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর বায়ুমন্ডল।আরো স্পেশেফিকলি বলতে গেলে বলতে হয়, 'ওজোন স্তর।'
শুধু তাই নয়, সূর্য থেকে যে ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি আর গামা রশ্মি পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে, সেগুলো যদি পৃথিবীতে প্রবেশ করতে পারতো, তাহলে পৃথিবীতে কোন প্রাণীই বেঁচে থাকতে পারতো না। এই অতি বেগুনি রশ্মির ফলে মানুষের শরীরে দেখা দিতো চর্ম ক্যান্সার। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষন হতো না।আপনি জানেন, সূর্য থেকে পৃথিবীর দিকে ধেঁয়ে আসা এসব
ক্ষতিকর জিনিসকে কোন জিনিসটা আটকে দেয়? পৃথিবীতে ঢুকতে দেয় না? সেটা হলো বায়ুমন্ডলের ওজোন স্তর। এই ওজোন স্তর এসব ক্ষতিকর উপাদানকে স্ক্যানিং করে পৃথিবীতে প্রবেশে বাঁধা দেয়।
মজার ব্যাপার কি জানেন? এই ওজোন স্তর সূর্য থেকে আসা কেবল সেসব উপাদানকেই পৃথিবীতে প্রবেশ করতে দেয়, যেগুলো পৃথিবীতে প্রাণের জন্য সহায়ক। যেমন, বেতার তরঙ্গ আর সূর্যের উপকারি রশ্মি। এখানেই শেষ নয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় যে তাপমাত্রার সৃষ্টি হয়, তার সবটাই যদি মহাকাশে বিলিন হয়ে যেতো, তাহলে রাতের বেলা পুরো পৃথিবী ঠান্ডা বরফে পরিণত হয়ে যেতো। মানুষ আর উদ্ভিদ বাঁচতেই পারতো না। কিন্তু, ওজোন স্তর সব কার্বন ডাই অক্সাইডকে মহাকাশে ফিরে যেতে দেয় না। কিছু কার্বন ডাই অক্সাইডকে সে ধরে রাখে যাতে পৃথিবী তাপ হারিয়ে একেবারে ঠান্ডা বরফ শীলত না হয়ে পড়ে।বিজ্ঞানিরা এটাকে 'গ্রীন হাউস' বলে।
স্যার, বায়ুমন্ডলের ওজোন স্তরের এই যে ফর্মুলা, কাজ, এটা কি আমাদের পৃথিবীকে সূর্যের বিস্ফোরিত গ্যাস, সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি, মহাকাশীয় উল্কাপিণ্ড থেকে 'ছাদ' এর মতো রক্ষা করছে না? আপনার বাসায় বৃষ্টির পানি প্রবেশ করতে পারে না আপনার বাসার ছাদের জন্য। বিভিন্ন দূর্যোগে আপনার বাসার ছাদ যেমন আপনাকে রক্ষা করছে, ঠিক সেভাবে বায়ুমন্ডলের এই ওজোন স্তর কি আমাদের পৃথিবীকে রক্ষা করছে না?
আমরা আকাশের সংজ্ঞা থেকে জানলাম যে, - পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে উপরের সবকিছুই আকাশের মধ্যে পড়ে। বায়ুমন্ডলও তো তাহলে আকাশের মধ্যে পড়ে, এবং আকাশের সংজ্ঞায় বায়ুমন্ডলের কথা আলাদা করেই বলা আছে।
তাহলে বায়ুমন্ডলের এই যে আশ্চর্যরকম 'প্রটেক্টিং পাওয়ার', এটার উল্লেখ করে যদি আল্লাহ বলেন-

'আর আমরা আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ। অথচ, তারা আমাদের নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে',
তাহলে স্যার ভুলটা কোথায় বলেছে? বিজ্ঞান তো নিজেই বলছে, বায়ুমন্ডল, স্পেশালি বায়ুমন্ডলের ওজোন স্তর একটি ছাদের ন্যায় পৃথিবীকে রক্ষা করছে। তাহলে আল্লাহও যদি একই কথা বলে, তাহলে সেটা অবৈজ্ঞানিক হবে কেন?
আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, হয় আপনার সেই অভিজিৎ রায় বিজ্ঞান বুঝেন না, নয়তো তিনি বিশেষ কোন গোষ্ঠীর পেইড এ্যাজেন্ট, যাদের কাজ সুস্পষ্ট প্রমান থাকা সত্ত্বেও মনগড়া কথা লিখে কোরানের ভুল ধরা।'

কথাগুলো বলে সাজিদ থামলো। পুরো ক্লাশে সে এতক্ষন একটা লেকচার দিয়ে গেলো বলে মনে হচ্ছে। তাকে আইনষ্টান বলায় যারা খলখল করে হাসতো, তাদের চেহারাগুলো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।
মফিজুর রহমান স্যার কিছুই বললেন না। See u next বলে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে গেলেন সেদিন।

আয়িশা (রাঃ) ও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিয়ে এবং কথিত নাস্তিকদের কানাঘুষা

আমরা চারজন বসে টি.এস.সি তে আড্ডা দিচ্ছিলাম। রাকিব, শাহরিয়ার, সাজিদ আর আমি।

আমাদের মধ্যে শাহরিয়ার হলো খেলাপ্রেমিক। ফুটবল ক্লাব বার্সেলোনার চরম ভক্ত। কেউ পুরো সপ্তাহে কোন ম্যাচ না দেখে শাহরিয়ারের কাছে আধঘণ্টা বসলেই হবে। শাহরিয়ার পুরো সপ্তাহের খেলার আদ্যোপান্ত তাকে কাগজে-কলমে বুঝিয়ে দেবে। ইপিএলে কোন দল টপে আছে, ম্যানচেষ্টার সিটির দায়িত্ব নিয়ে পেপ গার্দিওলা কিরকম দলটাকে পাল্টে দিলো,

সিরিএ-তে জুভের অবস্থান কোথায়, ইব্রা'কে ছেড়ে দিয়ে ফ্রেঞ্চলীগে পিএসজির অবস্থা কেমন, বুন্দেসলীগাতে বায়ার্ন আর ডর্টমুন্ড কি করছে, লা-লীগাতে বার্সা-রিয়ালের দৌঁড়ে কে এগিয়ে, রোনালদোর ফর্ম নাই কেন, মেসিকে ছাড়া বার্সা সামনের ম্যাচগুলা উতরে যেতে পারবে কি না, নেইমার সেরা না বেল, সুয়ারেজ নাকি বেনজেমা ইত্যাদি ইত্যাদি বিশ্লেষণের জন্য শাহরিয়ারের জুড়ি নেই। এত কঠিন কঠিন স্প্যানিশ, জার্মেইন, ফ্রেঞ্চ আর ইতালির নামগুলো সে কিভাবে যে মনে রাখে আল্লাহ মালুম। খেলার খবর বলতে শুরু করলে তার আর থামাথামি নেই। ননষ্টপ বলে যেতে পারে। এইজন্যে আমাদের বন্ধুমহলে শাহরিয়ার 'স্পোর্টস চ্যানেল' নামে পরিচিত।

রাকিব হলো আগাগোড়া 'পলিটিক্স স্পেশালিষ্ট'।

দুনিয়ার রাজনীতি কখন কোথায় কিভাবে মোড় নিচ্ছে তার সমস্তরকম আপডেট থাকে রাকিবের কাছে। গুলির মুখ থেকে ট্রাম্পের বেঁচে আসা থেকে শুরু করে হিলারির ম্যালেরিয়া পর্যন্ত সব খবর তার নখদর্পণে। তবে, ইদানিং সে ব্যস্ত 'পাক-ভারত' যুদ্ধ নিয়ে। কাশ্মীরের উরিতে হামলা নিয়ে পাক-ভারতের মধ্যে যে যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব বিরাজ করছে, তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেই যাচ্ছে সে।রাকিব মনে করছে, উরি'র হামলাটা আসলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির একটি 'ব্লাইন্ড গেম'। তার মতে, উরি'তে যারা হামলা করেছে তারা যদি সত্যিই পাকিস্তানি হবে, তাহলে নিহত হামলাকারীদের মিডিয়ার সামনে না এনে রাতারাতি কবরস্থ করে ফেলা হলো কেন? সেই হামলাকারীদের ছবি আর পরিচয় মিডিয়ার সামনে এনে পাকিস্তানকে একঘরে করে দেবার একটি দারুন চান্স ছিলো ভারতের হাতে।কিন্তু ভারত তা করলো না কেন? কেন তারা রাতারাতি লাশগুলো সেনা ক্যাম্পেই দাফন করে ফেললো? কেন পাকিস্তানের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হলো না ইত্যাদি পয়েন্ট ধরে রাকিবের মনে সন্দেহ আছে।

যুদ্ধ যদি সত্যি লেগেই যায়, কোন পক্ষ বেনিফিটেড হবে, কার কতো সামরিক শক্তি, কে কোনদিক থেকে আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ চালাবে সেগুলোরও পয়েন্ট বাই পয়েন্ট ব্যাখ্যা দিচ্ছে সে।

আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ নিলয় দা'র আগমন। নিলয় দা আমাদের চেয়ে সিনিয়র মানুষ।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র ছিলো।

আমাদের চেয়ে ঢের সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সাথে তার বন্ধুত্বসুলভ আচরণ দেখে বোঝার উপায় নেই যে নিলয় দা এত সিনিয়র লেভেলের কেউ।

তার হাতে একটি পত্রিকা। পত্রিকা হাতে নিলয় দা আমাদের পাশে এসে বেঞ্চিতে বসলো।

নিলয় দা'কে দেখে সাজিদ আরেক কাপ রঙ চা'র অর্ডার করলো।

চা চলে এলে নিলয় দা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললো,- 'বাক স্বাধীণতার মূল্য পৃথিবীর কোথাও নেই, বুঝলি? কোথাও নেই।'

কথাগুলো এমনভাবে বললো যে, নিলয় দা'কে খুব মর্মাহত দেখালো। নিলয় দা কোন পয়েন্ট থেকে কথাগুলো বললো তা আমাদের কারো মাথাতে আসে নি তখনও। রাকিব বলে উঠলো,- 'নিলয় দা কি পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় কটুক্তির দায়ে গ্রেফতার হওয়া তারক বিশ্বাসের কথা বললে?'

নিলয় দা রাকিবের কথার প্রত্যুত্তরে কোনকিছু বললো না। তার মানে রাকিবের ধারনা ঠিক। অন্য সময় হলে রাকিবের এরকম উপস্থিত বুদ্ধির বহর দেখে নিলয় দা তার পিট চাপড়ে দিয়ে বলতো 'সাবাশ'। কিন্তু আজ খুব ফ্রাষ্টেটেড থাকায় নিলয় দা খুব অফ মুডে আছে বলে মনে হচ্ছে।

ব্যাপারটা খুব শর্টলি ব্যাখ্যা করলো রাকিব। পশ্চিমবঙ্গের এক নাস্তিক তরুণ, মহানবী সাঃ কে নিয়ে কটুক্তি করার ফলে সাইবার আইনে গ্রেফতার হয়েছে পরশুদিন। এটাকে নিলয় দা বলছে বাক স্বাধীণতার উপর আঘাত।

সাজিদ তার চা'য়ে শেষ চুমুক দিয়ে বললো,- 'এতে দোষের তো কিছু দেখছিনা দাদা। ছেলেটা দোষ করেছে, সে তার শাস্তি পাচ্ছে। What's wrong?'
নিলয় দা মুখের রঙ পরিবর্তন করে বড় বড় চোখে সাজিদের দিকে তাকালো। বললো,- 'একজন পঞ্চাশোর্ধ বুড়া লোক ৯ বছর বয়সী একটা মেয়েকে বিয়ে করলে দোষ নেই, তা নিয়ে কথা বললেই দোষ হয়ে যায়?'
সাজিদ বললো,- 'কথা বললে তো দোষ নেই দাদা, কিন্তু অশ্লীল ভাষায় কটুক্তি করাটা দোষের। একটি ধর্মের পবিত্র নবিকে নিয়ে এরকম খিস্তি করাটা মূল্যবোধ বিরোধি তো বটেই, এটা সংবিধান বিরোধিও।'
- 'গোষ্ঠি কিলাই তোমার এরকম মূল্যবোধ আর সংবিধানের।'
সাজিদ বুঝলো নিলয় দা খুব ক্ষেপে আছে। তাকে সহজে বোঝানো যাবে বলে মনে হচ্ছে না।
সাজিদ বললো,- 'দাদা, মনে আছে তোমার? আমি তখন সবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র।তোমার সাথেও প্রথম পরিচয় হয় তখন।এক সন্ধ্যায় হুমায়ুন আহমেদের মেয়ের বয়েসী শাওনকে বিয়ে করার ব্যাপারটা নিয়ে যখন আমি আপত্তি তুলেছিলাম, তুমি কি বলেছিলে? তুমি বলেছিলে,- 'বিয়ে হলো একটি বৈধ সামাজিক বন্ধন।যখন তাতে দুটি পক্ষের সম্মতি থাকে, তখন সেখানে বয়স, সামাজিক ষ্ট্যাটাস কোনকিছুই ম্যাটার করে না। হুমায়ুন আহমেদের বেলায় যে কথাগুলো প্রযোজ্য, সে কথাগুলো মুহাম্মদ সাঃ এর বেলায় কেন প্রযোজ্য হবে না?'
নিলয় দা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। এরপর বললো,- 'তাই বলে বলতে চাচ্ছিস, ৯ বছরের অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে বিয়ে করা বৈধ হয়ে যাবে?'
সাজিদ হাসলো। বললো,- 'দাদা, আমি মোটেও তা বলছি না। আমি প্রথমে বোঝাতে চাইলাম যে, বিয়ে একটা সামাজিক বন্ধন।'
- 'তো? সামাজিক বন্ধন ধরে রাখতে ৯ বছরের কিশোরি বিয়ে করতে হবে নাকি?'
সাজিদ উঠে দাঁড়ালো। আমি জানি এখন সে লেকচার শুরু করবে। রাসূল সাঃ এবং আয়েশা রাঃ এর বিয়ে নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ লেকচার দেওয়ার জন্য সে ম্যান্টালি প্রস্তুতি নিচ্ছে।
যা ভাবলাম তাই। সাজিদ বলতে শুরু করলো-

'দাদা, প্রথমে বলে রাখি, যারাই রাসূল সাঃ আর আয়েশা রাঃ এর বিয়ে নিয়ে আপত্তি তুলে, তাদের প্রথম দাবি- মুহাম্মদ সাঃ নাকি যৌন লালসায় কাতর ছিলেন।সেজন্যে তিনি নাকি কিশোরি আয়েশা রাঃ কে বিয়ে করেছিলেন। তাদের এই দাবি যে কতোটা বাতুলতা আর ভিত্তিহীন, তা ইতিহাস থেকে আমরা দেখবো। আমরা জানি, মুহাম্মদ সাঃ বিয়ে করেছিলেন ২৫ বছর বয়সে।হজরত খাদিজা রাঃ কে।
বলা বাহুল্য, যখন মুহাম্মদ সাঃ ২৫ বছরের একজন টগবগে তরুণ, ঠিক সেই সময়ে তিনি বিয়ে করলেন চল্লিশোর্ধ একজন মহিলাকে, যিনি কিনা আবার একজন বিধবা ছিলেন। খাদিজা রাঃ যতোদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন মুহাম্মদ সাঃ আর কোন বিয়ে করেন নি। খাদিজা রাঃ এর গর্ভেই মুহাম্মদ সাঃ অধিকাংশ সন্তান-সন্তনি জন্মগ্রহণ করেছিলো। বলো তো দাদা, তোমাদের ভাষায় যিনি একজন যৌন কাতর মানুষ, তিনি কেন তার পুরো যৌবনকাল একজন বয়স্ক, বয়োবৃদ্ধা মহিলার সাথে কাটিয়ে দিলেন?
তুমি হয়তো বলবে, খাদিজা রাঃ এর প্রচুর ধন-সম্পত্তি ছিলো।পাছে এগুলো হারানোর ভয়ে হয়তো তিনি আর বিয়ে করেন নি। তোমার জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি, এটা ইতিহাসসম্মত যে, সম্পদশালী খাদিজা রাঃ নিজেই মুহাম্মদ সাঃ কে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, মুহাম্মদ সাঃ নিজ থেকে দেন নি।তারউপর, খাদিজা রাঃ নিজেই যেখানে একজন বিধবা ছিলেন, সেখানে মুহাম্মদ সাঃ ও যদি সেই অবস্থায় আরেকটি বিয়ে করতে চাইতেন, তাতে বাঁধা দেওয়ার অধিকার খাদিজা রাঃ এর থাকার কথা না।
তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম? আমরা বুঝলাম যে, মুহাম্মদ সাঃ যৌন কাতরতা থেকে কিশোরি আয়েশা রাঃ কে বিয়ে করেন নি।
নিলয় দা প্রশ্ন করলো,- 'তাহলে কিশোরি আয়েশা কে বিয়ে করার হেতু কি?'
সাজিদ বললো,- 'Let me finish... আয়েশা রাঃ কে বিয়ে করার একটা হুকুম রাসূল সাঃ আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছিলেন।কারন, জ্ঞানে-গুণে আয়েশা রাঃ ছিলেন তৎকালীন আরব কন্যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তার সেই প্রজ্ঞা, সেই জ্ঞান, সেই বিচক্ষণতা যাতে পুরোপুরিভাবে ইসলামের কল্যাণার্থে ব্যবহার হতে পারে, তারজন্য হয়তো এই হুকুম।'

স্পোর্টস চ্যানেল শাহরিয়ার এতক্ষণ চুপ করে ছিলো। এবার সে বললো,- 'সাজিদ, 'রাসুল সাঃ আয়েশা রাঃ কে বিয়ে করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম প্রাপ্ত' এই কথার ভিত্তি কি?'
সাজিদ শাহরিয়ারের দিকে তাকিয়ে বললো,- 'নবিদের স্বপ্নও একপ্রকার ওহি, এটা জানিস তো?'
- 'হ্যাঁ।'
- 'বুখারির হাদীসে আছে, রাসূল সাঃ হজরত আয়েশা রাঃ কে একবার বললেন,- ' (হে আয়েশা) আমি তোমাকে দুইবার স্বপ্নে দেখেছিলাম।একটি রেশমের উপরে একটি কারো একজনের মুখচিহ্ন।আমি যখন রেশমের উপর থেকে আবরণ সরালাম, আমি দেখলাম সেটা তোমার মুখাবয়ব। তখন কেউ একজন আমাকে বললো,- ' (হে মুহাম্মদ) এটা তোমার স্ত্রী।' আমি বললাম, যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়, তাহলে এটাই হবে।'
বুখারির এই হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আয়েশা রাঃ যে নবি মুহাম্মদ সাঃ স্ত্রী হবে, সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই একটি সম্মতি।'
শাহরিয়ার আবার বললো,- 'কিন্তু তুই যে বললি, তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা ইসলামের কল্যাণার্থে ব্যবহারের জন্যই এই হুকুম, তার দলিল কি?'
সাজিদ বললো,- 'এটা তো সর্বজনবিদিত সত্য কথা। সাহাবি হজরত আবু হুরায়রা রাঃ এর পর সবচে যিনি বেশি হাদীস মুখস্থ রেখেছিলেন, তিনি হজরত আয়েশা রাঃ। শুধু তাই নয়, আয়েশা রাঃ এর ছিলো কোরানের অগাধ পান্ডিত্য।এমনকি বড় বড় সাহাবিরা পর্যন্ত তাঁর কাছে ফতোয়ার জন্য আসতো।তাঁর ফিক্বহী জ্ঞান ছিলো অসামান্য।
আবু মূসা আল আনসারি রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,- 'এমন কখনো হয়নি (ফিক্বহী বিষয়ে) আমরা কোনকিছুর সমাধানের জন্য আয়েশা রাঃ এর কাছে গেলাম কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর পাইনি।'
অর্থাৎ, আয়েশা রাঃ এর এই যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা এরজন্য তিনি আল্লাহ কর্তৃক উম্মুল মুমিনীন হিসেবে সিলেক্টেড হয়ে যান।'

এছাড়াও, তৎকালীন আরবে খুব ছোট বয়সেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেতো। তখনকার প্রেক্ষাপট ছিলো ভিন্ন। এটা ঠিক, যুগের সাথে সাথে সেটা পাল্টিয়েছে।এখন মেয়েদের অনেক চিন্তা। ক্যারিয়ার গড়ো, পড়াশুনা করো, বিদেশ যাও, উচ্চ ডিগ্রির সার্টিফিকেট নাও।
তখন আরবের মেয়েদের চাকরি করার দরকার হয়নি, বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পড়ার রীতি তখনও ছিলো না। ঘরোয়া পরিবেশে তারা ধর্মীয় জ্ঞানার্জন করতো।এরজন্য, খুব ছোট বয়সেই তাদের বিয়ের রীতি ছিলো।
তখন মেয়েদের ছোট বয়সেই যে বিয়ের রীতি ছিলো, তা আয়েশা রাঃ এর জীবনের আরেকটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায়।মুহাম্মদ সাঃ এর সাথে বিয়ের আগে আয়েশা রাঃ এর আরেকজনের সাথে বিয়ে ঠিক হয়। তার নাম ছিলো জুবায়ের। কিন্তু, আবু বকর রাঃ ইসলাম গ্রহণ করায় এই বিয়েটা ভেঙ্গে যায়। এর থেকে কি প্রমাণ হয়না তখন মেয়েদের ছোট বয়সেই বিয়ের প্রচলন ছিলো? তাছাড়া, তখনকার মক্কার কোন বিধর্মীরা এই বিয়ে নিয়ে আপত্তি তুলে নি। তারাও জানতো, এটা খুব স্বাভাবিক একটি ব্যাপার।
নিলয় দা বললো,- 'মুহাম্মদ তো এসেছিলেন রীতি ভেঙ্গে রীতি গড়ার জন্য। তিনি এই অদ্ভুত রীতি ভাঙলেন না কেন?'
সাজিদ বললো,- 'দাদা, ঠিক বলেছো। মুহাম্মদ সাঃ এসেছিলেন রীতি ভেঙে রীতি গড়ার জন্য।কিন্তু তিনি সেসব রীতি ভাঙার জন্য এসেছিলেন, যা অনৈতিক, যেমন কন্যা শিশুকে জীবন্ত দাফন।তিনি আরবের সেসব কালচার পাল্টে দিয়েছেন, যা জাহেলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু, ছোট বয়সে বিয়ে সেরকম কোন ব্যাপার নয়। বিজ্ঞান আমাদের বলে, মেয়েরা পুরুষের চেয়ে দশগুণ তাড়াতাড়ি ম্যাচিউর হয়। সেটা ফিজিক্যালি এবং ম্যাণ্টালি দুইভাবেই। তাছাড়া, তখনকার আরবে ছোট বয়সে বিয়ে হবার পরও মেয়েরা খুব নরম্যালিই সন্তান জন্ম দিতো। এটা কোন সমস্যা ছিলো না। মুহাম্মদ সাঃ এটা চেঞ্জ করার তো দরকার ছিলোই না। যা দরকার ছিলো, তা তিনি করেছেন।তুমি কি আশা করছো যে, মুহাম্মদ সাঃ কেন তৎকালীন আরবদের উটের ব্যবসা তুলে দিয়ে তাদের শেয়ার ব্যবসা শেখালেন না, কেন তিনি খেঁজুরের ব্যবসা তুলে দিয়ে সেখানে চকোলেট আর রসমালাইয়ের ব্যবসার প্রচলন করলেন না? তুমি হয়তো ভাবছো, তৎকালীন আরবের বালকদের উট চরানো থেকে মুক্তি দিয়ে

কেন মুহাম্মদ সাঃ তাদের হাতে একটি করে কম্পিউটার এবং একটি করে ফেইসবুক এ্যাকাউণ্ট খুলে দিলেন না?'
সাজিদের কথা শুনে আমি, রাকিব আর শাহরিয়ার হা হা হা হা করে হাসতে লাগলাম।সাজিদ বললো, - মানুষ মাত্রই তাঁর সমাজের সুস্থ নিয়মগুলোর সাথে মিলিয়ে চলতে বাধ্য। মুহাম্মদ সাঃ ও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না দাদা। তাছাড়া, এত অল্প বয়সে বিয়ে কেবল ১৫০০ বছর আগে ছিলো তা নয়, শিল্পবিপ্লবের পরেও অনেক উন্নত দেশে বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের সর্বনিম্ন বয়সসীমা ১০ এর নিচে ছিলো।
তাছাড়া, ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদ সাঃ এর আরো ৫০০ বছর পরে, ইংল্যান্ডের রাজা জন ৪৪ বছর বয়সে ১২ বছর বয়সী রানী ঈসাবেলাকে বিয়ে করেছিলেন। এ ব্যাপারগুলো তখনকার সমাজে,যুগে খুব স্বাভাবিক ছিলো, যেমন স্বাভাবিক সঙ্গম করে সন্তান উৎপাদন করা। তাছাড়া, উপমহাদেশেও যে খুব ছোট বয়সে বিয়ের একটি রীতি ছিলো, তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প 'হৈমন্তি' থেকেই আমরা দেখতে পাই। লেখক সেখানে দেখিয়েছেন, তখনকার সময়ে ৮ থেকে ১১ বছরের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে হতো। হৈমন্তির বিয়ের স্বাভাবিক বয়স পেরিয়ে যাওয়ায়, অর্থাৎ, ১৭ হয়ে যাওয়ায় তার শ্বাশুড়ি সেটা সবার কাছ থেকে লুকোতে চাইছিলেন। হৈমন্তিকেও মিথ্যে বলার জন্য শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এখান থেকেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের সময়েও ৮ থেকে ১১ বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে ছিলো একটি স্বাভাবিক ঘটনা।
সেই গল্পে আমরা 'পণপ্রথা'র কুফল সম্পর্কে একটি আভাস পেলেও, কোথাও কিন্তু বিয়ের বয়স নিয়ে উচ্চবাক্য দেখিনি। বরং, হৈমন্তির বয়স বেশি হয়ে যাওয়াতেই কিছুটা আপত্তি দেখা গেছে। এখান থেকে বুঝতে পারি, রবীন্দ্র আমলেও ছোট বয়সে বিয়ের একটি প্রচলন ভারতবর্ষেই মজুদ ছিলো।

সাজিদের এই লেকচারে নিলয় দা সন্তুষ্ট না। বললো,- 'দ্যাখো ভাই, যতোই ত্যানা পেঁচাও, একজন বয়োবৃদ্ধ লোক একজন ৯ বছর বয়েসি কিশোরিকে বিয়ে করেছে, এটাকে তুমি কোনভাবেই ডিফেন্ড করতে পারো না। সে প্রফেট হোক আর যাই-ই হোক।
আমি ভাবলাম, এইবার সাজিদ পরাজিত হবে। হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশ গলায় বলবে,- 'নাহ! আর পারলাম না দাদা।'
কিন্তু না। সাজিদের মধ্যে আমি তেমন কিছুই দেখলাম না। সে খুব স্বাভাবিক। মুচকি একটি হাসির রেখা তার ঠোঁটে। সে আরেক কাপ চা'য়ের অর্ডার করলো।
চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললো,- 'দাদা, ছাত্রলীগের নতুন কমিটিতে পদ পেয়েছো শুনলাম।'
নিলয় দা বললো,- 'হুম, সাহিত্য সম্পাদক।'
সাজিদ বললো,- 'নতুন একটি আইন হলো শুনলাম। বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবার নিয়ে কেউ কটুক্তি করলেই ধরা হবে নাকি?'
- 'হ্যাঁ। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কটুক্তি করলে তো সেটা সহ্য করা হবে না।'
- 'তা ঠিক। বঙ্গবন্ধু তো তোমাদের আইডল।'
নিলয় দা বললো, - 'আমাদের আইডল কি রে? বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির আইডল।'
- 'জ্বি, সেটাই দাদা। আচ্ছা দাদা, তুমি জানো, বঙ্গবন্ধুর স্ত্রীর নাম কি ছিলো?'
নিলয় দা অবাক হবার ভঙ্গি করে বললো,- 'কিসব বলছিস তুই? জানবো না কেন? বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা বেগম।'
সাজিদ বললো,- 'দাদা, তুমি জানো, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা'র জন্ম কোন সালে?'
নিলয় দা কিছুক্ষণ ভাবলেন। বললেন, - 'ভুলে গেছি রে! বিসিএসের জন্য যখন প্রিপারেশান নিচ্ছিলাম, তখন পড়েছিলাম।'
সাজিদ তার ফোন বের করে সেখান থেকে উইকিপিডিয়ায় 'বেগম ফজিলাতুন্নেসা' লিখে সার্চ দিলো। উইকিপিডিয়া রেজাল্ট দেখালো বেগম ফজিলাতুন্নেসা'র জন্ম ১৯৩০ সালে।সাজিদ সেটা নিলয় দা'কে দেখালো।
নিলয় দা বললো,- 'হুম, মনে পড়েছে। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? হঠাৎ এই ব্যাপারে চলে গেলি কেন?'
সাজিদ বললো,- 'দাদা, তুমি জানো, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা'র সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কতো সালে বিয়ে হয়?'

নিলয় দা 'না' সূচক মাথা নাড়লো। সাজিদ আবার উইকি থেকে দেখালো। বঙ্গবন্ধুর সাথে বেগম ফজিলাতুন্নেসা'র বিয়ে হয় ১৯৩৮ সালে।
সাজিদ বললো,- ' দাদা, ১৯৩৮ থেকে ১৯৩০ বাদ দিলে কতো থাকে?'
নিলয় দা বললো,- ' ৮ '...
সাজিদ বললো,- 'জ্বি দাদা, একদম ঠিক বলেছো। ১৯৩৮ থেকে ১৯৩০ বাদ দিলে থাকে ৮। ঠিক ৮ বছর বয়সের বেগম ফজিলাতুন্নেসা'র সাথে বঙ্গবন্ধুর বিয়ে হয়। আচ্ছা দাদা, আমি কি এটাকে বাল্য বিবাহ বলতে পারবো? বলতে পারবো, শেখ মুজিব একজন যৌন কাতর পুরুষ ছিলেন যার ফলে তিনি মাত্র ৮ বছর বয়সের ফজিলাতুন্নেসাকে বিয়ে করেছেন? আমি এরকম বললে আমার বিরুদ্ধ্যে কি মামলা হওয়া উচিত দাদা?
বলো তো, একবিংশ শতাব্দীর শেখ মুজিবুর রহমান যেটা পেরেছেন, মাত্র ৮ বছর বয়েসী একজন কিশোরিকে বিয়ে করে এতগুলো সন্তান জন্ম দিতে পারলে ১৫০০ বছর আগের মুহাম্মদ সাঃ কেন পারবে না? কেন তাকে ধর্ষক, যৌন কাতর, যৌন লিপ্সু ডাকা হবে? তাঁকে এবং আয়েশা রাঃ কে নিয়ে অশ্লীল কথা লিখে কেউ আইনের জালে ফাঁসলে তাঁর জন্য কেন তোমার মন কাঁদবে যেখানে তুমি শেখ মুজিবের জন্য তৈরি করে রেখেছো সাইবার আইন?'
আকাশ থেকে পড়লে যা হয়, নিলয় দা'র অবস্থাও তখন তেমন। নিলয় দা এরকম একটা জবাব পাবেন তা হয়তো কল্পনাও করে নি।
-
চা'য়ের বিল দেওয়ার জন্য সাজিদ এগিয়ে গেলো। গম্ভীর, রাজনীতিপ্রিয় রাকিব এসে বললো,- 'দোস্ত, পরানটা ঠান্ডা করে দিয়েছিস একদম। বিলটা আমায় দিতে দে, প্লিজ?'
সাজিদ মুচকি হাসলো।

সাজিদ একটি মজার গল্প বলতে শুরু করলো। গল্প বলার আগে কয়েকবার ঝেঁড়ে কেশে নিলো সে।
সাজিদ যখন কোন গল্প বলতে শুরু করে, তখন সে গল্পটির একটি সুন্দর নাম দেয়। এখন সে যে গল্পটি বলতে শুরু করেছে, সেটার নাম 'নিউটন- আইনষ্টাইন সমঝোতা এবং বোকা আইনষ্টাইনের বিজ্ঞানী হাবলুর কাছে নতিস্বীকার'।
এইখানে নিউটন আর আইনষ্টাইনকে তো চিনিই, কিন্তু বিজ্ঞানী হাবলুটা যে আসলে কে, সেটা ঠিক বুঝলাম না প্রথমে। না বুঝলেও কিছু করার নেই।গল্প শুরু না হলে সাজিদকে এ নিয়ে প্রশ্ন করাও যাবে না। এটা তার গল্প ক্লাশের প্রাথমিক শর্ত।
শুধু যে এটা বুঝিনি তা নয়। আরেকটি ব্যাপারও বুঝলাম না। গল্পের নামে বলা হলো 'নিউটন-আইনষ্টাইনের সমঝোতা।' বিজ্ঞানি নিউটনের সাথে তো বিজ্ঞানি আইনষ্টাইনের কোনদিন সাক্ষাতও হলো না। দু'জন সম্পূর্ণ দুই প্রজন্মের। তাদের মধ্যে তাহলে সমঝোতাই কিভাবে হোলো? মনের মধ্যে প্রশ্ন দুটো কুটকুটানি শুরু করে দিলো। না পারছি চেপে রাখতে, না পারছি উগরে দিতে।

সাজিদ গল্প বলা শুরু করলো। সাজিদের গল্প ক্লাশে উপস্থিত আছি আমি, রাব্বি, রোহান, মোস্তফা আর সবুজ। আমাদের মধ্যে রোহান নাস্তিক টাইপের। পুরোপুরি নাস্তিক নয়, এগনোষ্টিক বলা যেতে পারে। তার ধারনা, মুহাম্মদ সাঃ নিজের কথাগুলোকে ইশ্বরের বাণী বলে চালিয়ে দিয়েছে।
যাহোক, আজকে কোরানের বিশুদ্ধতা প্রমানের জন্য তারা বসে নি। গল্প শুনতে বসেছে। এই সপ্তাহে সাজিদ গল্প বলবে। এর পরের সপ্তাহে আরেকজন। তারপরের সপ্তাহে আরেকজন, এভাবে।
সাজিদ বলতে শুরু করলো, -

'আজকে বলবো মহাকাশ নিয়ে গল্প। মহাকাশ নিয়ে বলার আগে বলে নিই,
তখনও Astronomy তথা জ্যোতির্বিদ্যা পদার্থবিদ্যার আওতাভুক্ত হয়নি। অনন্ত মহাকাশ নিয়ে বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলো ব্যাপক রকম মতপার্থক্য।
এই জিনিসটা পদার্থবিদ্যার আওতায় আসার আগে এটা ফিলোসপির বিষয় ছিলো। কারো ধারনা ছিলো মহাকাশ অসীম, মানে মহাকাশের কোন শেষ নেই। কারো ধারনা ছিলো মহাকাশ অসীম নয়, মহাকাশ সসীম। এটি একটি নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ।
এ দুয়ের বাইরে গিয়ে আরেকদল মনে করতো, মহাকাশ অসীম, তবে স্থির। অর্থাৎ, এর নির্দিষ্ট সীমা নেই ঠিক, কিন্তু এটি স্থির।
বিজ্ঞানী নিউটনও তৃতীয় ধারনাটির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত 'মহাকর্ষীয় তত্ব' আবিষ্কার করে তখন বিজ্ঞানী মহলে ব্যাপক হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু, এত জনপ্রিয় একটি তত্বের মধ্যে খুবই সুক্ষ্ম একটি ঘাপলা রয়ে গিয়েছিলো।'
নিউটনের সূত্রের মধ্যে ঘাপলা ছিলো শুনে ম্যানেজমেণ্টের ছাত্র রাব্বি তার চোখজোড়া বড় বড় করে বললো,- 'বলিস কি? প্রতিষ্ঠিত সূত্রের মধ্যে ঘাপলা? এরকমও হয় নাকি?'
সাজিদ বললো,- 'হ্যাঁ।'
- 'কি রকম ঘাপলা?'- রাব্বির পাল্টা প্রশ্ন।
সাজিদ বললো,- ' নিউটনের সূত্র মতে, মহাবিশ্বের বস্তুগুলো একে-অপরকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু ঘাপলা হচ্ছে, যদি এমনটি হয়, তাহলে মহাশূন্যের বস্তুগুলো নির্দিষ্ট একটি পয়েণ্টে এসে মিলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবার কথা। এমনটি হয়না কেন?'
সমাজতত্বের ছাত্র সবুজ বললো, - তাই তো। নিউটন এর কি ব্যাখ্যা দিয়েছে?'
সাজিদ বললো,- 'নিউটনের কাছে এর কোন ব্যাখ্যা ছিলো না। এই ব্যাপারটা পরে ক্লিয়ার করেছে বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন, তার বিখ্যাত 'Theory Of Relativity' দিয়ে। আইনষ্টাইন নিউটনের অমীমাংসিত প্রশ্নের সমাধানে বলেছেন, এরকম হতো, যদি Time আর Space শাশ্বত বা পরম হতো। কিন্তু Time আর Space কখনোই

পরম নয়।এই বিখ্যাত তত্ব দিয়ে বিজ্ঞানি আইনষ্টাইন বিজ্ঞানকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এক নতুন জগতের সাথে। সেই জগতটির নাম 'আপেক্ষিকতার জগত।'

রাব্বি বললো,- 'ও আচ্ছা, এইজন্যে গল্পের নাম দিয়েছিস 'নিউটন-আইনষ্টাইনের সমঝোতা', তাই না?'

সাজিদ মুচকি হাসলো। আমি একটা সুযোগ পেলাম প্রশ্ন করার। জিজ্ঞেস করলাম,- 'কিন্তু বিজ্ঞানি হাবলুটা আসলে কে?'

সাজিদ আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিলো না। সে আবার গল্প বলতে শুরু করলো-

আইনষ্টাইনের এই আপেক্ষিকতার সূত্র ধরে, রাশিয়ান পদার্থবিদ আলেকজান্ডার ফ্রিদম্যান দাবি করেন যে, এই মহাবিশ্ব স্থির নয়, এটি একটি ক্রমবর্ধমান মহাবিশ্ব। স্যার আলেকজান্ডার ফ্রিদম্যান সাধারন ধারনা করেছিলেন বটে, কিন্তু যথেষ্ট ব্যাখ্যার অভাবে তার কথা বিজ্ঞানী মহল তখন আমলে নেয় নি।এরপর বেলজিয়ামের বিজ্ঞানি Georges Lemaître সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী মহলকে একটি শক্ত শক খাওয়ালেন। তিনি বললেন, এই মহাবিশ্ব একটি ক্ষুদ্র পরমাণু কণা, যাকে Super Atom বলা হয়, এর বিস্ফোরনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে, এবং রাশিয়ান বিজ্ঞানী স্যার আলেকজান্ডার ফ্রিদম্যানের সাথে সুর মিলিয়ে বললেন, মহাবিশ্ব স্থির নয়, এটি ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। বলা বাহুল্য, Georges Lemaître এর এসব দাবিরও ভিত্তি ছিলো আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতার সেই সূত্রটি।'

মোস্তফা জিজ্ঞেস করলো,- ' Georges Lemaître এর এটিই কি আমাদের সেই Big Bang Theory? '

সাজিদ বললো,- 'হ্যাঁ। এটিই হলো বিগ ব্যাং থিওরি। কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানিস,

বিজ্ঞানী Georges Lemaître আইনষ্টাইনের সূত্রকে ভিত্তি করে এই দাবি করলেও আইনষ্টাই নিজেই Georges Lemaître এর এই দাবিকে নাকচ করে দেয়।'

রাব্বি বললো,- 'বলিস কি? কেন?'

সাজিদ বললো,- 'হ্যাঁ। মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে, এটা আইনষ্টাইন মেনে নিতে পারে নি। তিনি বললেন, Lemaître তার ব্যাখ্যাতে ম্যাথমেটিক্যালি প্রচুর ভুল করেছেন। আইনষ্টাইন আরো বললেন, - মহাবিশ্ব অসীম হলেও এটি সম্প্রসারিত হচ্ছে- এটি ভুল ব্যাখ্যা।

সে যাহোক, এই হলো বিজ্ঞানীদের মধ্যে আর্গুমেন্ট। কিন্তু তাদের এই তর্কাতর্কিতে না জড়িয়ে, আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল বিজ্ঞানী মহলে একটি বোম ফাটালেন।'

আমি বললাম,- 'ও আচ্ছা, তুই বিজ্ঞানী হাবলকেই হাবলু বলেছিলি বুঝি?'

সাজিদ আবারো মুচকি হাসলো। বললো,- 'হ্যাঁ। শোন কি হলো, ১৯২০ সালে বিজ্ঞানী এডউইন হাবল ওরফে বিজ্ঞানি হাবলু একটি টেলিস্কোপ আবিষ্কার করে ফেললো। এই টেলিস্কোপটিই রাতারাতি পাল্টে দিলো তখনকার জ্যোতির্বিজ্ঞান জগতকে। মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরিতে বিজ্ঞানি হাবল তাঁর আবিষ্কৃত টেলিস্কোপ দিয়ে প্রমাণ করে দেখালেন যে, আমাদের মহাবিশ্বের ছায়াপথগুলো ক্রমাগত একটি অন্যটি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তিনি এটি প্রমান করেন Doppler Effect থিওরি দিয়ে।Doppler Effect হলো এই- মহাবিশ্বের বস্তুগুলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যদি আলোকতরঙ্গের উপর ফেলা হয়, তাহলে তরঙ্গ যদি লাল আলোর দিকে সরে আসে, তাহলে বুঝতে হবে ছায়াপথগুলো একটি অন্যটি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, যদি তা না করে সেটা নীল আলোর দিকে সরে যায়, তাহলে বুঝতে হবে, ছায়াপথগুলো একটি অন্যটি থেকে দূরে সরে না গিয়ে,বরং কাছাকাছি চলে আসছে। বারবার এই পরীক্ষাটি করে প্রমাণ করা হয় যে, ছায়াপথগুলো একটি অন্যটির কাছাকাছি নয়, বরং একটি অন্যটি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ১৯৫০ সালে মাউন্ট পালমারে সে সময়ের সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপ বসিয়ে এই ব্যাপারটি আরো নিখুঁতভাবে অভজার্ভ করে বিজ্ঞানিরা। হাবলের এই দাবির সাথে বিজ্ঞানি Georges Lemaître এর দাবি সম্পূর্ণ মিলে যায়।এবং সেই এক্সপেরিমেন্ট থেকে বোঝা যায়, মোটামুটি ১০-১৫ বিলিয়ন বছর আগে একটি ক্ষুদ্র কণা থেকেই আজকের মহাবিশ্বের সৃষ্টি। মজার ব্যাপার হলো, যে আইনষ্টাইন বিশ্বাস করতেন যে, মহাবিশ্ব অসীম হলেও স্থির, সম্প্রসারিত হচ্ছেনা, বিজ্ঞানি Georges Lemaître এর থিওরিকে ভুল বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই আইনষ্টাইনই পরে নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়ে বললেন,- 'বিজ্ঞানি হাবল এবং Georges Lemaître এর দাবিই সত্য।মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে।

তিনি বিজ্ঞানি Georges Lemaître এর কাছে অনুতপ্ত হন এবং নিজের ভুলকে ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় ভুল দাবি করেন।

এখন বিজ্ঞানি মহলে এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হয়েই চলেছে আজ অদ্যাবধি।'

এতটুক বলে সাজিদ থামলো। আমরা এক নিশ্বাঃসে বিজ্ঞানের একটি মজার অধ্যায় থেকে ভ্রমণ করে এলাম। এবার সাজিদ আমাদের মধ্যে যে এগনোষ্টিক, যে বিশ্বাস করে যে, কোরান মুহাম্মদ সাঃ এর নিজের কথা, তার দিকে ফিরলো।

বললো,-, 'রোহান, বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে তুর এসব অবশ্যই জানা থাকার কথা,তাই না?'

রোহান বললো,- 'হ্যাঁ। জানি।'

- 'মাত্র গত শতাব্দীতে বসে আইনষ্টাইনও যে মহাবিশ্ব নিয়ে ভুল জানতেন, তা তো তুই জানিস, তাই না?'

- 'হ্যাঁ।'

- 'বিজ্ঞানি Georges Lemaître আর বিজ্ঞানি হাবলের আগে এই জিনিস তাবৎ দুনিয়ার কেউই জানতো না, ঠিক না?'

- 'হ্যাঁ।'- রোহানের স্বীকারোক্তি।

সাজিদ বললো,- 'আচ্ছা রোহান, আমি যদি বলি, তাদের অনেক অনেক অনেক আগে, তাদের প্রায় সাড়ে ১৩০০ বছর আগে একজন ব্যক্তি এসব কথা বলেছে, তুই বিলিভ করবি?'

রোহান চিৎকার করে বললো,- 'Impossible, Quite Impossible... '

সাজিদ তখন বললো,- 'শোন রোহান, কোরানের সূরা আয-যারিয়াতের ৪৭ নাম্বার আয়াতে আছে 'আমরা নিজ হাতে আসমানকে সৃষ্টি করেছি এবং এটাকে সম্প্রসারিত করে চলেছি।'

এখানে আয়াতের শেষে আসমানের সম্প্রসারণ বুঝাতে যে 'মূসিউন' শব্দ আছে, সেটি একটি সক্রিয় বিশেষণ। চলমান ক্রিয়া নির্দেশক, যা নির্দেশ করে কোন কাজ অতীতকাল থেকে শুরু হয়ে বর্তমান অবধি চলছে এবং ভবিষ্যতেও তা হয়ে চলবে। অর্থাৎ, আল্লাহ বলছেন,তিনি মহাবিশ্বকে (এখানে আসমান = মহাবিশ্ব) নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন, এবং সেটাকে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করেই চলেছেন। ঠিক এই কথাগুলোই বিজ্ঞানি Georges Lemaître এবং বিজ্ঞানি হাবল আমাদের গত শতাব্দীতে জানিয়েছেন। বল তো, আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে, মরুভূমিতে উট চড়ানো এক বালক এমন একটি কথা কিভাবে বললো, যা আধুনিক বিজ্ঞান প্রমান করেছে মাত্র ১৯২৯ সালে? এই কথা না বাইবেলে ছিলো না ইঞ্জিলে। না ছিলো কোন গ্রিক পুরাণে, না কোন মিথোলজিতে। মহাকাশের এমন একটি একটি রহস্যময় ব্যাপার মক্কার একজন নিরক্ষর, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন লোক মুহাম্মদ সাঃ কোথায় পেলেন? বল তো?'

অন্যান্য সময় হলে রোহান বলতো, মুহাম্মদ বাইবেল থেকে চুরি করেছে, নয়তো বলতো কোন গ্রিক পুরাণ থেকে মেরে দিয়েছে, কিন্তু সাজিদের বিস্তারিত গল্প শোনার পর তার এই দাবি যে ধোপে টিকবেনা, সে সেটা বুঝতে পারলো।

সাজিদ বললো,- ' এটা কি সম্ভব নিরক্ষর মুহাম্মদ সাঃ এর দ্বারা যদি কোন ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ তাতে না থাকে?'

রোহান মাথা নিঁচু করে বললো,- 'নাহ।'

সাজিদ বললো,- 'তাহলে প্রমাণ হলো, কোরান মুহাম্মদ সাঃ এর লেখা নয়, এটি একটি ঐশ্বরিক কিতাব, যা নাজিল হয়েছে মুহাম্মদ সাঃ এর উপর।'

রোহান কিছু বললো না। তাকে কিছুটা চিন্তিত দেখালো। সম্ভবত সে বুঝতে পেরেছে যে, চোরের দশদিন, গেরস্থের একদিন।

স্রষ্টা যদি দয়ালুই হবেন তাহলে জাহান্নাম কেন?

– 'আচ্ছা সাজিদ, সৃষ্টিকর্তা কি দয়ালু নাকি পাষাণ?'- দেবজিৎ দা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সাজিদকে জিজ্ঞেস করলো।
আমার পাশে বসা ছিলো মিজবাহ। সে বললো, 'অদ্ভুত তো! সৃষ্টিকর্তা পাষাণ হবেন কেন? উনি হলেন রাহমানুর রহিম। পরম দয়ালু।'

দেবজিৎ দা মিজবাহর দিকে তাকালেন। এরপরে বললেন, 'মিজবাহ, সৃষ্টিকর্তা যদি পরম দয়ালুই হবেন, তাহলে তিনি তার সৃষ্টিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কেন নরক, আই মিন জাহান্নামের মতো জিনিস বানিয়ে রেখেছেন?'

মিজবাহর চটপটে উত্তর, 'এটা কোন প্রশ্ন হলো দাদা? কেউ যদি সৃষ্টিকর্তার কমান্ড ফলো না করে,তাহলে তাকে যদি শাস্তি দেওয়া হয়, সেটা কোনভাবেই সৃষ্টিকর্তাকে পাষাণ প্রমাণ করে না।'
মিজবাহর এই উত্তর দেবজিৎ দা'কে সন্তুষ্ট করেছে বলে মনে হচ্ছে না। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করতে যাবেন, ঠিক এই সময় সাজিদ বলে উঠলো, 'দাদা, আজকের পত্রিকা পড়েছ?'

দেবজিৎ দা বললেন, 'না। কেন?'
– 'একটা নিউজ আছে।'
– 'কি নিউজ?'

সাজিদ দেবজিৎ দা'র দিকে পত্রিকাটা এগিয়ে দিলো। পত্রিকার একদম প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে শিরোনাম– 'সোনাগাজীতে ৯ বছরের বালিকাকে ৫ জন মিলে গ্যাং রেপ।'

বিস্তারিত অংশে যা লিখা আছে তার সারমর্ম এরকম–
'নোয়াখালীর সোনাগাজীতে ৯ বছরের এক বালিকাকে স্কুল থেকে ফেরার পথে ৫ জন যুবক মিলে ধর্ষণ করেছে। ধর্ষণের পর তারা মেয়েটিকে আহত অবস্থায় ধান ক্ষেতে ফেলে যায়। মেয়েটিকে খুব গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। শুধুই ধর্ষণ নয়, মেয়েটির শরীরের বিভিন্ন অংশ ব্লেড দিয়ে কাটাও হয়েছে। প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হয়েছে। মেয়েটি এখন পুরোটাই কোমার মধ্যে আছে। ধর্ষণকারীদের গ্রামের লোকজন আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছে।জানা গেছে, মেয়ের বাবা এলাকার মেম্বার। মেম্বারের উপর সালিশ বিষয়ক কোন এক ব্যাপারে ক্ষোভ থেকেই উনার মেয়ের উপরে এই নির্যাতন চালায় ওরা।'
ঘটনাটা গতকালের। পত্রিকায় ছোট্ট মেয়েটির একটি ছবিও দেওয়া আছে। কি ফুটফুটে চেহারা।

দেবজিৎ দা নরম মনের মানুষ। এরকম একটি খবর পড়ার পরে উনার মনটা মুহূর্তেই বিষণ্ণতায় ছেঁয়ে গেলো। দাঁতে দাঁত খিচে অনেকক্ষণ অই ৫ জন ধর্ষণকারীদের গালাগাল দিলেন।

সাজিদ পত্রিকাটা ব্যাগে রাখতে রাখতে বললো, 'দাদা, ধরো, এই ৫ জনকে কোর্টে তোলা হলো আর তুমি হলে বিচারক। এই ৫ জন যে আসল অপরাধী তার সমস্ত রকম তথ্য–প্রমাণ তোমার কাছে পেশ করা হয়েছে। এখন একজন নাবালিকার উপরে এরকম নির্মমভাবে নির্যাতন করার জন্য তুমি কি তাদের শাস্তি দিবে?'

দেবজিৎ দা দাঁত মুখ খিচে বললেন, 'শাস্তি দিবো মানে? শুয়োরের বাচ্চাগুলোকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবো।'

সাজিদ মুচকি হাসলো। বললো, 'সত্যিই তাই?'
– 'হ্যাঁ, একদম। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে এদের মাংশ শেয়াল–কুকুর দিয়ে খাওয়াতে পারলেই আমার গা জুড়োবে।'

দেবজিৎ দা'র চোখ মুখ লালবর্ণ ধারণ করেছে। উনাকে এরকম অবস্থায় আগে কখনো দেখি নি।

সাজিদ এক গ্লাস পানি উনার দিকে বাড়িয়ে দিলো। পানিটা ঢকঢক করে পান করে উনি শার্টের হাতাতে মুখ মুছলেন। উনি তখনও প্রচন্ড রেগে আছেন বোঝা যাচ্ছে।

সাজিদ বললো, ‘আমি যে দেবজিৎ দাদাকে চিনি, সে কিন্তু এতোটা হিংস্র না। আমি তাকে জানতাম দয়ালু, ক্ষমাশীল, মহানুভব হিসেবে। সে যে কাউকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবার কথাও ভাবতে পারে, সেটাই বিরাট আশ্চর্য লাগছে।’

দেবজিৎ দা সাজিদের দিকে তাকালেন।তাকানোতে একটা তাচ্ছিল্যতা আছে।

বললেন, ‘শোন সাজিদ, আমি দয়ালু,মহানুভব ঠিক আছে। কিন্তু তার মানে এই না যে আমি কোন অন্যায় দেখে চুপ করে থাকবো। আমার ক্যারেক্টারের ক্রাইটেরিয়াতে যেমন দয়ালু, মহান,উদার এসব আছে, ঠিক তেমনি আমি ন্যায়বিচারকও। অন্যায়ের কোন প্রশ্রয় আমার কাছে নেই।’

– ‘বিচারক হিসেবে তুমি চাইলেই অই ৫ জন অপরাধীকে ক্ষমা করে দিতেই পারো।’– সাজিদ বললো।
– ‘হ্যাঁ পারি। কিন্তু তাহলে যে অই নিষ্পাপ মেয়েটার সাথেই অন্যায় করা হবে। অবিচার করা হবে। আমি সেটা পারবো না।’
– ‘তাহলে কি ধরে নেবো যে তুমি পাষাণ? কঠিন হৃদয়ের? তোমার মাঝে কোন ভালোবাসা নেই, মমতা নেই?’

দেবজিৎ দা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, ‘আশ্চর্য! তোর বুদ্ধিসুদ্ধি কি সব লোপ পেয়েছে রে সাজিদ? ৫ জন লোক ঘোরতর অন্যায় করেছে। তাদের অন্যায়ের জন্য আমি তাদের শাস্তি দিবো এটাই স্বাভাবিক। একজন বিচারক হিসেবে এখানে ন্যায়ের পক্ষ নেওয়াই আমার ধর্ম, আমার প্রেম, আমার ভালোবাসা। এটা কি প্রমাণ করে যে আমি পাষাণ?’
সাজিদ আবার মুচকি হাসলো। বললো, ‘দাদা, তোমাকে উত্তেজিত করার জন্য দুঃখিত। না, তুমি আসলেই খুব ভালো।

সৃষ্টিকর্তা যেমন পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল, ঠিক তেমনি তিনি আবার একজন ন্যায় বিচারকও। তিনি কারো সাথে বিন্দু পরিমাণও অন্যায় হতে দেন না। সৃষ্টিকর্তা আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট রুলস তৈরি করে দিয়েছেন। এখন কিছু লোক এই রুলস ফলো করে যদি তার দেওয়া বিধান মতো জীবনযাপন করে, তাদের তিনি পুরষ্কার হিসেবে জান্নাত দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। এখন একদল লোক নামাজ–কালাম পড়ে, মিথ্যে কথা বলে না, লোক ঠকায় না, চুরি রাহাজানি করেনা, সুদ–ঘুষ খায়না, মানুষ খুন করেনা, মোদ্দাকথা, সকল প্রকার অন্যায় থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখে কেবল স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ এবং তাঁর প্রতিশ্রুত জান্নাতের জন্য।

অপরদিকে আরেকদল লোক এসবের থোড়াই কেয়ার করে যদি ভোগ বিলাসে মেতে উঠে, সকল অন্যায় কাজ করে, স্রষ্টার অবাধ্য হয়, তাহলে স্রষ্টা যদি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে আগের দলের সাথে জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে এটা কি ন্যায় হলো? প্রথম দলকে তো ঠকানো হলোই, সাথে কি পরের দলের সকল অন্যায়কে মেনে নেওয়া হলো না? প্রশ্রয় দেওয়া হলো না? তুমি যেভাবে বিচারকের আসনে বসে ক্ষমতা থাকার পরও অই ৫ জনকে ক্ষমা করে দিতে পারো না কেবল ন্যায় প্রতিষ্টার জন্য, স্রষ্টাও কি সেটা পারেন না?’

দেবজিৎ দা কিছু বললেন না। সাজিদ আবার বললো, ‘এটা হলো স্রষ্টার ক্রাইটেরিয়া। তিনি যেমন পরম দয়ালু, ঠিক সেরকম ন্যায় বিচারকও।

আরেকটু ক্লিয়ার করি। ধরো, একজন বাবার দুটি সন্তান। দুই সন্তানের প্রথমজন দ্বিতীয়জনকে বিনা কারণেই ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলো। যাকে ধাক্কা দিলো সে মাটিতে পড়ে খুব ব্যথা পেলো এবং চিৎকার করে কেঁদে উঠলো।

এখন বাবা এসে যদি প্রথমজনকে তার অন্যায়ের জন্য কোন শাস্তি না দেয়, তাহলে সেটা তার দ্বিতীয় সন্তান, যে নিষ্পাপ,তার প্রতি কি অন্যায় করা হবে না?'
– 'হু'– দেবজিৎ দা বললেন।
– 'স্রষ্টা এরকম নন। এইজন্যই তিনি জান্নাত আর জাহান্নাম দুটোই তৈরি করে রেখেছেন। আমাদের কর্মফলই নির্ধারণ করে দেবে আমাদের গন্তব্যস্থল। এতে কোন দুই নাম্বারি হবে না।কারো সাথে চুল পরিমাণও অন্যায় হবে না।'
দেবজিৎ দা বললেন, 'তা বুঝলাম। কিন্তু তিনি যেহেতু স্রষ্টা, তিনি আমাদের চেয়ে হাজারগুণ দয়ালু হবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই তিনিই আবার আমাদের কর্ম পরিচালনা করছেন আবার তিনিই আমাদের ধরে ধরে জাহান্নামে পাঠাচ্ছেন। ব্যাপারটা কেমন না সাজিদ?'

সাজিদ বললো, 'দাদা, প্রথমত, স্রষ্টা আমাদের কর্ম পরিচালনা করেন না। স্রষ্টা আমাদের একটা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সাথে পাঠিয়েছেন একটা গাইডবুক।এখন এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করেই আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে আমরা কি তাঁর দেখানো পথে চলবো কি চলবো না। যদি চলি, আমরা জান্নাতে যাবো। যদি না চলি, আমরা জাহান্নামে যাবো। মোদ্দাকথা, আমরা কোথায় যাবো তা আমরাই নির্ধারণ করি আমাদের কর্মের মাধ্যমে।'

দেবজিৎ দা হাসলেন। বললেন, 'ও আচ্ছা। তার মানে তুই বলতে চাচ্ছিস যে কিছু লোক স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে জাহান্নাম চুস করে নিচ্ছে?'

– 'হ্যাঁ।'
– 'উদ্ভট না কথাটা?'
– 'একদম না।'
– 'লজিক্যালি বল।'
– 'আচ্ছা। ধরো, তুমি গভীর সাগরে জাহাজ থেকে পানিতে পড়ে গেলে। পানিতে তুমি হাঁশপাস করছো।একটু পরেই অতল তলে তলিয়ে যাবে। এখন ধরো, তোমাকে উদ্ধার করার জন্য আমি একটি লাইফ জ্যাকেট তোমার দিকে বাড়িয়ে দিলাম।'
– 'হু,তো?'
– 'সেই মূহুর্তে তোমার কাছে দুটি অপশান। হয় লাইফ জ্যাকেটটি নিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবে নয়তো, আমাকে ডিনাই করবে আর অতল সাগরে তলিয়ে যাবে এবং মৃত্যুবরণ করবে।

খেয়াল করো, আমি কিন্তু বাঁচার উপকরণ,অর্থাৎ লাইফ জ্যাকেট তোমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছি। এখন তুমি তোমার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে জ্যাকেটটি গ্রহণ করে প্রাণে বাঁচবে নাকি ডিনাই করে মৃত্যুকে বরণ করবে সেটা সম্পূর্ণ তোমার ব্যাপার। স্রষ্টাও জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপকরণ আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন। সাথে আমাদের ফ্রি উইল দিয়ে দিয়েছেন।এখন, আমরা তা আঁকড়ে ধরে বাঁচবো নাকি উপেক্ষা করে মরবো তা আমাদের উপর নির্ভর করছে।'
দেবজিৎ দা কিছু বললেন না। স্রষ্টা দয়ালু হয়েও কেন জাহান্নাম তৈরি করেছেন তার উত্তর তিনি মনে হয় পেয়ে গেছেন। চায়ের বিল পরিশোধ করে এসে দেবজিৎ দা বললেন, 'স্রষ্টা যেহেতু আমাদের চেয়ে অনেক বেশি দয়ালু, তিনি কিন্তু চাইলেই পারেন ক্ষমা করে দিতে।'

সাজিদ বললো, 'স্রষ্টা শুধু তোমার চেয়ে অনেক বেশি দয়ালুই নন, তোমার চেয়ে অনেক বেশি ন্যায়বিচারকও। সুতরাং......'

সাজিদকে আর কিছুই বলতে দিলেন না দেবজিৎ দা। মনমরা করে বললেন, 'বুঝেছি।'?

সাজিদ হাসলো। দেবজিৎ দা'র এই চাহনি দেখে আমাদেরও হাসি পেলো। আমরাও হাসলাম। আমাদের হাসতে দেখে তিনিও আমাদের সাথে হাসা শুরু করলেন। হা হা হা।

কোরআন মতে পৃথিবী কি সমতল না গোলাকার?

খুবই সিরিয়াস একটি ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ঠিক আলোচনা নয়, আদতে হাসাহাসি হচ্ছে। যারা হাসাহাসি করছে তাদের সবাই খুবই স্মার্ট। শুধু স্মার্ট নয়, ওভার স্মার্ট বলা যায়।

এরা কথায় কথায় বলে, আমরা বিজ্ঞান ছাড়া কিছুই বুঝি না। এরা উঠতে-বসতে, হাঁটতে-চলতে সবকিছুতেই বিজ্ঞানের প্রমাণ খুঁজে।

কেউ যখন তাদের বলে বিজ্ঞানের এইটা এইরকম নয়, ওইরকম, তখন তারা তেঁড়েমেড়ে এসে বলবে,- 'বাপু, তুমি কি বিজ্ঞানী? বিজ্ঞান নিয়া পড়াশুনা আছে? ক' ক্লাশ বিজ্ঞান পড়েছো যে বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলতে আসছো? যাও, আগে পড়ো, পরে লেকচার দিবা।'
আবার এই তারাই অনলাইনে কিছু ছাই-পাশ পড়া মুক্তোমনা তথা নাস্তিকদের লেখা পড়ে সেটাকে এতো পরিমাণ বিশ্বাস করে যে, নিজের বাবা-মাকেও এরা অতো বিশ্বাস করে না।
এইসব নাস্তিকগুলোর অধিকাংশই এমন, যারা আরবিতে কোরআন পড়তেই জানে না।কিছু ইংরেজি অনুবাদ এবং বাংলা অনুবাদের খিস্তি উড়িয়ে বলে,- 'কোরআনের এইটা ভুল, অইটা ভুল।কোরআনের এইটা অবৈজ্ঞানিক, অইটা অবৈজ্ঞানিক।'
লেখা পড়ে মনে হবে, এরা একেকজন বড় বড় মুফতি ছিলো একসময়। কোরআনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এতোসব ভুলভাল দেখে তারা আজকে নাস্তিক হয়ে গেছে।
এরা আরবিতে কোরআন পড়া তো দূরে, অধিকাংশই ২৯ টি আরবি হরফ ঠিকঠাক মতো বলতেও পারবে না।

এই মূহুর্তে হাসাহাসি হচ্ছে কোরআনের পৃথিবীর আকার নিয়ে।
হাসাহাসি করছে বিপুল, সৌরভ আর নিপুণ দা।

বিপুলকে আগে জুমার নামাজে দেখতাম।এখন সে নাকি ধর্মকর্ম করছে না। বিপ্লব নিয়ে আছে। কমিউনিজম বিপ্লব। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে ছেলেদের মধ্যে এমনিতেই রক্ত গরম রক্ত গরম টাইপ একটা ভাব থাকে। এই ভাবের সাথে যখন দু চারখানা মার্ক্স আর লেলিনের কিতাব যুক্ত হয়, তাহলে তো কথাই নেই। স্বপ্নের মধ্যেও তখন হেলাল হাফিজের পঙক্তি 'এখন যৌবন যার, মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়' জপতে থাকে।
বিপুলেরও একই অবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কি না কি পড়েছে, এখন ইশ্বরকে অলীক কল্পনা মনে করা শুরু করেছে। অবশ্য, এর পেছনে মোক্ষম ভূমিকা পালন করেছে নিপুণ দা। ইনি কট্টর বাম।আমাকেও কয়েকবার আরজ আলি মাতুব্বরের বই-টই পড়তে দিয়েছিলো। আমি পড়ে হাসিমুখে ফেরত দিয়েছিলাম।আমার কাছ থেকে বই নেওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলেন,- 'কি? কি বুঝলে ভাইয়া?'

আমি ফিক করে হেসে বললাম,- 'বুঝলাম যে, লোকটার মেণ্ট্যাল ট্রিটমেন্ট দরকার ছিলো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি বিনা চিকিৎসায় গত হয়েছেন।'
আমার মুখ থেকে এইরকম কথা শুনে নিপুণ দা খুব চমকে গেলেন।এখন বুঝতে পারছি ইনিই বিপুল আর সৌরবের ব্রেইন ওয়াশ করেছেন।

এরা এখন যা পড়ে হাসাহাসি করছে, তা একজন ব্লগারের লেখা।ব্লগারটা হিন্দু পরিবারের।হিন্দু পরিবারের হলেও উনি নিজের ধর্মত্যাগ করে একসময় নাস্তিকতা চর্চা শুরু করেন। পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার।
এই ব্লগার লিখেছেন, 'মুহাম্মদের আল্লা কি জানতো না যে পৃথিবী গোলাকার, সমতল নয়? তাহলে মুহাম্মদের আল্লা পৃথিবীকে সমতল বললো কেন? আসলে , কোরান কোন ইশ্বরের বাণী-টানী না। এটা স্রেফ মুহাম্মদের নিজের বানানো।

১৫০০ বছর আগে মানুষ বিশ্বাস করতো যে পৃথিবী হইলো সমতল। মুহাম্মদ তখন যা বিশ্বাস করতো, তাই লিখে দিছে আর বলে দিছে এইটা আসছে আল্লার কাছ থেইকা। হা হা হা। বোকা মুমিনগুলা এইটারে আল্লার বাণী মনে কইরা বাকুম বাকুম করতাছে।' (নাউজুবিল্লাহ)

প্রমান হিসেবে উল্লেখ করলো এই আয়াতগুলো- 'তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিছানা স্বরূপ।'- সূরা নূহ ১৯
["And Allah has made the earth for you as a carpet (spread out)] "

"তিনিই তোমাদের জন্য জমিনকে করেছেন বিছানা স্বরূপ। আর তাতে তোমাদের জন্য করেছেন চলার পথ।"- সূরা ত্বাহা ৫৩
["He Who has made for you the earth like a carpet spread out; has enabled you to go about therein by roads (and channels)…."]

'অতঃপর, তিনি তার জমিনকে বিস্তৃর্ণ করেছেন।'
– আন-নাজিরাত ৩০

আমি আর সাজিদ পাশাপাশি বসে আছি।আমার তো গা জ্বলে যাচ্ছে এদের বিদ্রুপ-ঠাট্টা দেখে।সাজিদ একদম শান্তভাবে বসে বসে এসব শুনছে। কি করে যে পারছে কে জানে।
নিপুণ দা বললো,- 'কি সাজিদ মিয়া, তোমার কি কিছু বলার আছে এই ব্যাপারে?'
সাজিদ হাসলো।সচরাচর যেমন হাসে।এরপর বললো,- 'দাদা, তোমরা বলে যাও।আমি নাহয় আজ শুনেই যাই।'

– 'না না, তোমাকেও বলতে হবে। বলতে হবে তুমি কি বিশ্বাস করো, পৃথিবীটা কার্পেটের মতো সমতল? নাকি বিশ্বাস করো পৃথিবীটা গোলাকার?'- নিপুণ দা বললো।
সাজিদ বললো,- 'আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীটা গোলাকার।'

– 'হা হা হা। তাহলে তো কোরানের সাথে বীপরিত হয়ে গেলো। কোরান বলছে পৃথিবীরে কার্পেটের মতো সমতল করে বিছানো হয়েছে। ইউ বিলিভ ইট?'

সাজিদ কিছু বললো না। একটু ঝেঁড়ে কেশে নিলো। এরপর বললো,- 'দাদা, অনেকক্ষণ ধরেই খেয়াল করছি তোমরা বলছো 'সমতল সমতল।' আচ্ছা, কোরানের ঠিক কোন জায়গায় বলা হয়েছে পৃথিবীটা সমতল?'
নিপুণ দা বললো,- 'আরে, কোরান বলেছে পৃথিবীকে বিছানার মতো বিছানো হয়েছে।এর মানে কি এই নয় যে, পৃথিবীটাকে সমতল বলা হয়েছে?'
সাজিদ বললো,- 'দাদা, প্রথমেই বলে রাখি, অনুবাদ দিয়ে কোরআনকে জাষ্টিফাই করাটা ভুল। দেখো, সমতল শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হলো 'সাবি' 'আল মুস্তাবি' এসব। কোরআন যদি সত্যিই পৃথিবীকে সমতল বলতো, তাহলে কোরআন নিশ্চই এই শব্দগুলো ব্যবহার করতো।কিন্তু কোরআন এখানে এসব শব্দ ব্যবহার করে নি।

কোরআন এখানে ব্যবহার করেছে 'ফারাশ' 'বাস্বাত' 'দাহাহা' এই জাতীয় শব্দ যার কোনটার অর্থই 'সমতল' নয়। এগুলোর অর্থ 'কার্পেট' বা 'বিছানার মতো করে বিছানো', Spread Out'. এগুলো দিয়ে কোনভাবেই বুঝায় না যে পৃথিবী সমতল।'
নিপুণ দা অনেকটাই বিদ্রুপ করে বললো,- 'তাহলে কি বুঝায় এগুলো দিয়ে স্যার সাজিদ?'
সাজিদ বললো,- 'Let me finish….

আমরা কোরআনের সেই আয়াতে চলে যাই, যেটা নিয়ে তোমাদের আপত্তি। যেটাতে নাকি বলা হচ্ছে পৃথিবী সমতল। আয়াতটি হলো- 'তিনিই তোমাদের জন্য জমিনকে করেছেন বিছানা স্বরূপ। আর তাতে তোমাদের জন্য করেছেন চলার পথ।'

দেখো দাদা, আল্লাহ বলছেন, তিনি আমাদের জন্য জমিনকে করেছেন বিছানা স্বরূপ, কার্পেটের মতো করে। আচ্ছা দাদা, বিছানা বলতে আমরা কি বুঝি? আমরা বুঝি, বিছানা এমন একটি জিনিস, যা নরম, আরামদায়ক। যাতে বিশ্রাম নেওয়া যায়।যদি এটাকে রূপক হিসেবে ধরি, তাহলে এটা এমন কিছু যাতে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকা যায়, চলাফেরা করা যায়।আজকের বিজ্ঞানও আমাদের সেটা বলছে।

বিজ্ঞান আমাদের বলছে, আমাদের পৃথিবীর ভূ-ত্বক মোট ৭টি স্তরে বিভক্ত। এই স্তরগুলোর মধ্যে সবচে উপরের স্তরের নাম হলো Crust। এই স্তরের পুরুত্ব ভূ-পৃষ্ট থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত। এটিই সেই স্তর, যে স্তরে আমরা বসবাস করি, চলাফেরা করি।এরপরে আছে Mentle।

এই স্তরের পুরুত্ব ২৯০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হলো ৯০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রায় মানুষ তো দূরের কথা, একটি ক্ষুদ্র জীবও মূহুর্তে ভস্ম হয়ে যাবে। চিন্তা করো তো, পৃথিবীর যে স্তরে আমরা বাস করছি, হাঁটছি, চলছি, ঘুরছি-ফিরছি, তার থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার গভীরে এই ভয়াল স্তর অবস্থিত।

এটা তো মাত্র দ্বিতীয় স্তরের কথা। এরপরের স্তরের নাম হলো Outer Core।উইকিপিডিয়া মতে, এর পুরুত্ব হলো ২৮৯০ কিলোমিটার এবং এই স্তরের তাপমাত্রা হলো ৩৭০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। চিন্তা করো, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ এইসব স্তরে ঠিক কি ঘটে?
এরপরের স্তরের নাম হলো Inner Core। এটা তো আরো ভয়াবহ। এভাবে যতো নিচে নামা হয়, স্তরগুলো ততোই ভয়ানক। আমরা যে আগ্নেয়গিরির লাভা দেখি, এটা এইসব স্তরের ছোট্ট একটা বিস্ফারণ মাত্র।কিন্তু আমরা যে স্তরে থাকি, সেই Crust স্তরের তাপমাত্রা অন্য ৬ স্তরের তাপমাত্রার তুলনায় মাত্র ১%, যা আমাদের বসবাসের উপযোগী।

এখন, এই দিকটার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ যদি বলেন, 'আমি তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছি বিছানা স্বরূপ' তাতে কি বোঝায় যে আল্লাহ এটা দ্বারা পৃথিবীর শেইপ বুঝিয়েছেন? একদম না। এটা দিয়ে যে আল্লাহ ভূ-ত্বকের অই স্তরের কথাই মিন করেছেন যা আমাদের বসবাসের উপযোগি, তা আয়াতের পরের অংশ থেকেই বোঝা যায়।আয়াতের পরের অংশেই আছে 'আর, তাতে তোমাদের জন্য করেছেন চলার পথ।'
এটা তো একদম ক্লিয়ার যে এটা পৃথিবীর আকার নয়, ভূমির ব্যাপারে বলা হয়েছে। এবং, ভূমির সেই অংশের ব্যাপারে, যে অংশে আমরা, মানুষেরা বসবাস করছি।যেটা আমাদের বসবাসের জন্য উপযোগী। তাহলে এটা দিয়ে পৃথিবীকে সমতল বানিয়ে দেওয়া যায় কি করে? স্রেফ মনগড়া ব্যাখ্যা।'
নিপুণ দা চুপ করে আছে। বিপুল বলে উঠলো,- 'আচ্ছা সাজিদ ভাই, আপনার কথা মানলাম যে এখানে পৃথিবীর আকার নয়, ভূমির স্তরের কথা বলা হয়েছে আর সেটাকে বিছানার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে।কিন্তু আপনি কি কোরানের এমন একটি আয়াত দেখাতে পারবেন যে যেখানে বলা হচ্ছে পৃথিবী গোল? সমতল নয়?'
বিপুলের কথা শুনে সাজিদ হেসে উঠলো। বললো,- 'বিপুল, তার আগে তুমি বলো তো, কোরআন কি মানুষকে পৃথিবীর শেইপ কি রকম, পদার্থবিদ্যায় কি কি খাটে, রসায়নে কোন যৌগের সাথে কোন যৌগের বিক্রিয়া ঘটে এসব শেখানোর জন্য নাজিল হয়েছে?'
– 'না।'- বিপুল বললো।
– 'তাহলে তুমি কি করে এক্সপেক্ট করো যে কোরআন পৃথিবীর আকার,আয়তন নিয়ে বলবে?'

এবার বিপুলও চুপ। কিন্তু সাজিদ আর চুপ হলো না। সে বলে যেতে লাগলো,- 'ঠিক আছে বিপুল। তুমি যখন আশা করেছো, তখন আমি প্রমান করে দেখাতে পারি যে কোরআন পৃথিবীর আকার নিয়ে বলেছে, এবং, সেটা গোলাকার।'
এবার আমি, নিপুণ দা, বিপুল আর সৌরভ চোখ বড় বড় করে সাজিদের দিকে তাকালাম। বলে কি ব্যাটা!! কোরআন পৃথিবীকে গোলাকার যদি বলেই থাকে, তাহলে এতক্ষণ এতো কাহিনী বলার কি কোন দরকার ছিলো?
নিপুণ দা হো হো করে হেসে উঠলো। বললো,- 'এবার কি নতুন তত্ব শোনানো হবে নাকি? হা হা হা।'
নিপুণ দা'র সাথে সাথে বিপুল আর সৌরভও হেসে উঠলো।তাদের সাথে সাজিদও হাসছে।আমার তখন সাজিদের উপর খুব রাগ হচ্ছে।

সাজিদ বললো,- 'নিপুণ দা, একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবে প্লিজ। কোরআন সরাসরি পৃথিবীকে গোলাকার বলে নি।বলার দরকারও ছিলো না।কারন, কোরআন জিওগ্রাফির কোন বই নয় যে এখানে পৃথিবীর আকার,আকৃতি নিয়ে বলাই লাগবে। তবে, কোরআন কিছু ইঙ্গিত দিয়েছে। জ্ঞানীদের উচিত তা বুঝে নেওয়া।'

নিপুণ দা বললো,- 'তাই বুঝি? তা বুঝাই দেন দেখি মহাজ্ঞানী সাজিদ ভাই। হা হা হা।'
সাজিদ বললো,-
প্রথমত,
সূরা আয যুমারের ৫ নং আয়াত। বলা হচ্ছে- "তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা।"
এই আয়াতে রাত দিন দ্বারা এবং দিন রাত দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়া বুঝাতে যে আরবি শব্দ ব্যবহার হয়েছে তা হলো "يُكَوِّرُ"। এই শব্দটির একদম সঠিক অর্থ হলো প্যাঁচানো / জড়ানো।

ক্লাসিকাল আরবি ডিকশনারিতে এর অর্থের ব্যাখ্যাতে বলা হয়েছে এটি ঠিক এমন- কোন পাগড়ির মধ্যে একটি কাপড় অন্য একটি কাপড়ের মধ্যে যেভাবে প্যাঁচিয়ে ঢুকানো হয়।একটি অন্যটির মধ্যে প্যাঁচিয়ে ঢুকে যাচ্ছে।জীবনে কখনো পাগড়ি দেখলে বা পাগড়ী বেঁধে থাকলে ব্যাপারটা ভালো বুঝার কথা।

আল্লাহ বলেছেন তিনি রাত দ্বারা দিনকে, এবং দিন দ্বারা রাতকে ঠিক সেভাবেই আচ্ছাদিত করেন।

এখন রাতকে দিন দ্বারা এবং দিনকে রাত দ্বারা এভাবে আচ্ছাদিত করা তখনই সম্ভব, যখন পৃথিবীর আকার গোল হবে।
আমরা দেখি কিভাবে দিন-রাত্রি হয়। প্রথমে ভোর, এরপর আস্তে আস্তে দুপুর, এরপর বিকেল, এরপর গোধূলি, এরপর সন্ধ্যা, এরপর একসময় দিন রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে যায় যেভাবে আস্তে আস্তে পাগড়ীর একটা অংশ অন্য অংশের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

যদি পৃথিবী সমতল হতো, একটা লম্বা কাঠ বা তক্তার মতো,তাহলে কি এভাবে দিনরাত্রি হতো? না। তখন এই দিন, আবার চোখের পলকে রাত নেমে পড়তো।

তাহলে সূরা যুমারের এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহ রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে আচ্ছাদিত করার যে প্রক্রিয়া বলেছেন সেটা তখনই সম্ভব, যখন পৃথিবী গোলাকার হবে। তাহলে কোরআন ইন্ডিরেক্টলি ইঙ্গিত করছে যে পৃথিবী গোলাকার।

দ্বিতীয়ত,
সূরা আর রহমানের ১৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলছেন,- 'তিনিই দুই অস্তাচল আর দুই উদয়াচলের মালিক।'
এখানে অস্তাচল আর উদয়াচল বলতে সূর্যের উদয়-অস্তের কথা বলা হচ্ছে।

আমরা জানি, পৃথিবীতে একদিনে দুইবার সূর্যোদয় আর দুইবার সূর্যাস্ত ঘটে থাকে। আমরা বাংলাদেশে যখন সূর্যকে পূর্বদিকে উদিত হতে দেখি, তখন আমেরিকানরা দেখে যে সেখানে সূর্যটা পশ্চিমে ডুবে যাচ্ছে। তাহলে আমাদের এখানে যখন সকাল, তাদের কাছে তা সন্ধ্যা। আবার, আমরা যখন সূর্যকে পশ্চিমে ডুবে যেতে দেখি, তারা তখন সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত হতে দেখে।
তার মানে পৃথিবীতে মোট দু'বার সকাল, দু'বার সন্ধ্যা পরিলক্ষিত হয়। এখন,দুবার সূর্যাস্ত আর আর দুবার সূর্যোদয় তখনই সম্ভব যখন পৃথিবীর আকার গোল হবে। পৃথিবীর আকার যদি সমতল বা চ্যাপ্টা কাঠ বা তক্তার মতো হতো, তাহলে পৃথিবীতে একবারই সূর্যাস্ত – সূর্যোদয় ঘটতো। তক্তা সদৃশ পৃথিবীর একপাশে সূর্য উঠে অন্যপাশে ডুবে যেতো। কিন্তু সেরকম হয়না, কারন পৃথিবী গোলাকার।

এইজন্য পৃথিবীতে আমরা দুইবার সূর্যাস্ত আর সূর্যোদয় দেখতে পাই।
আল্লাহও কোরআনে একই কথা বলছেন। তিনি বলছেন,- 'তিনিই মালিক দুই অস্তাচল আর উদয়াচলের।' তাহলে তিনি নিশ্চই জানেন পৃথিবী গোলাকার।তাই তিনি দুই সুর্যাস্ত আর দুই সুর্যোদয়ের কথা বলেছেন। তিনি যদি পৃথিবীকে ফ্ল্যাট তথা সমতলই বলবেন, তাহলে অবশ্যই তিনি এক অস্তাচল আর এক উদয়াচল এর কথাই বলতেন। কিন্তু তিনি তা বলেন নি।তার মানে, কোরআন ইঙ্গিত করছে যে, পৃথিবী গোলাকার।'

এতোটুকু বলে সাজিদ থামলো। বিপুল চুপ করে আছে। নিপুণ দা'ও চুপ। তাদের হয়তো আর কিছু বলার নেই এই মূহুর্তে। সৌরভ বললো,- 'সবই বুঝলাম, কিন্তু পৃথিবীর ভূমিকে বিছানা বলার কি দরকার? এত জটিল করে।'
সাজিদ হাসলো। বললো,- 'সৌরভ, আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি, তখন নিপুণ দা আমাকে একটি লাভ লেটার দিয়েছিলেন বিপাশা দি কে দেবার জন্য। কি নিপুণ দা, দাও নি?'
নিপুণ দা লজ্জা লজ্জা ভাব নিয়ে বললো,- 'হ্যাঁ, কিন্তু এখানে বলছো কেন এসব?'
– 'জানো নিপুণ দা, আমি সেই চিঠিটা বিপাশা দি কে দেবার আগে খুলে একবার পড়ে নিয়েছিলাম। হা হা হা হা। কি রোমান্টিক প্রেমপত্র ছিলো সেটা। হা হা হা।'
নিপুণ দা হাসছে, লজ্জাও পাচ্ছে। আমরাও হাসছি। সাজিদ বললো,- 'জানো সৌরভ, সেই চিঠির শুরুতেই বিপাশা দি'র রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে নিপুণ দা লিখেছে- 'তোমার অই চাঁদমুখ খানা না দেখলে আমার দিনটাই পানসে লাগে।'

আমরা সবাই হো হো হো করে হাসছি। সাজিদ আবার বললো,- 'আচ্ছা সৌরভ, নিপুণ দা যে বিপাশা দি'র মুখকে চাঁদমুখ বলেছে, এখানে নিপুণ দা কি বুঝিয়েছে যে বিপাশা দি'র মুখ দেখতে চাঁদের আকৃতির মতো? আই মিন গোলাকার?'
সৌরভ বললো,- 'না, উনি বিপাশা দি'র রূপ বুঝিয়েছেন এটা দিয়ে।'
– 'এক্সাক্টলি। নিপুণ দা সেদিন 'চাঁদমুখ' দিয়ে আসলে বিপাশা দি'র রূপ বুঝিয়েছে, বিপাশা দি'র মুখের আকৃতি না। এটাকে বলে উপমা। ঠিক সেরকম আল্লাহও পৃথিবীর ভূমিকে বিছানার উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন তিনি আমাদের জন্য কতো উপযোগী করেই না এটা তৈরি করেছেন। এটা দিয়ে তিনি পৃথিবীর আকৃতি বা আমার বা তোমার বেডরুমের বিছানা বুঝান নি, বুঝেছো?'

সৌরভ একদম চুপ মেরে গেলো। সে নিশ্চই বুঝেছে। বিপুলও চুপচাপ। সাজিদ নিপুণ দা'র কাছে গিয়ে বললো, – 'স্যরি দা ভাই, অই চিঠিটা তোমার পারমিশান ছাড়াই পড়েছিলাম বলে। কি করবো বলো? তোমাদের মতো সিনিয়ারদের থেকেই তো এক্সপেরিন্স নিতে হবে,তাই না? হা হা হা।'
নিপুণ দা সাজিদকে ধরতে যাচ্ছিলো আর সে অমনি দিলো এক দৌড়................
[তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া হয় যে, আল্লাহ সত্যি সত্যিই পৃথিবীকে কার্পেটের মতো করে তৈরি করেছেন, তাহলেও কোন ভুল হবে না। কারন, কার্পেট যে শুধু সমতল জিনিসে করা হয় তা নয়। গোলাকার জিনিসেও কার্পেট করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি ফুটবলের কথা চিন্তা করুন। ফুটবল একটি গোলাকার জিনিস। এর

উপরিভাগ কি রকম? কার্পেটের মতো করে আচ্ছাদিত। সো, আল্লাহ যদি বলেন তিনি ভূমিকে কার্পেটের মতো করে বিছিয়েছেন, তাহলে ধরা যায় যে, ফুটবলের মতো গোলাকার ভূমিকে তিনি কার্পেটের মতো বিছিয়েছেন।]

তাছাড়া, সূরা আল ইনশিক্বাকের ৩ নাম্বার আয়াতে আছে- 'যেদিন পৃথিবীকে সমতল করা হবে.....।'

এখানে বলা হচ্ছে কিয়ামত দিবসের কথা। সেদিন পৃথিবীকে আল্লাহ সমতল করবেন। তাহলে , তিনি যদি এখনই পৃথিবীকে সমতল করে তৈরি করতেন, আবার কিয়ামত দিবসে এটাকে সমতল করার কথা আসে কিভাবে?

সেদিন সকালবেলা বাসায় ছিলাম। আমার ক্লাশ ছিলো না বলে আমি ইউনিভার্সিটি তে যাইনি। সাজিদের ক্লাশ ছিলো। আমি বাসায় বসে বসে শেক্সপিয়ারের 'হ্যামলেট' পড়ছিলাম।

দুঃখের কাহিনী আমি একদম পড়তে পারি না। হ্যামলেট পড়তে গিয়ে কখন যে আমার চোখজোড়া অশ্রুসজল হয়ে উঠলো, আমি খেয়ালই করিনি। এই জিনিস আর বেশিক্ষণ পড়া যাবে না। নাহলে কেঁদেকেটে আমি বুক ভাসিয়ে ফ্লোরে ছোটখাটো জলাশয় বানিয়ে ফেলবো, শিওর।

হাত থেকে ধপ করে টেবিলের উপর রাখলাম 'হ্যামলেট'। খুব মন খারাপ।

এই মূহুর্তে সাজিদ থাকলে সে নিশ্চয় আমাকে নিয়ে রসিকতা করতো।

একবারের কথা। টেলিভিশনে একটা মুভি দেখাচ্ছিলো। মুভিতে দেখাচ্ছিলো নায়কের সৎ মা নায়ককে খেতে দিচ্ছে না, পরতে দিচ্ছে না। নায়কের বাবা নায়কের জন্য প্রচুর সম্পত্তি উইল করে রেখে যায়। সেগুলো থেকে বঞ্চিত করতে নায়কের সৎ মা নায়ককে ছোটবেলায় শহর থেকে অনেক দূরে রেখে আসে। নায়ক খুবই মানবেতর জীবনযাপন করে। একটি চা'য়ের দোকানে চাকরি করে।

এই দৃশ্য দেখে টপটপ করে আমার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। সেদিন আমার এই অবস্থা দেখে সাজিদ আমাকে নিয়ে এতোই হাসাহাসি করলো যে, আমি এরপর থেকে তার সাথে বসে আর কোনকিছুই দেখি না। আজকে হ্যামলেট পড়েও আমার একই অবস্থা। খুব কান্না পাচ্ছে আর কষ্ট লাগছে হ্যামলেটের জন্য।

মনটাকে হালকা করা দরকার। একবার ভাবলাম বাইরে থেকে ঘুরে আসি। কি মনে করে আবার সিদ্ধান্ত পাল্টালাম।

সাজিদের টেবিলের পাশে এসে দেখলাম তার সেই বিখ্যাত (আমার মতে) ডায়েরি টেবিলের উপর থেকে আমার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে।

এই ডায়েরির অনেক কিছুই আমার পড়া। নতুন কিছু লেখা আছে কিনা দেখার জন্য উল্টাতে লাগলাম।

মাঝামাঝিতে এসে দেখলাম নতুন কিছু লেখা।

লেখাটার শিরোনাম 'একটি ডিএনএ'র জবানবন্দী'

মজার বিষয় মনে হচ্ছে। ডিএনএ'র জবানবন্দী আবার কি জিনিস? পড়া শুরু করলাম। সে ঠিক যেভাবে লিখেছে আমি সেভাবেই তুলে ধরছি-

'একটি ডিএনএ'র জবানবন্দী'

আমি একটি DNA । আমার পূর্ণরূপ Deoxyribo Nucleic Acid ।

আমার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগে আপনারা আগে জেনে নিন DNA আসলে কি?

DNA হচ্ছে বংশপরম্পরায় বৈশিষ্ট্য নির্ধারক ‘জিন’ এর ধারক ও বাহক। আপনারা কেউ আপনাদের বাবার মত, কেউ মায়ের মত আবার কেউ দাদা-দাদি বা নানা-নানীর মত হয়ে থাকেন। DNA আপনাদের পূর্ব পুরুষদের বৈশিষ্ট্য আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছে এবং একইভাবে আপনাদের বৈশিষ্ট্য আপনাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নিয়ে যাবে।

আপনারা প্রায়ই বলেন, 'তোমার সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক।'

এই কথাটা আসলে ভুল। রক্তের সম্পর্ক বলে কিছু আসলে নেই। আপনাদের আসলে বলা উচিত, 'তোমার সাথে আমার DNA'র সম্পর্ক।'

আপনার চোখ দেখতে আপনার বাবার মতো। নাক আপনার মায়ের মতো। মুখ একদম আপনার দাদার মতো। চুল আপনার ভাইয়ের মতো কোঁকড়া। এই যে আপনি আপনার আত্মীয়স্বজনের মতো দেখতে হলেন, তাদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য পেলেন, এটা কিসের জন্য? এটার কারণ হলো- DNA..

সংক্ষেপে এটাই DNA তথা আমাদের পরিচিতি।

আমাদের ব্যাপারে আরো বিস্তারিত লেখা যায়। তবে, আমরা সেদিকে না গিয়ে এখন অন্যদিকে লাফ দেবো।

আচ্ছা, আপনারা 'ইনফরমেশন' তথা 'তথ্য' সম্পর্কে তো জানেন, তাই না?

ইনফরমেশন হচ্ছে এমন কিছু যা আপনাদের কোন ব্যাপারে ইনফর্ম করে। সিম্পলি, যার মধ্যে জ্ঞান থাকে, নির্দেশ-নির্দেশনা থাকে তাই হলো ইনফরমেশন তথা তথ্য।

আরেকটু আগাই। ধরুন, আপনি কোন একটি সাগর পাড়ে হাঁটছেন।ধরে নিই যে, সাগর পাড়ের এই এলাকাটিতে আপনি ছাড়া অন্য কারো প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আপনি গার্ড রেখে এই জায়গাটিতে অন্য কোন মানুষ, পশু-পাখির প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করেছেন।এমনকি, বীচের এই জায়গাটায় যাতে কোন জাহাজও নোঙর করতে না পারে, তাও নিশ্চিত করেছেন।
ধরুন, হাঁটতে হাঁটতে আপনি বীচের একটি নির্জন এলাকায় এসে দেখলেন যে বীচের বালুতে লেখা ' I Love You।'
আচ্ছা, বীচের বালুতে 'I Love You' র মতো অর্থপূর্ণ, সাজানো-গোছানো, ভাব প্রকাশক একটি বাক্য দেখার পরে আপনার তৎক্ষণাৎ কি মনে হবে? আপনি ১০০% শিওর যে এটি আপনি কোনভাবেই লিখেন নি।
নিশ্চয় মনে হবে যে, কোন মানুষ, যার অক্ষরজ্ঞান আছে, যে 'I Love You' এর অর্থ বুঝে, তা লিখতে সক্ষম, স্পেলিং করতে সক্ষম এমন কেউ এটি লিখে গেছে। যে এটি লিখে গেছে তার বুদ্ধি আছে। সে একটি বুদ্ধিমান সত্বা।
ধরুন, এটি দেখে আপনি খুব রেগে গেলেন। বুঝতে পারলেন যে আপনার গার্ডদের অসচেতনতায় কেউ একজন এখানে এসেছে এবং এটি লিখে চলে গেছে।
আপনি আপনার গার্ডকে ডাকলেন। বললেন, 'শোন, আমি বলেছিলাম না এখানে আমি ছাড়া অন্যকেউ যেন কোনমতেই ঢুকতে না পারে? আমার অবর্তমানে এখানে কে ঢুকেছে বলো?'
গার্ড কাচুমাচু করতে করতে বললো, 'সাহেব, সত্যি বলছি এখানে কেউই ঢুকেনি। আল্লাহর কসম।'
গার্ডের কথা শুনে আপনি আরো বেশি রেগে উঠলেন।বললেন, 'হুয়াট দ্য হেল ইট ইয্জ? এখানে যদি কেউ না-ই ঢুকে তাহলে এই 'I Love You' লেখাটি কিভাবে এলো? তুমি কি বলতে চাচ্ছো সমুদ্রের বালু, পানি আর বাতাস একসাথে মিশে এই 'I Love You' বাক্যটা নিজে নিজে তৈরি হয়ে গেছে? তুমি আমাকে এটি বিশ্বাস করতে বলছো?'
এই 'I Love You' লেখা বাক্যটা নিজে নিজে তৈরি হয়ে যেতে পারে, এটি কি আপনি কোনমতেই বিশ্বাস করবেন? নিশ্চয় না।
ধরুন, গার্ডকে বকাঝকা করে আপনি আবার হাঁটা ধরলেন। হাঁটতে হাঁটতে আরো কিছুদূর গেলেন।
হঠাৎ আপনি দেখলেন যে, বীচের বালুর উপরে একটি বই রাখা আছে। অদ্ভুত ব্যাপার। আপনি বইটি হাতে নিলেন। খুলে দেখলেন যে এটি একটি উপন্যাসের বই। আপনি আবার গার্ডকে ডাক দিলেন। জানতে চাইলেন এই বই এখানে কিভাবে এলো? কে রেখে গেলো?'
সে আবার মুখ নিচু করে বললো, 'সত্যি বলছি সাহেব, এখানে কেউ আসেইনি।'
আপনি চিৎকার করে আবার বলে উঠলেন, 'তাহলে এই বইটাও কি সমুদ্রের বালু, পানি আর হাওয়ার মিশ্রণে নিজে নিজে লেখা হয়ে গেছে? প্রিন্ট হয়ে গেছে? বাঁধাই হয়ে গেছে?'
একটি উপন্যাসের বই, যাতে কিছু বর্ণমালা পাশাপাশি বসে শব্দ হয়েছে, কিছু শব্দ পাশাপাশি বসে অক্ষর হয়েছে, কিছু অক্ষর পাশাপাশি বসে বাক্য হয়েছে আর অনেকগুলো অর্থপূর্ণ বাক্য নিয়ে হয়েছে একটি পুরো উপন্যাসের বই।
আচ্ছা, সমুদ্রের পানি, বাতাস আর বালুর মিশ্রণে এই বইটি নিজে নিজে লেখা হয়ে গেছে এমনটি কেউ দাবি করলে কি আপনি বিশ্বাস করবেন? করবেন না।
আপনি পাল্টা তাকে বলবেন যেন সে পাবনা ম্যান্ট্যাল হসপিটালে সিট বুক করে রাখে নিজের জন্য।ব্যাপারটা এতোটাই হাস্যকর!!
এমনকি, স্বয়ং মহামতি আইনষ্টাইন এসে যদি পদার্থবিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে বলে এই বইটি অটোমেটিক লেখা হয়ে গেছে কোন লেখক ছাড়াই, আপনি আইনষ্টাইনকেও বলবেন, 'স্যার, দয়া করে নিজের রাস্তা মাপুন। কোন তথ্য, কোন ইনফরমেশন, কোন অক্ষর, কোন বর্ণমালা, কোন অর্থপূর্ণ রচনা লিখতে যে একটি বুদ্ধিমান সত্বার দরকার অনিবার্য, তা একটা বাচ্চা ছেলেও জানে।'
ধরুন, আপনি আর কিছুদূর হেঁটে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, অপরূপ সুন্দর, ঠিক তাজমহলের মতো ডিজাইন করে মার্বেল পাথর দিয়ে একটি বিল্ডিং তৈরি করা আছে। আপনি খুব অবাক হলেন। এতো সুন্দর মহলটি এখানে কিভাবে এলো?

এটি দেখার সাথে সাথে আপনার কি মনে হবে?

সমুদ্রে টর্নেডোর মতো ভয়ঙ্কর ঝড় উঠতো, আর সেই ঝড়ের সাথে সাথে সমুদ্রের গভীর থেকে মণি-মুক্তো ওয়ালা পাথর উড়ে এসে বালু আর পানি দিয়ে এই অপূর্ব মহলটি তৈরি হয়ে গেছে?

একদম না। এটি ক্ষুর্নাক্ষরেও আপনার মনে আসবে না।

আপনার যা মনে আসবে তা হলো প্রথমে একজন ডিজাইনার তথা ইঞ্জিনিয়ারের কথা, যে এই সুন্দর মহলটির নকশা করেছে। এরপরে অন্যসব।

এই সুন্দর মহলটি তৈরির জন্য কিছু ইনফরমেশান দরকার। মহলের সামনের দরজা কোনদিকে হবে, কোনপাশে ঝর্ণা থাকবে, কোনপাশে বাগান। কোনদিকে গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থা, কোনদিকে উদ্যান এসবের জন্য কিছু দরকারি তথ্য তথা ইনসট্রাকশন দরকার। এই ইনষ্ট্রাকশন একজন ইঞ্জিনিয়ার তার নকশায় বিস্তারিত একেঁ রাখে এবং এটার উপর ভিত্তি করেই একটি মহল তৈরি হয়।

ধরুন, আপনি সেই মহলে প্রবেশ করলেন। যেই আপনি মহলে প্রবেশ করলেন, দেখলেন আপনার সামনে একটি কাগজ রাখা। কাগজটি আপনি হাতে নিলেন। খুললেন। তাতে লেখা, 'এই মহলের ডান দিকটা আপনার জন্য অনিরাপদ। আপনি ভুলেও ডান দিকটায় যাবেন না। তবে, বাম দিকটা আপনার জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

আচ্ছা, কাগজের এই লেখাটা পাওয়ার পরে আপনি কি এমন কারো অস্তিত্ব অনুভব করবেন না যে বুদ্ধিমান? যে লিখতে জানে, পড়তে জানে? যে চায়না আপনি বিপদে পড়ুন?

নাকি আপনি ভাববেন যে এই কাগজ,এই লেখা সবকিছুই আপনাআপনি হয়েছে? অবশ্যই সেটা ভাববেন না।

এবার ধরুন, আপনি মহলটি ঘুরেফিরে দেখা অবস্থায় খেয়াল করলেন যে বাইরে, সমুদ্র পাড়ে ভীষণ ঝড় উঠেছে।খুব প্রলয়ঙ্করী ঝড়। ঝড়টা বেশ কয়েক ঘণ্টা ছিলো।

ধরুন, ঝড় থামলো আর আপনি মহল থেকে বের হয়ে নিজের ঘরের উদ্দেশ্যে হাঁটা ধরলেন। একটু এগুতেই দেখলেন একটি বালুর স্তুপ, তার উপর কিছু ছেঁড়া পলিথিন, ছেঁড়া ব্যাগ, কিছু নুড়ি পাথর এদিক-সেদিক ছড়ানো-ছিটানো। এই স্তুপ আসার পথে আপনি দেখেন নি।যাবার পথেই দেখছেন।

আচ্ছা বলুন তো, এই বিদঘুটে বালুর স্তুপটা দেখে আপনার কি প্রথমেই কোন ইঞ্জিনিয়ারের কথা মনে আসবে? মনে হবে কি এই স্তুপটা তৈরিতে একজন ইঞ্জিনিয়ারের একটি নকশা আঁকতে হয়েছে? হা হা হা। কখনোই না। আপনি নিশ্চিত ধরে নেবেন যে, এই বালুর স্তুপটি একটু আগের ঝড়ে তৈরি হওয়া।কারন, এর মধ্যে কোন শিল্প নেই, সৌন্দর্য নেই। নেই কোন কারুকার্যতা। ঝড়-ঝাপ্টার ফলে এরকম কিছু এবড়োথেবড়ো বালুর স্তুপ, আবর্জনার স্তুপ তৈরি হতেই পারে, কিন্তু একটি অপরূপ মহল? অসম্ভব।

এতক্ষন ধরে যা বললাম তা হলো 'তথ্য'। সেই 'I Love You', সেই উপন্যাসের 'বই', সেই মহলের 'নকশা', সেই কাগজের লেখা সবকিছুতে কিছু না কিছু তথ্য আছে। আর এই তথ্যের পেছনে আছে কোন কনসিয়াস মাইন্ড তথা বুদ্ধিমান সত্বা।

কোন জড় পদার্থ, প্রাকৃতিক কোন দূর্ঘটনা কোনদিনও কোন ইনফরমেশন দিতে পারে না। কারন, ইনফরমেশন দিতে লাগে একটি 'মন'।

যেমন, সমুদ্রের পাড়ে 'অ থেকে ঁ' পর্যন্ত কিছু অক্ষর রেখে আসলে হাজার কোটিবার ঝড়-ঝাপ্টার পরে সেই অক্ষরগুলো কোন একদিন পাশাপাশি মিলে রবীন্দ্রনাথের সোনার তরীর মতো কোন কবিতা হয়ে যাবে এই সম্ভাবনা 0.0000000%....

কারন, সোনার তরী কবিতা লিখতে একটি মন লাগবে, বুদ্ধিমান সত্বা লাগবে। ঝড়-ঝাপ্টার পর হয়তো সেখানে আপনি কিছু অর্থবোধক শব্দ পেলেও পেতে পারেন।যেমন, প্রচন্ড ঝড়ের কারনে 'ব' এর পাশে 'ল' অক্ষরটি এসে বসতে পারে। আর, বসলে সেটি হয়ে যাবে 'বল'। বল একটি অর্থপূর্ণ শব্দ। 'ম' এর পাশে 'হ' এবং তার পাশে 'ল' এসে বসলে পাওয়া যাবে 'মহল' শব্দ (যদিও তার সম্ভাবনা কয়েক হাজারে ১ বার হলেও হতে পারে)।

দেখুন, আপনি এরকম দু'চারটি ছন্নছাড়া শব্দ পেলেও পেতে পারেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সোনার তরীর মতো একটি কবিতা পাওয়া কোনদিনও সম্ভব না।হাজার কেন, কোটি কোটি বছর সময় দেওয়া হলেও পাওয়া সম্ভব না।

এতোক্ষন বলা হলো তথ্যের ব্যাপারে। উপরের আলোচনা থেকে আমরা দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি-

১/ ইনফরমেশন তথা তথ্য পেতে দরকার একটি কনসিয়াস মাইন্ড তথা বুদ্ধিমান সত্বা যার বিবেক আছে, বুদ্ধি আছে, চিন্তা করার ক্ষমতা আছে এবং
২/ কোন জড় পদার্থ, কোন অচেতন পদার্থ (টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড়, পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র) যার প্রাণ নেই, বুদ্ধি নেই, চিন্তা করার ক্ষমতা নেই তার কাছ থেকে কখনোই তথ্য পাওয়া সম্ভব না।
এবার আমরা আবার DNA তে ফিরে আসি।
প্রাণীদের শরীরের একেবারে গাঠনিক যে উপাদান, তার নাম হলো কোষ। এই কোষের নিউক্লিয়াসের ভেতরে, একদম কেন্দ্রে যা থাকে তার নামই DNA।
এই DNA তে চারটি অক্ষর দিয়ে আপনার পুরো শরীরের গঠনের একটি ব্লুপ্রিন্ট (নকশা) সেট করা আছে। এই চারটি অক্ষর হলো- A, T, G, C
A= adenine
T=thymine
G =guanine
C=cytosine
বায়োলিজিষ্টরা সংক্ষেপে এটাকে বলে 'জেনেটিক কোড'।
কখনো কম্পিউটার প্রোগ্রামিং করেছেন? কম্পিউটারের প্রোগ্রামে যে বাইনারি কোড ব্যবহার করা হয় সেটি কি রকম? সেখানে যে সংখ্যা দুটি ব্যবহার করা হয় তা হলো 0 এবং 1 ।
কম্পিউটার প্রোগ্রামে বাইনারি সংখ্যাগুলো সাজানো থাকে এভাবে- 0000100011001011
এই সংখ্যাগুলোকে কোড হিসেবে ব্যবহার করে যে প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়, সেটার উপরই কম্পিউটারের পরবর্তী কাজ নির্দেশিত হয়।
ঠিক একইভাবে, DNA তেও A, T, G এবং C এই অক্ষর চারটির সমন্বয়ে কম্পিউটার প্রোগ্রামের মতোই একটি প্রোগ্রাম DNA তে সেট করা আছে।
এই প্রোগ্রামের নির্দেশনা অনুসারেই প্রাণীর শরীরে প্রোটিন তাদের কাজ করে।
এই প্রোগ্রামে যদি লেখা থাকে আপনার চোখ দেখতে হবে আপনার মায়ের মতো, তাহলে আপনার চোখ ঠিক সেরকমই হবে। এই কাজটা করবে প্রোটিন। প্রোটিন এই নির্দেশটা পাবে RNA থেকে। RNA তে এই নির্দেশ ডেলিভারি করবে DNA ।
আপনার বাবা আপনাকে কোলে নিয়ে কপালে চুমু খেতে খেতে আপনার মা'কে বলবেন, 'দেখো, বাবুর চোখ দুটো দেখতে ঠিক তোমার মতো?'
এটা কেন হলো? কারন, DNA.....
ঊনবিংশ শতাব্দীর নাস্তিকতা যার কাঁধের উপর ভর করে এগিয়েছিলো, তাঁর নাম Antony Flew।
উনাকে বলা হতো নাস্তিকদের 'ভাবগুরু।'
নাস্তিকতার পক্ষে উনি প্রচুর সংখ্যক বই লিখেছেন, লেকচার দিয়েছেন, তর্ক করেছেন।
কিন্তু ২০০৪ সালে এই বিখ্যাত নাস্তিক একদম ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা দিয়ে আস্তিক হয়ে গেলেন।
আস্তিক হবার যে কয়েকটি মেজর কারণ/প্রমান তিনি উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটি হলো DNA'র মধ্যে এই অপূর্ব 'তথ্য' তথা 'ইনফরমেশন'।
তিনি প্রশ্ন করেছেন, 'কোন ফিজিক্সের ল, কোন ন্যাচারাল কজ কখনোই একটি সিঙ্গেল কোড তৈরিতেও অক্ষম। তাহলে প্রাণের স্পন্দন DNA'র মধ্যে এই ইনফরনেশন তথা এরকম সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা কিভাবে এলো যার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে প্রাণীর শরীর? নিশ্চই এতে কোন সুপার ন্যাচারাল ইন্টেলিজেন্সের হাত আছে।'
তিনি লিখেছেন, ‘almost entirely because of the DNA investigations . What I think the DNA material has done is that it has shown, by the almost unbelievable complexity of the arrangements which are needed to produce (life), that intelligence must have been involved in getting these extraordinarily diverse elements to work together'
এই DNA'র মধ্যে কি পরিমাণ তথ্য তথা ইনফরমেশন মজুদ আছে বা রাখা যাবে জানেন?

বিখ্যাত এথেইষ্ট বায়োলজিষ্ট, রিচার্ড ডকিন্স লিখেছেন- ‘There is enough information capacity in a single human cell to store the Encyclopaedia Britannica, all 30 volumes of it , three or four times over’.

একটা মাত্র কোষের মধ্যে (কোষের মধ্যে থাকে DNA) সে পরিমাণ তথ্য রাখা যাবে যা দিয়ে ৪-৫ টি ৩০ ভলিউমের এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা লেখা যাবে।চিন্তা করতে পারেন?

শুধুমাত্র একটা কোষের মধ্যে যে পরিমাণ তথ্য আছে তা যদি কোন মানুষ পড়া শুরু করে, প্রতি ১ সেকেন্ডে যদি ৩ টি শব্দ সে পড়তে পারে, তাহলে একটি কোষের তথ্য পড়ে শেষ করতে একজন মানুষের সময় লাগবে ৩১ বছর।

বিজ্ঞানি Dr. Francis Collins, যিনি Human Genome Project এর হেড ডিরেক্টর, তিনি DNA সম্পর্কে বলেছেন,- "think of DNA as an instructional script, a software program, sitting in the nucleus of the cell."

DNA কি পরিমান তথা তথা ইনফরমেশন ধারন করে উপরে তার কিছুটা নমুনা দেখানো হলো মাত্র।

এই ইনফরমেশন DNA'র মধ্যে কিভাবে এলো?

কোথা হতে এলো? এর কোন সদুত্তর নাস্তিক জীব বিজ্ঞানীরা দিতে পারেন নি।

তারা যা বলে তা হচ্ছে এরকম, ' ধরুন, আপনার কিচেনে একটি হিটার আছে। হিটারের পাশে একটি পটে চিনি, একটি পটে চা পাতা, একটি পটে দুধ এবং একটি মগে কিছু পানি রাখা আছে। এখন হলো কি, আপনার হিটারটি নিজে নিজে অন হয়ে গেলো, মগ থেকে পানি নিজে নিজে গিয়ে হিটারের উপর রাখা পাত্রে এসে পড়লো, পানি গরম হলো। এরপর পটগুলো থেকে পরিমিত পরিমাণ চিনি, চা পাতা, দুধ নিজে নিজে গিয়ে পাত্রের গরম হওয়া জলে মিশে গেলো এবং তৈরি হয়ে গেলো এককাপ সুস্বাদু চা। এই চা আবার নিজে নিজেই একটি কাপে গিয়ে সুন্দর করে পরিবেশন হলো।আপনি এসে দেখলেন যে আপনার পড়ার টেবিলে এককাপ গরম গরম চা। প্রশ্ন- 'এই চা কিভাবে এলো?'

তাদের উত্তর- 'সাইন্সের ব্লাইন্ড ল অনুসারে।'

হাস্যকর!!

সাইন্সের ব্লাইন্ড ল মেনে এককাপ চা তৈরি হলেও হতে পারে (!!), কিন্তু ইনফরমেশন তথা তথ্য আসার জন্য যে একটি কনসিয়াস মাইন্ড দরকার, তা আমরা ইতোপূর্বে ক্লিয়ার করেছি। এমনকি, বিজ্ঞান মহলে সুপরিচিত 'ইনফরমেশন থিওরি' ও বলে, কোন এনার্জি বা ম্যাটার থেকে কোন ইনফরমেশন পাওয়া যায় না।

তাহলে DNA'র মধ্যে এরকম সুনির্দিষ্ট, সুপরিকল্পিত, সুসজ্জিত তথ্য কোথা থেকে এলো?

আমরা এর জন্য ৪ টি ধারণার অবতারণা করতে পারি।

১/ হয়তো, কোন মানুষ এই তথ্যগুলো DNA তে লিখে দিয়েছে।

২/ হয়তো কোন এলিয়েন এই তথ্যগুলো DNA তে লিখে দিয়েছে।

৩/ হয়তো সাইন্সের সূত্রগুলো নিজে নিজে কার্যকরী হয়ে এটা লিখে ফেলেছে।

৪/ হয়তো কোন অতি প্রাকৃতিক বুদ্ধিমান সত্বা এই তথ্যগুলো DNA তে লিখে রেখেছে।

এখন, সমী (১) অনুসারে যদি ধরে নিই যে কোন মানুষ এটি লিখে রেখেছে, তাহলে প্রশ্ন আসে, এই মানুষের শরীরে যে DNA আছে, তাতে কে তথ্যগুলো লিখলো তাহলে?

দেখা যাচ্ছে সমী-১ বাতিল।

সমী-২ অনুসারে যদি ধরে নিই যে, কোন এলিয়েন এটি লিখেছে, তাহলেও একই প্রশ্ন- এই এলিয়েনের যে বুদ্ধি তা কোন বুদ্ধিমান সত্বা দান করেছে?

তাহলে এটাও বাতিল।

ইনফরমেশন থিওরি মতে সমী-৩ নিজে নিজেই বাতিল হয়ে যায়। কারন, কোন আনকসিয়াস মাইন্ড, কোন বস্তু কখনোই কোন তথ্য তথা ইনফরমেশন প্রোডিউস করতে সক্ষম নয়। পৃথিবীতে এমন একটি প্রমাণও নেই, যেখানে দেখা গেছে সাইন্সের সূত্রগুলো নিজে নিজে কার্যকর হয়ে শেক্সপিয়ারের মতো একটি সনেট লিখে ফেলেছে। তাহলে এটাও বাতিল।

বাকি থাকলো সমী- ৪। এই তথ্য DNA তে কোথা হতে এলো?

প্রপার এবং লজিক্যাল এন্সার হলো- অতি প্রাকৃত কোন সত্বা থেকে।
ঠিক যেমনটা বলেছেন এককালের নাস্তিকদের গুরু, Dr. Antony Flew- ‘almost entirely because of the DNA investigations . What I think the DNA material has done is that it has shown, by the almost unbelievable complexity of the arrangements which are needed to produce (life), that intelligence must have been involved in getting these extraordinarily diverse elements to work together'
যেমনটা বলেছেন হার্ভাডের গবেষক, বায়োলজিষ্ট Dr. Stephen C Meyer - ' the kind of information that DNA contains, namely, functionally specified information.And it requires a designer'
তাহলে DNA তে এই তথ্য কোথা হতে এলো এর একটিই গ্রহণযোগ্য উত্তর হলো- স্রষ্টা থেকে।'
সাজিদের ডায়েরিতে এইটুকুই লেখা। আমি ডায়েরিটা বন্ধ করলাম। ভাবলাম, আমি নিজেও একজন জেনেটিক্সের ছাত্র। এই DNA নিয়ে আমি কতো পড়েছি, কতো জেনেছি কিন্তু এভাবেও যে ভাবা যায়, তা-ই আমি কোনদিন ভাবিনি।
হঠাৎ খেয়াল করলাম আমার কাঁধে কেউ একজনের হাত। আমি পাশ ফিরলাম। দেখলাম সাজিদ দাঁড়িয়ে। সে বললো, 'কি পড়ছিস?'
- 'একটি DNA'র জবানবন্দী'
- 'কি বুঝলি?'
আমার মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে আসলো এই আয়াত,- 'শীঘ্রই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাবো আর তাদের নিজেদের মধ্যেও। যখন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ কুরআন সত্য।'
সাজিদ মুচকি হাসলো। খুব রহস্যময় সেই হাসি।
রেফারেন্সঃ

- If Darwin had known about DNA'- Dr. Harun Yahya
- There is a God : How the world's most notorious atheists changed his mind'- Antony Flew
- The blind watchmaker'- Richard Dawkins
- Siganature in the Cell'- Dr. Stephen C Mayer
- Language Of God'- Dr. Francis Collins

দেবাশীষ বললো, – 'ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে বিজ্ঞান খোঁজা আর আমাজন জঙ্গলের রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে সভ্যতা খোঁজা একই ব্যাপার। দুইটাই হাস্যকর। হা হা হা হা।'

ওর কথায় অন্যরা খুব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। সাকিব বললো, – 'দেখ দেবাশীষ, অন্য ধর্মগ্রন্থগুলোর ব্যাপারে জানি না, তবে আল কোরানে এমন অনেক বৈজ্ঞানিক ফ্যাক্ট নিয়ে বলা আছে যা বিজ্ঞান অতি সম্প্রতিই জানতে পেরেছে।'

দেবাশীষ বিদ্রুপের সুরে বললো, – 'হ্যাঁ। এইজন্যই তো মুসলমানদের কেউই নোবেল পায়না বিজ্ঞানে। সব অই ইহুদি-খ্রিষ্ঠানরাই মেরে দেয়। এখন আবার বলিস না যেন অইসব ইহুদি-খ্রিষ্ঠানগুলা কোরান পড়েই এসব বের করছে। হা হা হা। পারিসও ভাই তোরা। হা হা হা।'

.

রাকিব বললো,- 'নোবেল লাভ করার উদ্দেশ্যে তো কোরান নাজিল হয়নি, কোরান এসেছে একটি গাইডবুক হিসেবে।মানুষকে মুত্তাকী বানাতে।'

– 'হুম, তো?'- দেবাশীষের প্রশ্ন।

রাকিব কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো। ঠিক সেসময় সাজিদ বলে উঠলো,- 'আমি দেবাশীষের সাথে একমত। আমাদের উচিত না ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে বিজ্ঞান খোঁজা।'

সাজিদের কথা শুনে আমরা সবাই 'থ' হয়ে গেলাম। কোথায় সে দেবাশীষকে যুক্তি আর প্রমান দিয়ে একহাত নেবে তা না, উল্টো সে দেবাশীষের পক্ষেই সাফাই করছে।

সাজিদ আবার বলতে লাগলো,- 'আরো ক্লিয়ারলি, বিজ্ঞান দিয়ে ধর্মগ্রন্থগুলোকে যাচাই করা ঠিক না। কারণ, ধর্মগ্রন্থগুলো ইউনিক।পাল্টানোর সুযোগ নেই।কিন্তু বিজ্ঞান প্রতিনিয়তই পাল্টায়। বিজ্ঞান এতোই ছলনাময়ী যে, পৃথিবীর ইতিহাসের সবচে সেরা বিজ্ঞানি, স্যার আলবার্ট আইনষ্টাইনকেও তার দেওয়া মত তুলে নিয়ে ভুল স্বীকার করতে হয়েছে।'

দেবাশীষ বললো,- 'মানে? তুই কি বলতে চাস?'

সাজিদ মুচকি হাসলো। বললো,- 'দোস্ত, আমি তো তোকেই ডিফেন্ড করছি। বলছি যে, ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান খোঁজা আর তা দিয়ে ধর্মগ্রন্থকে জাজ করা করাটা বোকামি। আচ্ছা বাদ দে। দেবাশীষ, শেক্সপিয়ারের রচনা তোর কা.ছে কেমন লাগে রে?'

আমি একটু অবাক হলাম। এই আলোচনায় আবার শেক্সপিয়ার কোত্থেকে এসে পড়লো? যাহোক, কাহিনী কোনদিকে মোড় নেয় দেখার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

দেবাশীষ বললো,- 'ভালো লাগে। কেন?'

– 'হ্যামলেট পড়েছিস?'

– 'হ্যাঁ।'

– 'পড়ে নিশ্চয় কান্না পেয়েছে?'

দেবাশীষ বাঁকা চোখে সাজিদের দিকে তাকালো।সাজিদ বললো,- 'আরে বাবা, এটা তো কোন রোমান্টিক রচনা না যে এটা পড়ে মজা পেয়েছিস কিনা জিজ্ঞেস করবো। এটা একটা করুণ রসভিত্তিক রচনা। এটা পড়ে মন খারাপ হবে, কান্না পাবে এটাই স্বাভাবিক, তাই না?'

দেবাশীষ কিচ্ছু বললো না।

সাজিদ আবার বললো,- ‘শেক্সপিয়ারের A Mid Summer Night’s Dream পড়েছিস? কিংবা, Comedy Of Errors?’
– ‘হ্যাঁ।
– ‘Comedy Of Errors পড়ে নিশ্চই হেসে কুটিকুটি হয়েছিস, তাই না? ‘হাহাহাহা।’

দেবাশীষ বললো,- ‘হ্যাঁ। মজার রচনা।’
সাজিদ বললো,- ‘তোকে শেক্সপিয়ারের আরেকটি নাটকের নাম বলি। হয়তো পড়ে থাকবি। নাটকের নাম হচ্ছে ‘Henry The Fourth’. ধারনা করা হয়, শেক্সপিয়ার এই নাটকটি লিখেছিলেন ১৫৯৭ সালের দিকে এবং সেটি প্রিন্ট হয় ১৬০৫ সালের দিকে।’
– ‘তো?’
– ‘আরে বাবা, বলতে দে। সেই নাটকের একপর্যায়ে মৌমাছিদের নিয়ে দারুন কিছু কথা আছে। শেক্সপিয়ার দেখিয়েছেন, পুরুষ মৌমাছিদের একজন রাজা থাকে। রাজাটা নির্ধারিত হয় পুরুষ মৌমাছিদের ভেতর থেকেই। রাজা ব্যতীত, অন্যান্য মৌমাছিরা হলো সৈনিক মৌমাছি। এই সৈনিক মৌমাছিদের কাজ হলো মৌছাক নির্মান, মধু সংগ্রহ থেকে শুরু করে সব। রাজার নির্দেশমতো, সৈনিক মৌমাছিরা তাদের প্রাত্যহিক কাজ শেষ করে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে রাজা মৌমাছির কাছে জবাবদিহি করে। অনেকটা প্রাচীন যুগের রাজা বাদশাহদের শাসনের মতো আর কি।’

আমরা সবাই শেক্সপিয়ারের গল্প শুনছি। কারো মুখে কোন কথা নেই।

সাজিদ আবার শুরু করলো-
‘চিন্তা কর, শেক্সপিয়ারের আমলেও মানুষজনের বিশ্বাস ছিলো যে, মৌমাছি দু প্রকার। স্ত্রী মৌমাছি আর পুরুষ মৌমাছি। স্ত্রী মৌমাছি খালি সন্তান উৎপাদন করে, আর বাদবাকি কাজকর্ম করে পুরুষ মৌমাছিরা।’

সাকিব বললো,- ‘তেমনটা তো আমরাও বিশ্বাস করি। এবং, এটাই তো স্বাভাবিক,তাই না?’
– ‘হা হা হা। এরকমটাই হওয়া স্বাভাবিক ছিলো, কিন্তু মৌমাছির জীবনচক্র অন্যান্য কীট পতঙ্গের তুলনায় একদম আলাদা।’
– ‘কি রকম?’- রাকিবের প্রশ্ন।

সাজিদ বললো,- ‘১৯৭৩ সালে অষ্ট্রিয়ান বিজ্ঞানি Karl Von-Frisch ‘Physiology of Medicine’ বিষয়ে সফল গবেষণার জন্য চিকিৎবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছেন।তার গবেষণার বিষয় ছিল ‘মৌমাছির জীবনচক্র’।অর্থাৎ, মৌমাছিরা কিভাবে তাদের জীবন নির্বাহ করে।

এই গবেষণা চালাতে গিয়ে তিনি এমন সব আশ্চর্জজনক জিনিস সামনে নিয়ে এলেন, যা শেক্সপিয়ারের সময়কার পুরো বিশ্বাসকে পাল্টে দিলো। তিনি ফটোগ্রাফি এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে করে দেখিয়েছেন যে, মৌমাছি দুই প্রকার নয়, মৌমাছি আসলে তিন প্রকার।
প্রথমটা হলো, পুরুষ মৌমাছি।
দ্বিতীয়টি হলো স্ত্রী মৌমাছি। এই মৌমাছিদের বলা হয় Queen Bee. এরা শুধু সন্তান উৎপাদন করা ছাড়া আর কোন কাজ করে না। এই দুই প্রকার ছাড়াও আরো একপ্রকার মৌমাছি আছে। লিঙ্গভেদে এরাও স্ত্রী মৌমাছি তবে একটু ভিন্ন।’

– ‘কি রকম?’- দেবাশীষ প্রশ্ন করলো।

'আমরা জানি, পুরুষ মৌমাছিরাই মৌচাক নির্মান থেকে শুরু করে মধু সংগ্রহ সব করে থাকে কিন্তু এই ধারনা ভুল। পুরুষ মৌমাছি শুধু একটিই কাজ করে, আর তা হলো কেবল রানী মৌমাছিদের প্রজনন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা। মানে, সন্তান উৎপাদনে সহায়তা করা। এই কাজ ছাড়া পুরুষ মৌমাছির আর কোন কাজ নেই।'
– 'তাহলে মৌচাক নির্মান থেকে শুরু করে বাকি কাজ কারা করে?'- রাকিব জিজ্ঞেস করলো।
– 'হ্যাঁ। তৃতীয় প্রকারের মৌমাছিরাই বাদ বাকি সব কাজ করে থাকে। লিঙ্গভেদে এরাও স্ত্রী মৌমাছি, কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে এরা সন্তান জন্মদানে অক্ষম।সোজা কথায়, এদের বন্ধ্যা বলা যায়।'

আমি বললাম,- 'ও আচ্ছা।'

সাজিদ আবার বলতে লাগলো,- 'বিজ্ঞানি Karl Von-Frisch এই বিশেষ শ্রেণীর স্ত্রী মৌমাছিদের নাম দিয়েছেন Worker Bee বা কর্মী মৌমাছি। এরা Queen Bee তথা রানী মৌমাছির থেকে আলাদা একটি দিকেই।সেটা হলো রানী মৌমাছির কাজ হলো সন্তান উৎপাদন, আর কর্মী মৌমাছির কাজ সন্তান জন্ম দেওয়া ছাড়া অন্যসব।'
সাকিব বললো,- 'বাহ, দারুন তো। এরা কি প্রাকৃতিকভাবেই সন্তান জন্মদানে অক্ষম হয়ে থাকে?'

– 'হ্যাঁ।'
– 'আরো, মজার ব্যাপার আছে। বিজ্ঞানি Karl Von-Frisch আরো প্রমান করেছেন যে, এইসব কর্মী মৌমাছিরা যখন ফুল থেকে রস সংগ্রহে বের হয়, তখন তারা খুব অদ্ভুত একটি কাজ করে।সেটা হলো, ধর, কোন কর্মী মৌমাছি কোন এক জায়গায় ফুলের উদ্যানের সন্ধান পেলো যেখান থেকে রস সংগ্রহ করা যাবে। তখন অই মৌমাছিটি তার অন্যান্য সঙ্গীদের এই ফুলের উদ্যান সম্পর্কে খবর দেয়।

মৌমাছিটি ঠিক সেভাবেই বলে, যেভাবে যে পথ দিয়ে সে অই উদ্যানে গিয়েছিলো।মানে, এক্সাক্ট যে পথে সে এই উদ্যানের সন্ধান পায়, সে পথের কথাই অন্যদের বলে।আর, অন্যান্য মৌমাছিরাও ঠিক তার বাতলে দেওয়া পথ অনুসরণ করেই সে উদ্যানে পৌঁছে। একটুও হেরফের করেনা।বিজ্ঞানি Karl Von-Frisch এই ভারি অদ্ভুত জিনিসটার নাম রেখেছে 'Waggle Dance'..

আমি বললাম,- 'ভেরি ইন্টারেষ্টিং......'
সাজিদ বললো,- 'মোদ্দাকথা, Karl Von-Frisch প্রমান করেছেন যে, স্ত্রী মৌমাছি দু প্রকারের। রানী মৌমাছি আর কর্মী মৌমাছি। দুই প্রকারের কাজ সম্পূর্ণ আলাদা।আর, পুরুষ মৌমাছি মৌচাক নির্মান, মধু সংগ্রহ এসব করে না। এসব করে কর্মী স্ত্রী মৌমাছিরাই।'
এই পুরো জিনিসটার উপর Karl Von-Frisch একটি বইও লিখেছেন। বইটির নাম- 'The Dancing Bees'. এই জিনিসগুলা প্রমান করে তিনি ১৯৭৩ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পান।

এতোটুকু বলে সাজিদ থামলো। দেবাশীষ বললো,- 'এতোকিছু বলার উদ্দেশ্য কি?'

সাজিদ তার দিকে তাকালো। এরপর বললো,- 'যে জিনিসটা ১৯৭৩ সালে বিজ্ঞান প্রমান করেছে, সেই জিনিসটা ১৫০০ বছর আগে কোরান বলে রেখেছে।'
দেবাশীষ সাজিদের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকালো।
সাজিদ বললো,- 'কোরান যেহেতু আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছে, আমাদের আরবি ব্যাকরণ অনুসারে তার অর্থ বুঝতে হবে। বাংলা কিংবা ইংরেজি কোনটাতেই পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গের জন্য আলাদা আলাদা ক্রিয়া (Verb) ব্যবহৃত হয় না।

যেমন ইংলিশে পুংলিঙ্গের জন্য আমরা বলি, He does the work, আবার স্ত্রী লিঙ্গের জন্যও বলি, She does the work..

খেয়াল করো, দুটো বাক্যে জেন্ডার পাল্টে গেলেও ক্রিয়া পাল্টেনি। পুংলিঙ্গের জন্য যেমন does, স্ত্রীলিঙ্গের জন্যও does. কিন্তু আরবিতে সেরকম নয়। আরবিতে জেন্ডারভেদে ক্রিয়ার রূপ পাল্টে যায়।'

আমরা মনোযোগী শ্রোতার মতো শুনছি।

সে বলে যাচ্ছে-
'কোরানে মৌমাছির নামেই একটি সূরা আছে। নাম সূরা আন-নাহল। এই সূরার ৬৮ নাম্বার আয়াতে আছে- '(হে মুহাম্মদ) আপনার রব মৌমাছিকে আদেশ দিয়েছেন যে, মৌচাক বানিয়ে নাও পাহাড়ে,বৃক্ষে এবং মানুষ যে গৃহ নির্মান করে, তাতে।'

খেয়াল কর, এখানে সন্তান জন্মদানের কথা বলা হচ্ছে না কিন্তু। মৌচাক নির্মানের কথা বলা হচ্ছে।
Karl Von-Frisch আমাদের জানিয়েছেন, মৌচাক নির্মানের কাজ করে থাকে স্ত্রী কর্মী মৌমাছি।এখন আমাদের দেখতে হবে কোরান কোন মৌমাছিকে এই নির্দেশ দিচ্ছে।স্ত্রী মৌমাছিকে? নাকি, পুরুষ মৌমাছিকে।

যদি পুরুষ মৌমাছিকে এইই নির্দেশ দেয়, তাহলে ধরে নিতে হবে, আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে কোরান ভুল। আরবি ব্যাকরণে, পুরুষ মৌমাছিকে মৌচাক নির্মান কাজের নির্দেশ দিতে যে ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় তা হলো 'ইত্তাখিজ' আর স্ত্রী মৌমাছির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় 'ইত্তাখিজি'।
অত্যন্ত আশ্চর্জনক ব্যাপার হচ্ছে, কোরান এই আয়াতে 'মৌমাছিকে নির্দেশ দিতে 'ইত্তাখিজ' ব্যবহার না করে, 'ইত্তাখিজি' ব্যবহার করেছে।মানে, এই নির্দেশটা কোরান নিঃসন্দেহে স্ত্রী মৌমাছিকেই দিচ্ছে, পুরুষ মৌমাছিকে নয়।

বলতো দেবাশীষ, এই সুক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক ব্যাপারটি মুহাম্মদ সাঃ ১৫০০ বছর আগে কোন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন? এমনকি, শেক্সপিয়ারের সময়কালেও যেখানে এটা নিয়ে ভুল ধারনা প্রচলিত ছিলো?'
দেবাশীষ চুপ করে আছে। সাজিদ আবার বলতে লাগলো,- 'শুধু এই আয়াত নয়, এর পরের আয়াতে আছে 'অত:পর, চোষন করে নাও প্রত্যেক ফুল থেকে,এবং চল স্বীয় রবের সহজ-সরল পথে'।

চোষণ বা পান করার ক্ষেত্রে আরবিতে পুংলিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয় 'কুল' শব্দ, এবং স্ত্রীলিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয় 'কুলি'। কোরান এখানে 'কুল' ব্যবহার না করে 'কুলি' ব্যবহার করেছে। 'সহজ সরল পথে' চলার নির্দেশের ক্ষেত্রে পুংলিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত শব্দ 'উসলুক', এবং স্ত্রীলিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয় 'উসলুকি'। মজার ব্যাপার, কোরান 'উসলুক' ব্যবহার না করে, 'উসলুকি' ক্রিয়া ব্যবহার করেছে।মানে, নির্দেশটা পুরুষ মৌমাছির জন্য নয়, স্ত্রী মৌমাছির জন্য।

আরো মজার ব্যাপার, এই আয়াতে কোরান মৌমাছিকে একটি 'সহজ সরল' পথে চলার নির্দেশ দিচ্ছে।আচ্ছা, মৌমাছির কি পরকালে জবাবদিহিতার কোন দায় আছে? পাপ পূণ্যের? নেই। তাহলে তাদের কেন সহজ সরল পথে চলার নির্দেশ দেওয়া হলো?
খেয়াল কর, বিজ্ঞানি Karl Von-Frisch মৌমাছিদের ব্যাপারে যে আশ্চর্যজনক ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছেন, তা হলো- তারা ঠিক যে পথে কোন ফুলের উদ্যানের সন্ধান পায়, ঠিক একই পথের,একই রাস্তা অন্যদের বাতলে দেয়।কোন হেরফের করে না। অন্যরাও ঠিক সে পথ অনুসরণ করে উদ্যানে পৌঁছে।এটাই তাদের জন্য সহজ-সরল পথ।বিজ্ঞানি Karl Von-Frisch এটার নাম দিয়েছেন 'Waggle Dance'. কোরানও কি ঠিক একই কথা বলছে না?

দেবাশীষ, এখন তোকে যদি প্রশ্ন করি, কোরান কি এই জিনিসগুলো বিজ্ঞানি Karl Von-Frisch এর থেকে নকল করেছে?
তোর উত্তর হবে 'না।' কারন, তিনি এসব প্রমান করেছেন মাত্র সেদিন। ১৯৭৩ সালে। কোরান নাজিল হয়েছে আজ থেকে ১৫০০ বছর আগে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন নিরক্ষর মুহাম্মদ সাঃ এই বৈজ্ঞানিক ব্যাপারগুলো ঠিক কোথায় পেলেন? কোরান কেন এই নির্দেশগুলো পুরুষ মৌমাছিকে দিলো না? কেন স্ত্রী মৌমাছিকে দিলো?

যদি এই কোরান সুপার ন্যাচারাল কোন শক্তি, যিনিই এই মৌমাছির সৃষ্টিকর্তা, যিনিই মৌমাছিদের এই জীবনচক্রের জন্য উপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন তার নিকট থেকে না আসে, তাহলে ১৫০০ বছর আগে আরবের মরুভূমিতে বসে কে এটা বলতে পারে?

যে জিনিস ১৯৭৩ সালে আবিষ্কার করে বিজ্ঞানি Karl Von-Frisch নোবেল পেলেন, তা কোরানে বহু শতাব্দী আগেই বলা আছে।কই, মুসলিমরা কি দাবি করেছে Karl Von-Frisch কোরান থেকে নকল করেছে? করে নি। মুসলিমরা কি তার নোবেল পুরষ্কারে ভাগ বসাতে গেছে? না, যায় নি।কারন এর কোনটাই কোরানের উদ্দেশ্য নয়।

আমরা বিজ্ঞান দিয়ে কোরানকে বিচার করি না, বরং, দিনশেষে, বিজ্ঞানই কোরানের সাথে এসে কাঁধে কাঁধ মিলায়।

এতোটুকু বলে সাজিদ থেমে গেলো। দেবাশীষ কিছুই বলছে না। সাকিব আর রাকিবের চেহারাটা তখন দেখার মতো। তারা খুবই উৎফুল্ল এবং খোশমেজাজি একটা চেহারায় দেবাশীষের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন তারা বলতে চাইছে- 'দে দে ব্যাটা। পারলে এবার কোন উত্তর দে............'
স্রষ্টা কি এমনকিছু বানাতে পারবে যেটা স্রষ্টা নিজে তুলতে পারবে না?

ছুটির দিনে সারাদিন রুমে বসে থাকা ছাড়া আমার আর কোন কাজ থাকেনা।সপ্তাহের এই দিনটি অন্য সবার কাছে ঈদের মতো মনে হলেও, আমার কাছে এই দিনটি খুবই বিরক্তিকর।ক্লাশ,ক্যাম্পাস,আড্ডা এসব স্তিমিত হয়ে যায়।
এই দিনটি আমি রুমে শুয়ে-বসে-ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলেও, সাজিদ এই দিনের পুরোটা সময় লাইব্রেরিতে কাটিয়ে দেয়। লাইব্রেরিতে ঘুরে ঘুরে নানান বিষয়ের উপর বই নিয়ে আসে।
আজ সকালেও সে বেরিয়েছে লাইব্রেরির উদ্দেশ্যে।ফিরবে জুমা'র আগে।হাতে থাকবে একগাদা মোটা মোটা বই।

বাসায় আমি একা। ভাবলাম একটু ঘুমোবো। কাল অনেক রাত পর্যন্ত বসে বসে এ্যাসাইনমেণ্ট রেডি করেছি।চোখদুটো জবা ফুলের মতো টকটকে লাল হয়ে আছে।আমি হাঁই তুলতে তুলতে যেই ঘুমোতে যাবো, অমনি দরজার দিক থেকে কেউ একজনের কাঁশির শব্দ কানে এলো।
ঘাঁড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকাতেই দেখলাম, একজোড়া বড় বড় চোখ চশমার ভিতর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে নিলাম। পরনে শার্ট-প্যান্ট। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা।লোকটার চেহারায় সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত 'ফেলুদা' চরিত্রের কিছুটা ভাব আছে।লোকটা আমার চোখাচোখি হতেই পিক করে হেসে দিলো।এরপর বললো,- 'এটা কি সাজিদের বাসা?'
প্রশ্নটা আমার গায়ে লাগলো। সাজিদ কি বাইরে সবাইকে এটাকে নিজের একার বাসা বলে বেড়ায় নাকি? এই বাসার যা ভাড়া, তা সাজিদ আর আমি সমান ভাগ করে পরিশোধ করি।তাহলে,যুক্তিমতে বাসাটা তো আমারও।
লোকটা যতোটা উৎসাহ নিয়ে প্রশ্নটা করেছে, তার দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে আমি বললাম,- 'এটা সাজিদ আর আমার দুজনেরই বাসা।'
লোকটা আমার উত্তর শুনে আবারো পিক করে হেসে দিলো।
ততক্ষনে লোকটা ভেতরে চলে এসেছে।

সাজিদকে খুঁজতে এরকম প্রায়ই অনেকেই আসে।সাজিদ রাজনীতি না করলেও, নানারকম স্বেচ্ছাসেবী মূলক সংগঠনের সাথে যুক্ত আছে।
লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে বললো,- 'সাজিদ মনে হয় ঘরে নেই, না?'
আমি হাঁই তুলতে তুলতে বললাম,- 'জ্বি না। বই আনতে গেছে। অপেক্ষা করুন, চলে আসবে।'
লোকটাকে সাজিদের চেয়ারটা টেনে বসতে দিলাম।তিনি বললেন,- 'তোমার নাম?'
- 'আরিফ।'
- 'কোথায় পড়ো?'
- 'ঢাবি তে।'
- 'কোন ডিপার্টমেণ্ট?'
- 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং'
লোকটা খুব করে আমার প্রশংসা করলো।এরপর বললো,- 'আমি প্রথমে ভেবেছিলাম তুমিই সাজিদ।'
লোকটার কথা শুনে আমার ছ নাম্বার হাঁইটা মূহুর্তেই মুখ থেকে গায়েব হয়ে গেলো। ব্যাপার কি? এই লোক কি সাজিদ কে চিনে না?
আমি বললাম,- 'আপনি সাজিদের পরিচিত নন?'
- 'না।'
- 'তাহলে?'
লোকটা একটু ইতস্তত বোধ করলো মনে হচ্ছে।এরপর বললো,- 'আসলে আমি একটি প্রশ্ন নিয়ে এসেছি সাজিদের কাছে। প্রশ্নটি আমাকে করেছিলো একজন নাস্তিক।আমি আসলে কারো কাছে এটার কোন সন্তোষজনক উত্তর পাইনি,তাই।'
আমি মনে মনে বললাম,- 'বাবা সাজিদ, তুমি তো দেখি এখন সক্রেটিস বনে গেছো।পাবলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তোমার দ্বারস্থ হয়।'
লোকটার চেহারায় একটি গম্ভীর ভাব আছে।দেখলেই মনে হয় এই লোক অনেক কিছু জানে,বোঝে।কিন্তু কি এমন প্রশ্ন, যেটার কোন ফেয়ার এন্সার উনি পাচ্ছেন না? কৌতুহল বাড়লো।
আমি মুখে এমন একটি ভাব আনলাম, যেন আমিও সাজিদের চেয়ে কোন অংশে কম নই।বরং, তারচেয়ে কয়েক কাঠি সরেশ। এরপর বললাম,- 'আচ্ছা, কি সেই প্রশ্ন?'
লোকটা আমার অভিনয়ে বিভ্রান্ত হলো।হয়তো ভাবলো,আমি সত্যিই ভালো কোন উত্তর দিতে পারবো।
বললো,- 'খুবই ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন। স্রষ্টা সম্পর্কিত।'
আমি মনে মনে তখন প্রায়ই লেজেগোবরে অবস্থা।কিন্তু মুখে বললাম,- 'প্রশ্ন যে খুবই ক্রিটিক্যাল,সেটা তো বুঝেছি। নইলে ঢাকা শহরের এই জ্যাম-ট্যাম মাড়িয়ে কেউ এত কষ্ট করে এখানে আসে?'
আমার কথায় লোকটা আবারো বিভ্রান্ত হলো এবং আমাকে ভরসা করলো। এরপর বললো,- ' আগেই বলে নিই, প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ/না হতে হবে।
- 'আপনি আগে প্রশ্ন করুন,তারপর উত্তর কি হবে দেখা যাবে।'- আমি বললাম।
- 'প্রশ্নটা হচ্ছে- স্রষ্টা কি এমন কোনকিছু বানাতে পারবে, যেটা স্রষ্টা উঠাতে পারবে না?'
আমি বললাম,- 'আরে, এতো খুবই সহজ প্রশ্ন। হ্যাঁ বলে দিলেই তো হয়।ল্যাটা চুকে যায়।'
লোকটা হাসলো। মনে হলো, আমার সম্পর্কে উনার ধারনা পাল্টে গেছে।এই মূহুর্তে উনি আমাকে গবেট, মাথামোটা টাইপ কিছু ভাবছেন হয়তো।
আমি বললাম,- 'হাসলেন কেন? ভুল বলেছি?'
লোকটা কিছু না বলে আবার হাসলো। এবার লোকটার হাসি দেখে আমি নিজেই বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। প্রশ্নটা আবার মনে করতে লাগলাম।
স্রষ্টা কি এমন কোনকিছু বানাতে পারবে, যেটা স্রষ্টা উঠাতে পারবে না????
উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে ধরে নিচ্ছি যে, স্রষ্টা জিনিসটা বানাতে পারলেও,সেটা তুলতে পারবে না। আরে, এটা কিভাবে সম্ভব? স্রষ্টা পারে না এমন কোন কাজ আছে নাকি আবার? আর, একটা জিনিস উঠানো কি এমন কঠিন কাজ যে স্রষ্টা সেটা পারবে না?

আবার চিন্তা করতে লাগলাম। উত্তর যদি 'না' হয়, তাহলে ধরে নিচ্ছি যে- স্রষ্টা জিনিসটা উঠাতে পারলেও বানাতে পারবে না।
ও আল্লাহ! কি বিপদ! স্রষ্টা বানাতে পারবে না? এটা কিভাবে সম্ভব? হ্যাঁ বললেও আটকে যাচ্ছি, না বললেও আটকে যাচ্ছি।
লোকটা আমার চেহারার অস্থিরতা ধরে ফেলেছে।মুচকি মুচকি হাসতে শুরু করলো।আমি ভাবছি তো, ভাবছিই।

এর একটু পরে সাজিদ এলো। সে আসার পরে লোকটার সাথে তার প্রাথমিক আলাপ শেষ হলো।এর মাঝে লোকটা সাজিদকে বলে দিয়েছে যে, আমি প্রশ্নটার প্যাঁচে কি রকম নাকানিচুবানি খেলাম,সেটা।সাজিদও আমার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ হেসে নিলো।
এরপর সাজিদ তার খাটে বসলো।হাতে একটি কাগজের টোঙার মধ্যে বুট ভাজা।বাইরে থেকে কিনে এনেছে। সে বুটের টোঙাটা লোকটার দিকে ধরে বললো,- 'নিন, এখনো গরম আছে।'
লোকটা প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েও করলো না।কেন করলো না কে জানে।
লোকটা এবার সাজিদকে তার প্রশ্নটি সম্পর্কে বললো। প্রশ্নটি হলো-

স্রষ্টা কি এমন কিছু বানাতে পারবে, যেটা স্রষ্টা নিজেই তুলতে পারবে না?

এইটুকু বলে লোকটা এবার প্রশ্নটিকে ভেঙে বুঝিয়ে দিলো। বললো,- 'দেখো, এই প্রশ্নের উত্তরে যদি 'হ্যাঁ' বলো, তাহলে তুমি ধরে নিচ্ছ যে, স্রষ্টা জিনিসটি বানাতে পারলেও,তুলতে পারবে না। কিন্তু আমরা জানি স্রষ্টা সর্বশক্তিমান। কিন্তু যদি স্রষ্টা জিনিসটা তুলতে না পারে, তিনি কি আর সর্বশক্তিমান থাকেন? থাকেন না।
যদি এই প্রশ্নের উত্তরে তুমি 'না' বলো, তাহলে তুমি স্বীকার করছো যে, সেরকম কোন জিনিস স্রষ্টা বানাতে পারবে না যেটা তিনি তুলতে পারবেন।এখানেও স্রষ্টার 'সর্বশক্তিমান' গুণটি প্রশ্নবিদ্ধ। এই অবস্থায় তোমার উত্তর কি হবে?'

সাজিদ লোকটির প্রশ্নটি মন দিয়ে শুনলো।প্রশ্ন শুনে তার মধ্যে তেমন কোন ভাব লক্ষ্য করিনি।নরমাল।
সে বললো,- 'দেখুন সজিব ভাই, আমরা কথা বলবো লজিক দিয়ে,বুঝতে পেরেছেন?।'
এরমধ্যে সাজিদ লোকটির নামও জেনে গেছে। কিন্তু এই বয়োবৃদ্ধ লোকটিকে সে 'আঙ্কেল' কিংবা ঢাকা শহরের নতুন রীতি অনুযায়ী 'মামা' না ডেকে 'ভাই' কেন ডাকলো বুঝলাম না।
লোকটি মাথা নাড়লো।সাজিদ বললো,- 'যে মূহুর্তে আমরা যুক্তির শর্ত ভাঙবো, ঠিক সেই মূহুর্তে যুক্তি আর যুক্তি থাকবে না।যেটা তখন হবে কু-যুক্তি। ইংরেজিতে বলে- logical fallacy. সেটা তখন আত্মবিরোধের জন্ম দেবে, বুঝেছেন?'
- 'হ্যাঁ।'- লোকটা বললো।
- 'আপনি প্রশ্ন করেছেন স্রষ্টার শক্তি নিয়ে। তার মানে, প্রাথমিকভাবে আপনি ধরে নিলেন যে, একজন স্রষ্টা আছেন, রাইট?'
- 'হ্যাঁ।'
- 'এখন স্রষ্টার একটি অন্যতম গুণ হলো- তিনি অসীম, ঠিক না?'
- 'হ্যাঁ, ঠিক।'
- 'এখন আপনি বলেছেন, স্রষ্টা এমনকিছু বানাতে পারবে কিনা, যেটা স্রষ্টা তুলতে পারবে না। দেখুন, আপনি নিজেই বলেছেন, এমনকিছু, আই মিন something, রাইট?'
- 'হ্যাঁ।'
- 'আপনি 'এমনকিছু' বলে আসলে জিনিসটার একটা আকৃতি, শেইপ,আকার বুঝিয়েছেন, তাই না? যখনই something ব্যবহার করেছেন, তখন মনে মনে সেটার একটা শেইপ আমরা চিন্তা করি, করি না?'
- 'হ্যাঁ, করি।'
- 'আমরা তো এমন কিছুকেই শেইপ বা আকার দিতে পারি, যেটা আসলে সসীম, ঠিক?'
- 'হ্যাঁ, ঠিক।'
- 'তাহলে এবার আপনার প্রশ্নে ফিরে যান। আপনি ধরে নিলেন যে স্রষ্টা আছে।স্রষ্টা থাকলে তিনি অবশ্যই অসীম।এরপর আপনি তাকে এমন কিছু বানাতে বলছেন যেটা সসীম।যেটার নির্দিষ্ট একটা মাত্রা আছে,আকার আছে,আয়তন আছে। ঠিক না?'
- 'হ্যাঁ।'
- 'পরে শর্ত দিলেন, তিনি সেটা তুলতে পারবে না।দেখুন,আপনার প্রশ্নে লজিকটাই ঠিক নেই। একজন অসীম সত্বা একটি সসীম জিনিস তুলতে পারবে না, এটা তো পুরোটাই লজিকের বাইরের প্রশ্ন। খুবই হাস্যকর না? আমি যদি বলি, উসাইন বোল্ট কোনদিনও দৌঁড়ে ৩ মিটার অতিক্রম করতে পারবে না, এটা কি হাস্যকর ধরনের যুক্তি নয়?'
সজিব নামের লোকটা এবার কিছু বললেন না। চুপ করে আছেন।
সাজিদ উঠে দাঁড়ালো। এরমধ্যেই বুট ভাজা শেষ হয়ে গেছে।সে বইয়ের তাকে কিছু বই রেখে আবার এসে নিজের জায়গায় বসলো। এরপর আবার বলতে শুরু করলো-

'এই প্রশ্নটি করে মূলত আপনি স্রষ্টার 'সর্বশক্তিমান' গুণটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে প্রমান করতে চাইছেন যে, আসলে স্রষ্টা নেই।
আপনি 'সর্বশক্তিমান' টার্মটি দিয়ে বুঝাচ্ছেন যে, স্রষ্টা মানেই এমন এক সত্বা, যিনি যা ইচ্চা তাই করতে পারেন, রাইট?'
লোকটি বললেন,- 'হ্যাঁ। স্রষ্টা মানেই তো এমন কেউ, যিনি যখন যা ইচ্ছা, তাই করতে পারেন।'
সাজিদ মুচকি হাসলো। বললো,- 'আসলে সর্বশক্তিমান মানে এই না যে, তিনি যখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।সর্বশক্তিমান মানে হলো- তিনি নিয়মের মধ্যে থেকেই সবকিছু করতে পারেন।নিয়মের বাইরে গিয়ে তিনি কিছু করতে পারেন না।করতে পারেন না বলাটা ঠিক নয়, বলা উচিত তিনি করেন না। এর মানে এই না যে- তিনি সর্বশক্তিমান নন বা তিনি স্রষ্টা নন।এর মানে হলো এই- কিছু জিনিস তিনি করেন না, এটাও কিন্তু তার স্রষ্টা হবার গুণাবলি। স্রষ্টা হচ্ছেন সকল নিয়মের নিয়ন্ত্রক।এখন তিনি নিজেই যদি নিয়মের বাইরের হন- ব্যাপারটি তখন ডাবলষ্ট্যান্ড হয়ে যায়।স্রষ্টা এরকম নন। তার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।তিনি সেই বৈশিষ্টগুলো অতিক্রম করেন না।সেগুলো হলো তার মোরালিটি।এগুলো আছে বলেই তিনি স্রষ্টা, নাহলে তিনি স্রষ্টা থাকতেন না।'
সাজিদের কথায় এবার আমি কিছুটা অবাক হলাম।আমি জিজ্ঞেস করলাম- 'স্রষ্টা পারেনা এমন কি কাজ থাকতে পারে?'
সাজিদ আমার দিকে ফিরলো। ফিরে বললো,- 'স্রষ্টা কি মিথ্যা কথা বলতে পারে? ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারে? ঘুমাতে পারে? খেতে পারে?'
আমি বললাম,- 'আসলেই তো।'
সাজিদ বললো,- 'এগুলো স্রষ্টা পারেন না বা করেন না।কারন, এগুলা স্রষ্টার গুণের সাথে কন্ট্রাডিক্টরি।কিন্তু এগুলো করেন না বলে কি তিনি সর্বশক্তিমান নন? না। তিনি এগুলো করেন না,কারন, এগুলা তার মোরালিটির সাথে যায় না।'

এবার লোকটি প্রশ্ন করলো,- 'কিন্তু এমন জিনিস তিনি বানাতে পারবেন না কেন, যেটা তিনি তুলতে পারবেন না?'
সাজিদ বললো,- 'কারন, স্রষ্টা যদি এমন জিনিস বানান, যেটা তিনি তুলতে পারবেন না- তাহলে জিনিসটাকে অবশ্যই স্রষ্টার চেয়েও বেশি শক্তিশালী হতে হবে।স্রষ্টা যে মূহুর্তে এরকম জিনিস বানাবেন, সেই মূহুর্তেই তিনি স্রষ্টা হবার অধিকার হারাবেন।তখন স্রষ্টা হয়ে যাবে তারচেয়ে বেশি শক্তিশালী ওই জিনিসটি।কিন্তু এটা তো স্রষ্টার নীতি বিরুদ্ধ। তিনি এটা কিভাবে করবেন?'
লোকটা বললো,- 'তাহলে এমন জিনিস কি থাকা উচিত নয় যেটা স্রষ্টা বানাতে পারলেও তুলতে পারবে না?'
- 'এমন জিনিস অবশ্যই থাকতে পারে, তবে যেটা থাকা উচিত নয়, তা হলো- এমন প্রশ্ন।'
- 'কেন?'
এবার সাজিদ বললো,- 'যদি আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি, নীল রঙের স্বাদ কেমন? কি বলবেন? বা, ৯ সংখ্যাটির ওজন কতো মিলিগ্রাম, কি বলবেন?'
লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেলো মনে হলো। বললো,- 'নীল রঙের আবার স্বাদ কি? ৯ সংখ্যাটির ওজনই হবে কি করে?'
সাজিদ হাসলো। বললো,- 'নীল রঙের স্বাদ কিংবা ৯ সংখ্যাটির ওজন আছে কি নেই তা পরের ব্যাপার।থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে।তবে, যেটা থাকা উচিত নয় সেটা হলো নীল রঙ এবং ৯ সংখ্যা নিয়ে এই ধরনের প্রশ্ন।'
সাজিদ বললো,- 'ফাইনালি আপনাকে একটি প্রশ্ন করি। আপনার কাছে দুটি অপশান। হয় 'হ্যাঁ' বলবেন, নয়তো- 'না'।আমি আবারো বলছি, হয় হ্যাঁ বলবেন, নয়তো- না।'
লোকটা বললো,- 'আচ্ছা।'
- 'আপনি কি আপনার বউকে পেটানো বন্ধ করেছেন?'
লোকটি কিছুক্ষন চুপ মেরে ছিলো।এরপর বললো,- 'হ্যাঁ।'
এরপর সাজিদ বললো,- 'তার মানে আপনি একসময় বউ পেটাতেন?'

লোকটা চোখ বড় বড় করে বললো,- আরে, না না।'
এবার সাজিদ বললো,- 'হ্যাঁ' নাহলে কি? না?'
লোকটা এবার 'না' বললো।'
সাজিদ হাসতে লাগলো। বললো- 'তার মানে আপনি এখনো বউ পেটান?'
লোকটা এবার রেগে গেলো। বললো,- 'আপনি ফাউল প্রশ্ন করছেন।আমি কোনদিন বউ পেটায়নি।এটা আমার নীতি বিরুদ্ধ।
সাজিদ বললো,- 'আপনিও স্রষ্টাকে নিয়ে একটি ফাউল প্রশ্ন করেছেন। এটা স্রষ্টার নীতি বিরুদ্ধ।
আমার প্রশ্নের উত্তরে আপনি যদি হ্যাঁ বলেন, তাহলে স্বীকার করে নিচ্ছেন যে- আপনি একসময় বউ পেটাতেন।যদি 'না' বলেন, তাহলে স্বীকার করে নিচ্ছেন - আপনি এখনো বউ পেটান। আপনি না 'হ্যাঁ' বলতে পারছেন, না পারছেন 'না' বলতে।কিন্তু, আদতে আপনি বউ পেটান না।এটা আপনার নীতি বিরুদ্ধ। সুতরাং, এমতাবস্থায় আপনাকে এরকম প্রশ্ন করাই উচিত না।এটা লজিক্যাল ফ্যালাসির মধ্যে পড়ে যায়। ঠিক সেরকম স্রষ্টাকে ঘিরেও এরকম প্রশ্ন থাকা উচিত নয়।কারন, এই প্রশ্নটি নিজেই নিজের আত্মবিরোধ।
নীল রঙের স্বাদ কেমন, বা ৯ সংখ্যাটির ওজন কতো মিলিগ্রাম- এরকম প্রশ্ন যেমন লজিক্যাল ফ্যালাসি এবং এই ধরনের প্রশ্ন যেমন থাকা উচিত নয়, তেমনি, 'স্রষ্টা এমনকিছু বানাতে পারবে কিনা যেটা স্রষ্টা উঠাতে পারবে না'- এটাও একটা লজিক্যাল ফ্যালাসি। কু-যুক্তি। এরকম প্রশ্নও থাকা উচিত নয়।

সেদিন লোকটি খুব শকড হলেন। ভেবেছিলেন হয়তো সাজিদ এই প্রশ্নটি শুনেই ডিগবাজি খাবে।কিন্তু বেচারাকে এরকম ধোলাই করবে বুঝতে পারেনি। সেদিন উনার চেহারাটা হয়েছিলো দেখার মতো।বউ পেটানির লজিকটা মনে হয় উনার খুব গায়ে লেগেছে।

আমাদের আড্ডাটির কথাতো আগেই বলেছি। সাপ্তাহিক আড্ডা। শিক্ষামূলক বটে। একেক সপ্তাহে একেক টপিকের উপর আলোচনা চলে।
আমি আর সাজিদ মাগরিবের নামাজ পড়ে এগুচ্ছিলাম। উদ্দেশ্য- আড্ডাস্থল। আজ আড্ডা হচ্ছে সেন্ট্রাল মসজিদের পেছনে। অই দিকটায় একটা মাঝারি সাইজের বট গাছ আছে। বটতলাতেই আজ আসর বসার কথা।

খানিকটা দূর থেকে দেখলাম আড্ডাস্থলে বেশ অনেকজনের উপস্থিতি। কেউ একজন যেন দাঁড়িয়ে হাত নেঁড়ে নেঁড়ে কথা বলছে।
তাকে দেখে শামসুর রাহমানের কবিতার দুটি লাইন মনে পড়ে গেলো-

'স্বাধীনতা তুমি-
বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর
শানিত কথার ঝলসানি লাগা সতেজ ভাষণ।'

আড্ডাস্থলে পোঁছে দেখি হুলস্থুল কান্ড। আলোচনা তখন আর আলোচনায় নেই, বাড়াবাড়িতে রূপ লাভ করেছে।

দাঁড়িয়ে হাত নেঁড়ে যে কথা বলছিলো, সে হলো রূপম। ঢাবির ফিলোসপির ষ্টুডেন্ট। এথেইজমে বিশ্বাসী। তার মতে, ধর্ম কিছু রূপকথার গল্প বৈ কিছু নয়। সে তর্ক করছিলো হাসনাতের সাথে। হাসনাত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এন্থ্রোপোলজিতে পড়ে।

রূপমের দাবি- একমাত্র নাস্তিকতাই স্বচ্চ, সৎ আর বিজ্ঞানভিত্তিক কথা বলে। কোন প্যাঁচগোচ নেই, কোন দুই নাম্বারি নেই, কোন ফ্রডগিরি নেই। যা বাস্তব, যা বিজ্ঞান সমর্থন করে - তাই নাস্তিকতা।

মোদ্দাকথা, নাস্তিকতা মানে প্রমাণিত সত্য আর স্বচ্চতার দিশা।
হাসনাতের দাবি- ধর্ম হলো বিশ্বাসের ব্যাপার। আর বিশ্বাসের ব্যাপার বলেই যে একে একেবারে 'রূপকথা' বলে চালিয়ে দিতে হবে, তা কেন?

ধর্ম ধর্মের জায়গায়, বিজ্ঞান বিজ্ঞানের জায়গায়। ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের সামঞ্জস্যতা দেখাতে গিয়ে সে আলবার্ট আইনষ্টাইন সহ বড় বড় কিছু বিজ্ঞানী আর দার্শনিকদের মন্তব্য কোট করতে লাগলো।

আমি গিয়ে সাকিবের পাশে বসলাম। তার হাতে বাদাম ছিলো। একটি বাদাম ছিলে মুখে দিলাম।

সাজিদ বসলো না।
সে রূপমের পাশে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলো। বললো, 'এতো উত্তেজনার কি আছে রে?'

-'উত্তেজনা হবে কেন?'- রূপম বললো।
- 'তোকে দেখেই মনে হচ্ছে অনেক রেগে আছিস। এ্যানিথিং রং?'
হাসনাত বলে উঠলো, 'উনি নাস্তিকতাকে ডিফেন্ড করতে এসছেন। উনার নাস্তিকতা কতো সাঁধু লেভেলের, তা প্রমান করার জন্যই ভাষণ দেওয়া শুরু করেছেন।'

সাজিদ হাসনাতকে ধমক দেওয়ার সুরে বললো, 'তুই চুপ কর ব্যাটা। তোর কাছে জানতে চেয়েছি আমি?'

হাসনাতকে সাজিদের এইভাবে ঝাঁড়ি দিতে দেখে আমি পুরো হাঁ করে রইলাম। হাসনাত সাজিদের সবচে প্রিয় বন্ধুদের একজন।আর এই রূপমের সাথে সাজিদের পরিচয় ক'দিনের? মনে হয় একবছর হবে। রূপমের জন্য তার এতো দরদ কিসের? মাঝে মাঝে সাজিদের এসব ব্যাপার আমার এতো বিদঘুটে লাগে যে, ইচ্ছে করে তার কানের নিচে দু চারটা লাগিয়ে দিই।
সাজিদের ধমক খেয়ে বেচারা হাসনাতের মনটা খারাপ হয়ে গেলো। হবারই তো কথা।

সাজিদ আবার রূপমকে বললো, 'বল কি হয়েছে?'
- 'আমি বলতে চাইছি ধর্ম হলো গোঁজামিলপূর্ণ একটা জিনিস। সেই তুলনায় নাস্তিকতাই স্বচ্চ, সত্য আর বাস্তবতাপূর্ণ। কোন দুই নাম্বারি তাতে নেই।'
সাজিদ বললো, 'তাই?'

- 'হুম, Any doubt?'

সাজিদ হাসলো। হাসতে হাসতে সে এসে মিজবাহ'র পাশে বসলো। রূপম বসলো আমার পাশে। বটগাছের নিচের এই জায়গাটা গোলাকার করে বানানো হয়েছে। সাজিদ আর রূপম এখন মুখোমুখি বসা।

সাজিদ বললো, 'বন্ধু, তুই যতোটা স্বচ্চ, সত্য আর সততার সার্টিফিকেট তোর বিশ্বাসকে দিচ্ছিস, সেটা এতোটা স্বচ্চ, সত্য আর সৎ মোটেও নয়।'
রূপম বললো, 'মানে? কি বলতে চাস তুই? নাস্তিকরা ভূয়া ব্যাপারে বিশ্বাস করে? দুই নাম্বারি করে?'
- 'হুম। করে তো বটেই। এটাকে জোর করে বিশ্বাসও করায়।'
- 'মানে?'
সাজিদ নড়েচড়ে বসলো। বললো, ' খুলে বলছি।'

এরপরে সাজিদ বলতে শুরু করলো-

'বিজ্ঞানীরা যখন DNA আবিষ্কার করলো, তখন দেখা গেলো আমাদের শরীরের প্রায় 96-98% DNA হলো নন-কোডিং, অর্থাৎ, এরা প্রোটিনে কোনপ্রকার তথ্য সরবরাহ করে না। 2-4% DNA ছাড়া বাকি সব DNA-ই নন-কোডিং। এগুলোর তখন নাম দেওয়া হলো- Junk DNA । Junk শব্দের মানে তো জানিস,তাইনা? Junk শব্দের অর্থ হলো আবর্জনা। অর্থাৎ, এই 98% DNA'র কোন কাজ নেই বলে এগুলোকে 'বাতুল DNA' বা 'Junk DNA' বলা হলো।

ব্যস, এটা আবিষ্কারের পরে বিবর্তনবাদী নাস্তিকরা তো খুশীতে লম্ফঝম্প শুরু করে দিলো। তারা ফলাও করে প্রচার করতে লাগলো যে, আমাদের শরীরে যে 98% DNA আছে, সেগুলো হলো Junk, অর্থাৎ, এদের কোন কাজ নেই। এই 98% DNA ডারউইনের বিবর্তনবাদের পক্ষে অনেক বড় প্রমান। তারা বলতে লাগলো- 'মিউটেশনের মাধ্যমে এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতিতে রূপান্তরিত হবার সময় এই বিশাল সংখ্যক DNA আমাদের শরীরে রয়ে গেছে।

যদি কোন বুদ্ধিমান স্রষ্টা আমাদের সৃষ্টি করতো, তাহলে এই বিশাল পরিমাণ অকেজো, অপ্রয়োজনীয় DNA তিনি আমাদের শরীরে রাখতেন না। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান সত্ত্বার হাত ছাড়া, প্রকৃতির অন্ধ প্রক্রিয়ায় আমরা অন্য একটি প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়েছি বলেই এই বিশাল অপ্রয়োজনীয়, অকেজো DNA আমাদের শরীরে এখনো বিদ্যমান।'

বিবর্তনবাদীদের গুরু, বিখ্যাত বিবর্তনবাদী জীব বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স তো এই Junk DNA কে বিবর্তনবাদের পক্ষে বড়সড় প্রমাণ দাবি করে করে একটি বিশাল সাইজের বইও লিখে ফেলেন। বইটির নাম 'The Selfish Gene' ।

.

কিন্তু বিজ্ঞান অই Junk DNA তে আর বসে নেই।

বর্তমানে এপিজেনেটিক্সের গবেষণা থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, এতোদিন যে DNA কে Junk বলে বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, তার কোনকিছুই Junk নয়। আমাদের শরীরে এগুলোর রয়েছে নানারকম বায়োকেমিক্যাল ফাংশান। যেগুলোকে নাস্তিক বিবর্তনবাদীরা এতোদিন অকেজো, বাতিল,অপ্রয়োজনীয় বলে বিবর্তনের পক্ষে বড়সড় প্রমাণ বলে লাফিয়েছে, সাম্প্রতিক গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে- এসব DNA মোটেও অপ্রয়োজনীয়, অকেজো নয়। মানবদেহে এদের রয়েছে নানান ফাংশান। তারা বলতো, প্রকৃতির অন্ধ প্রক্রিয়ায় মানুষ অন্য একটি প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়েছে বলেই এরকম অকেজো,নন ফাংশনাল DNA শরীরে রয়ে গেছে। যদি কোন সৃষ্টিকর্তা বিশেষভাবে মানুষকে সৃষ্টি করতো, তাহলে এরকম অপ্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের শরীরে থাকতো না।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এসব DNA মোটেও নন-ফাংশনাল নয়। আমাদের শরীরে এদের অনেক কাজ রয়েছে। তাহলে বিবর্তনবাদীরা এখন কি বলবে? তারা তো বলেছিলো 'অপ্রয়োজনীয়' বলেই এগুলো বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ। কিন্তু এগুলোর প্রয়োজন যখন জানা গেলো, তখনও কি তারা একই কথা বলবে? ডকিন্স কি তার 'The Selfish Gene' বইটা সংশোধন করবে? বিবর্তনবাদীরা কি তাদের ভুল শুধরে নিয়ে ভুলের জন্য ক্ষমা চাইবে? বল দোস্ত, এইটা কি দুই নাম্বারি না?'

সাজিদ থামলো। রূপম বললো, 'বিজ্ঞানের অগ্রগিতে এরকম দু একটি ধারণা পাল্টাতেই পারে। এটা কি চিটিং করা হয়?'

সাজিদ বললো, 'না। কিন্তু বিজ্ঞান কোন ব্যাপারে ফাইনাল কিছু জানানোর আগেই তাকে কোন নির্দিষ্ট কিছু একটার পক্ষে প্রমাণ বলে চালিয়ে দেওয়া, প্রতিপক্ষকে এটা দিয়ে একহাত নেওয়া এবং এটার পক্ষে কিতাবাদি লিখে ফেলাটা চিটিং এবং নাস্তিকরা তাই করে।'

সাজিদ বললো, শুধু Junk DNA নয়। আমাদের শরীরে যে এপেন্ডিক্স আছে, সেটা নিয়েও কতো কাহিনী তারা করেছে। তারা বলেছে, এপেন্ডিক্স হলো আমাদের শরীরে অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ। আমাদের শরীরে এটার কোন কাজ নেই। যদি কোন বুদ্ধিমান সত্ত্বা আমাদের সৃষ্টি করতো, তাহলে এপেন্ডিক্সের মতো অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ আমাদের শরীরে রাখতো না। আমরা শিম্পাঞ্জী জাতীয় একপ্রকার এপ থেকে প্রকৃতির অন্ধ প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত বলেই এরকম অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ আমাদের শরীরে রয়ে গেছে।এটার কোন কাজ নেই।

এটাকে তারা বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ বলে চালিয়ে দিতো।

কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, এপেন্ডিক্স মোটেও কোন অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ নয়। আমাদের শরীরে যাতে রোগ জীবাণু, ভাইরাস ইত্যাদি প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য যে টিস্যুটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, সেটার নাম লিম্ফ টিস্যু। এই টিস্যু আমাদের শরীরে অনেকটা সৈনিক তথা প্রহরীর মতো কাজ করে। আর, আমাদের বৃহদন্ত্রের মুখে প্রচুর লিম্ফ টিস্যু ধারণকারী যে অঙ্গটি আছে, তার নাম এপেন্ডিক্স।
যে এপেন্ডিক্সকে একসময় 'অকেজো' ভাবা হতো, বিজ্ঞান এখন তার অনেক ফাংশানের কথা আমাদের জানাচ্ছে।বিবর্তনবাদীরা কি আমাদের এ ব্যাপারে কোনকিছু নসীহত করতে পারে? এখনো কি বলবে এপেন্ডিক্স অকেজো? বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ?'

রূপম চুপ করে আছে। সাজিদ বললো, এতো গেলো মাত্র দুটি ঘটনা। তুই কি মিসিং লিঙ্কের ব্যাপারে জানিস রূপম?'

.

আমার পাশ থেকে রাকিব বলে উঠলো, 'মিসিং লিঙ্ক আবার কি জিনিস?'
সাজিদ রাকিবের দিকে তাকালো। বললো, 'বিবর্তনবাদীরা বলে থাকে একটা প্রাণী থেকে ধীরে ধীরে অন্য একটা প্রাণী বিবর্তিত হয়।তারা বলে থাকে- শিম্পাঞ্জি থেকে আমরা, মানে মানুষ এসেছে বিবর্তন প্রক্রিয়ায়। যদি এরকম হয়, তাহলে শিম্পাঞ্জি থেকে কিন্তু এক লাফে মানুষ চলে আসেনি।

অনেক অনেক ধাপে শিম্পাঞ্জি থেকে মানুষ এসেছে। ধর, ১ সংখ্যাটা বিবর্তিত হয়ে ১০ এ যাবে। এখন ১ সংখ্যাটা কিন্তু এক লাফে ১০ হয়ে যাবে না। তাকে অনেকগুলো মধ্যবর্তী পর্যায় (২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯) অতিক্রম করে ১০ হতে হবে। এই যে ১০ এ আসতে সে অনেকগুলো ধাপ (২, ৪, ৭, ৮, ৯) অতিক্রম করলো, এই ধাপগুলোই হলো ১ এবং ১০ এর মিসিং লিঙ্ক।'

রাকিব বললো, 'ও আচ্ছা, বুঝলাম। শিম্পাঞ্জি যখন মানুষে বিবর্তিত হবে, প্রাথমিক পর্যায়ে তার মধ্যে কিছু মানুষের কিছু শিম্পাঞ্জীর বৈশিষ্ট্য আসবে। এই বৈশিষ্ট্য সম্বলিত পর্যায়টাই মিসিং লিঙ্ক,তাই না?'

- 'হুম। যেমন ধর, মৎস্য কন্যা। তার অর্ধেক শরীর মাছ, অর্ধেক শরীর মানুষ। তাহলে তাকে মাছ এবং মানুষের একটি মধ্যবর্তী পর্যায় হিসেবে ধরা যায়। এখন কেউ যদি দাবি করে যে মাছ থেকে মানুষ এসেছে, তাহলে তাকে ঠিক মৎস্য কন্যার মতো কিছু একটা এনে প্রমাণ করতে হবে। এইটাই হলো মিসিং লিঙ্ক।'

রূপম বললো, 'তো এইটা নিয়ে কি সমস্যা?'
সাজিদ আবার বলতে লাগলো, 'বিবর্তনবাদ তখনই সত্যি হবে যখন এরকম সত্যিকার মিসিং লিঙ্ক পাওয়া যাবে।পৃথিবীতে কোটি কোটি প্রাণী রয়েছে। সেই হিসাবে বিবর্তনবাদ সত্য হলে কোটি কোটি প্রাণীর বিলিয়ন বিলিয়ন এরকম মিসিং লিঙ্ক পাওয়া যাওয়ার কথা। কিন্তু মজার ব্যাপার, এরকম কোন মিসিং লিঙ্ক আজ অবধি পাওয়া যায়নি। গত দেড়শো বছর ধরে অনেক অনেক ফসিল পাওয়া গেছে কিন্তু সেগুলোর কোনটিই মিসিং লিঙ্ক নয়। বিবর্তনবাদীরা তর্কের সময় এই মিসিং লিঙ্কের ব্যাপারটা খুব কৌশলে এড়িয়ে যায়। কেউ কেউ বলে, 'আরো সময় লাগবে। বিজ্ঞান একদিন ঠিক পেয়ে যাবে,ইত্যাদি।'

কিন্তু, ২০০৯ সালে বিবর্তনবাদীরা একটা মিসিং লিঙ্ক পেয়ে গেলো যা প্রমাণ করে যে মানুষ শিম্পাঞ্জী গোত্রের কাছাকাছি কোন এক প্রাণী থেকেই বিবর্তিত। এটার নাম দেওয়া হলো- Ida.

বিবর্তনবাদ দুনিয়ায় রাতারাতি তো ঈদের আমেজ নেমে আসলো। তারা এটাকে বললো 'The eighth wonder of the world' ।

কেউ কেউ তো বলেছিলো, 'আজ থেকে কেউ যদি বলে বিবর্তনবাদের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই, তারা যেন Ida কে প্রমাণ হিসেবে হাজির করে। বিবর্তনবাদীদের অনেকেই এইটাকে 'Our Monalisa' বলেও আখ্যায়িত করেছিলো। হিষ্ট্রি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফী, ডিসকভারি চ্যানেলে এটাকে ফলাও করে প্রচার করা হলো। সারা বিবর্তনবাদ দুনিয়ায় তখন সাজ সাজ রব।

কিন্তু, বিবর্তনবাদীদের কান্নায় ভাসিয়ে ২০১০ সালের মার্চে টেক্সাস ইউনিভার্সিটি, ডিউক ইউনিভার্সিটি আর ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো'র গবেষক বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে দেখালেন যে, এই Ida কোন মিসিং লিঙ্ক নয়। এটা Lamour নামক একটি প্রাণীর ফসিল।তাদের এই রিসার্চ পেপার যখন বিভিন্ন নামীদামী সাইন্স জার্নালে প্রকাশ

হলো, রাতারাতি বিবর্তনবাদ জগতে শোক নেমে আসে। বল রূপম, এইটা কি জালিয়াতি নয়? একটা আলাদা প্রাণীর ফসিলকে মিসিং লিঙ্ক বলে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়া কি চিটিং নয়?'

.

এরচেয়েও জঘন্য কাহিনী আছে এই বিবর্তনবাদীদের। ১৯১২ সালে Piltdown Man নামে ইংল্যান্ডের সাসেক্সে একটি জীবাশ্ম পাওয়া যায় মাটি খুঁড়ে। এটিকেও রাতারাতি 'বানর এবং মানুষের' মিসিং লিঙ্ক বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। এটাকে তো ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল জাদুঘরে প্রদর্শনীর জন্য রেখে দেওয়া হয়। বানর এবং মানুষের এই মিসিং লিঙ্ক দেখতে হাজার হাজার দর্শনার্থী আসতো।

কিন্তু ১৯৫৩ সালে কার্বণ টেষ্ট করে প্রমাণ করা হয় যে, এটি মোটেও কোন মিসিং লিঙ্ক নয়। এটাকে কয়েকশো বিলিয়ন বছর আগের বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।গবেষণায় দেখা যায়, এই খুলিটি মাত্র ৬০০ বছর আগের আর এর মাড়ির দাঁতগুলো ওরাং ওটাং নামের অন্য প্রাণীর। রাতারাতি বিবর্তন মহলে শোক নেমে আসে।

বুঝতে পারছিস রূপম, বিবর্তনবাদকে জোর করে প্রমাণ করার জন্য কতোরকম জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে?
একটা ভূয়া জিনিসকে কিভাবে বছরের পর বছর ধরে প্রমাণ হিসেবে গিলানো হয়েছে?

নেট ঘাঁটলে এরকম জোঁড়াতালি দেওয়া অনেক মিসিং লিঙ্কের খবর তুই এখনো পাবি। মোদ্দাকথা, এই নাস্তিকতা, এই বিবর্তনবাদ টিকে আছে কেবল পশ্চিমা বস্তুবাদীদের ক্ষমতা আর টাকার জোরে।

এই বিবর্তনবাদই তাদের সর্বশেষ সম্বল ধর্মকে বাতিল করে দেওয়ার। তাই এটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, দাঁড় করানোর জন্য, মানুষকে গিলানোর জন্য তাদের যা যা করতে হয় তারা করবে। যতো জালিয়াতির আশ্রয় নিতে হয় তারা নিবে।

এরপরও কি বলবি তোর নাস্তিকতা সাঁধু? সৎ? প্রতারণাবিহীন নির্ভেজাল জিনিস?

রূপম কিছু না বলে চুপ করে আছে। হাসনাত বলে উঠলো, 'ইশ! এতক্ষণ তো নাস্তিকতাকে নির্ভেজাল, সৎ, সাঁধু, কোন দুই নাম্বারি নেই, কোন ফ্রডবাজি নেই বলে লেকচার দিচ্ছিলি। এখন কিছু বল?'

এশা'র আজান পড়লো। আমরা নামাজে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।আমাদের সাথে রাকিব আর হাসনাতও আছে। অল্প একটু পথ হাঁটার পরে আমি হঠাৎ থেমে গেলাম। সাজিদ বললো, 'তোর আবার কি হলো রে?'
আমি রাগি রাগি চেহারায়, বড় বড় চোখ করে বললাম, 'তুই ব্যাটা হাসনাতকে তখন ওইভাবে ঝাঁড়ি দিয়েছিলি কেন?'

সাজিদ হাসনাতের দিকে তাকালো। মুচকি হেসে বললো, 'শেক্সপীয়র বলেছেন - 'Sometimes I have to be cruel just to be kind'.....
আমরা সবাই হা হা হা করে হেসে ফেললাম।
==
(এখানে আরো কিছু এড করা যেতো। যেমন- কৃত্রিম প্রাণ তৈরির ঘটনা, এপেন্ডিক্সের মতো আরো কিছু অঙ্গ যেমন - ককিক্স ইত্যাদি। লেখাটির বেশি দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে বলে তা করা হয়নি।)

তথ্যসুত্রঃ
Junk DNA এর রেফারেন্স-

- Report of 'The Guardian'- Breakthrough study overturns theory of 'junk DNA' in genome (5 September 2012)

- Report Of 'New York Times'- Bits of Mystery DNA, Far From 'Junk,' Play Crucial Role (5 September 2012)
- Report Of 'Evolutionnews'- Junk No More: ENCODE Project Nature Paper Finds "Biochemical Functions for 80% of the Genome" (September 05, 2012)

'এপেন্ডিক্স' এর রেফারেন্সঃ-

- Report Of 'Science Daily'- Immune cells make appendix 'silent hero' of digestive health (November 30, 2015)
- Report Of 'Science Daily'- Appendix Isn't Useless At All: It's A Safe House For Good Bacteria (October 08, 2007)
- Report Of 'Fox News'- Appendix May Produce Good Bacteria, Researchers Think (October 05, 2007)

মিসিং লিঙ্ক 'Ida' এর রেফারেন্সঃ-

- Report Of 'Daily Mail'- Missing link? Ida was not even a close relative say fossil experts (October 22, 2009)
- Report Of 'Ideacenter'- The Rise and Fall of Missing Link Superstar "Ida"

জালিয়াতিপূর্ণ ফসিল 'Piltdown Man' এর রেফারেন্সঃ-

- Report Of 'Science Mag'- Study reveals culprit behind Piltdown Man, one of science's most famous hoaxes (August 09, 2016)
- Report Of 'Live Science'- Piltdown Man: Infamous Fake Fossil (September 30, 2016)

আরিফ আজাদ। জন্মেছেন চট্টগ্রাম। সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট। লিখেন বিশ্বাসের কথা । বিচূর্ণ করেন অবিশ্বাসের আয়না।

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭-এ তার প্রথম গ্রন্থ 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ'।

প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ